কয়েদী ৩৪৫

গুয়ান্তানামোতে ছয় বছর

সামি আলহায

কয়েদী ৩৪৫

গুয়ান্তানামোতে ছয় বছর

মূলঃ সামি আলহায
ভাষান্তরঃ মুহসিন আব্দুল্লাহ
সম্পাদনাঃ টিম প্রজন্ম

কয়েদী ৩৪৫

গুয়ান্তানামোতে ছয় বছর

মূলঃ সামি আলহায

পরিচালক

পাবলিক লিবার্টিজ এন্ড হিউম্যান রাইটস বিভাগ, আল জাজিরা

ভাষান্তরঃ মুহসিন আব্দুল্লাহ

মুক্তচিন্তায় স্বাধীনতা

৪৫ বাংলাবাজার, কম্পিউটার কমপ্লেক্স (৪র্থ তলা), ঢাকা-১১০০

মোবাইল : ০১৫৭২ ৪১০ ০১৮

facebook.com/projonmopublication

www.projonmo.pub

কয়েদী ৩৪৫

গুয়ান্তানামোতে ছয় বছর

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর ২০১৮

২য় সংস্করণ
জুলাই ২০১৯

প্রচ্ছদ
ওয়াহিদ তুষার

পরিবেশক
আমাদেরবই ডট কম
দোকান নং: ০৪, ২য় তলা
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: ০১৯৫৪ ০১৪ ৭২০

মূল্যঃ ২৩৫ [দুইশত পঁয়ত্রিশ] টাকা

প্রজন্ম পাবলিকেশনের পক্ষে আহমদ মুসা ও ওয়াহিদ তুষার কর্তৃক ৪৫ বাংলাবাজার, কম্পিউটার কমপ্লেক্স (৪র্থ তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত; মার্জিন প্রিন্টিং এন্ড বাইন্ডিং সলিউশন, ৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

Koyedi 345 by Sami Al-haj, Translated by Mhsin Abdullah, Published by
Projonmo Publication

Price: 235 Taka , 10 US$
ISBN: 978-984-34-6697-6

লেখক পরিচিতি

১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ সালে সুদানের খার্তুমে জন্ম নেয়া সামি আলহায কাতার ভিত্তিক বহুল পরিচিত গণমাধ্যম 'আল জাজিরা'র সাংবাদিক। আফগানিস্তানে মার্কিন জোটের ভয়ংকর হামলার ফুটেজ তিনিই সর্বপ্রথম ধারন করেন এবং বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেন। ২০০১ সালে সহকর্মীদের নিয়ে আফগানিস্তানে সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যাত্রার সময় পাকিস্তান গোয়েন্দা বাহিনীর হাতে আটক হন। এরপর তাকে আমেরিকার হাতে তুলে দেয়া হয়। তার বিরূদ্ধে আল কায়েদা প্রধান ওসামা বিন লাদেনের ভিডিও চিত্র সংগ্রহের অভিযোগ আনা হয় যদিও তিনি শুধু আল জাজিরার পক্ষে তৃণমূল সাংবাদিকতা ও ভিডিও চিত্র সংগ্রহের কাজ করছিলেন। আফগানিস্তানে দীর্ঘদিন বন্দি রেখে পরবর্তীতে তাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত কুখ্যাত গুয়ান্তানামো বে কারাগারে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে তিনি ছয় বছর বন্দি ছিলেন।

ছয় বছর অবর্ণনীয় নির্যাতন আর সীমাহীন কষ্ট ভোগের পর ২০০৮ সালের পহেলা মে নিঃশর্ত মুক্তি লাভ করেন। ব্রিটিশ মানবাধিকার আইনজীবী ক্লাইভ স্টাফোর্ড স্মিথ আলহাযের পুরো বন্দি অবস্থায় আইনজীবী হিসেবে কাজ করেন। ক্লাইভ ২০০৫ সালে তার সাথে দেখা করার সুযোগ পান। স্টাফোর্ডের মতে সামি বন্দি অবস্থায় ভয়ংকর শারীরিক মানসিক নির্যাতন, যৌন নিপীড়ন এবং ধর্মীয় নিগ্রহের মুখোমুখি হন। বেধড়ক মারধরের কারণে মুখে দাগ বসে যায়। স্টাফোর্ড আরো জানান যে সামি নিজ চোখে আফগান সেনাঘাটিতে মার্কিন সেনাদের কুরআন টয়লেটে ছুড়ে ফেলতে দেখেছে। কুরআনের গায়ে অশ্লীল কথা লিখে রাখতে দেখেছে। ২৩ নভেম্বর ২০০৫

সালের এক জিজ্ঞাসাবাদে সামিকে মার্কিন কর্মকর্তারা জিজ্ঞেস করে আল জাজিরা আল কায়েদার অঙ্গসংগঠন কিনা।

২০০৭ সালের জানুয়ারিতে গুয়ান্তানামো কারাগারে মার্কিন সেনাদের বর্বর নির্যাতনের প্রতিবাদে অনশন শুরু করেন তিনি এবং আরো কয়েকজন সহকয়েদী। সেসময় তার ৫৫ পাউন্ড ওজন কমে যায়। অনশন ভাঙ্গাতে তাদেরকে জোর করে খাওয়ানো হতো। সে ফোর্স ফিডিং ছিল আরেক অত্যাচার। সামির অনশন চলে টানা ৪৩৮ দিন। তার মুক্তির দিন পর্যন্ত।

অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সামি এখন আল জাজিরার প্রধান কার্যালয়ে 'পাবলিক লিবার্টিজ এন্ড হিউম্যান রাইটস' বিভাগের পরিচালক হিসেবে কাজ করছেন। যেখানে তার কাজ হলো মানবাধিকার সংক্রান্ত, যৌন নিপীড়নমূলক সংবাদের তদারকি করা এবং সে সংবাদগুলোকে টিভির পর্দায় নিয়ে আসতে কিংবা মানবাধিকার সংগঠনগুলোর কাছে পৌছতে যাবতীয় এন্তেজাম করা।

সামি আলহাজ সাংবাদিকতায় AIB INSI Special Award এবং Reporter of the year Viareggio পদক পান।

প্রকাশকের কথা

২০০১ সাল। আফগানিস্তানে মার্কিন জোটের আক্রমণ শুরু হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই সাংবাদিকদের কাজ হলো এতো বড় ঘটনা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা। সামি আলহায ছিলেন বহুল পরিচিত গণমাধ্যম 'আল জাজিরা'র ফটোজার্নালিস্ট। অফিস থেকে আফগানিস্তানে মার্কিন জোটের হামলার খবর কভার করতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো সামিকে। পাকিস্তান থেকে আফগানিস্তানে প্রবেশের পথে আটকে গেলেন তিনি।

নানা নাটকীয়তার পর পাকিস্তানি গোয়েন্দা বাহিনী তাকে মার্কিন বাহিনীর কাছে তুলে (কিংবা বিক্রি করে) দেয়। আফগানিস্তানে অকথ্য নির্যাতনের মাধ্যমে একজন সাংবাদিক সামি আলহাযকে স্বাগত জানায় মানবতাবাদী (!) মার্কিন সেনারা।

আফগানিস্তানে ভয়ংকর নির্যাতনের পর পাঠানো হয় কুখ্যাত গুয়ান্তানামো বে কারাগারে। মানবতাকে পদদলিত করে নির্যাতনের স্টিম রোলার চালানো হয়। নূন্যতম মৌলিক অধিকারগুলো থেকে বঞ্চিত করা হয়। একে এক জীবন থেকে কেড়ে নেয়া হয় ছয় ছয়টি বসন্ত। অতঃপর বলা হয়, "আমরা সত্যিই দুঃখিত, তোমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই।"

মুক্তির পর সামির বন্দিজীবনের সংক্ষিপ্ত ঘটনা–নিজের মুখেই বর্ণনা করেছেন। হৃদয়ভাঙ্গা সে ব্যথাতুর বিবরণ আমাদের সামনে প্রকাশ করেছেন। স্মৃতির সেই স্রোতধারা পৃথিবীময় প্লাবিত হয়।

সামি আলহায একজন অকুতোভয় সাংবাদিক। তাকে আমেরিকা বন্দি করেছিল ঠিকই কিন্তু তার মনকে বন্দি করার সক্ষমতা ছিল না কারো। সামিকে বন্দি করেছিল ঠিকই কিন্তু হার মানাতে পারেনি।

'কয়েদী ৩৪৫' শুধু একটি বই নয় এটি একটি জীবন্ত ইতিহাস। বছরের পর বছর ধরে চেপে রাখা এক মিথ্যার মুখোশ উন্মোচন। সামির সাহস পথ দেখাবে আগামী প্রজন্মকে। সামির লেখনি শক্তি যোগাবে লাখো সাংবাদিককে নির্ভিক হতে।

সামি আলহাযের আইনজীবী ক্লাইভ স্ট্যাফোর্ড স্মিথের একটি মন্তব্য, "গুয়ান্তানামো কারাগারের একজন মেধাবী এবং সাহসী কয়েদীকে মক্কেল হিসেবে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আমার দীর্ঘদিনের। সামির কাজ যেন পশুদের উদর ফুরে বের হওয়া কোন সৃষ্টি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সযতনে লুকিয়ে রাখা এক মিথ্যার মুখোশ উন্মোচন। গত পনেরটি বছর ধরে লুকিয়ে রাখা ভয়ানক এক কারাগার সম্পর্কে সবচেয়ে নিখাদ বর্ণনা। ঘটনাবহুল সে দিনগুলোর বর্ণনা বিশ্ববাসীর সামনে সবিস্তারে তুলে ধরা উচিৎ।"

পরিচালক,
প্রজন্ম পাবলিকেশন

সূচীপত্র

পূর্বকথা

বইটি যখন লিখতে বসি, আমাকে নীরব লেখকের মতো ভেবে আকুল হতে হয়নি যে কী লিখব...? গুয়ান্তানামো কারাগারে বসেই এ ভাবনা আমি ভেবেছি। অজস্র ঘণ্টা আমার সেলে বসে ভেবে ভেবে কেটে গেছে। আমি আমার সেই ছয় বছরে যা জানতাম না তা হলো, 'আমি আসলে একা নই'। আমার চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠান 'আল জাজিরা' প্রায়ই আমার নাম আর বিচারকাজ জনগণের সামনে তুলে ধরত। তারা একটা খবর প্রচার করত আর মুহূর্তেই তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ত। টিভির স্ক্রলে ভাসত "সামি আলহাযকে মুক্তি দাও"। দর্শকরা আমার দুর্দশার খবর জেনে যেত।

আমি সত্যিই এ প্রতিষ্ঠানটির প্রতি কৃতজ্ঞ। আমাকে তারা নিজের সন্তানের মত ভেবেছেন। বিচারকার্য চলাকালে আমার পাশে থেকেছেন। আমার মামলার দিকে বিশ্ববাসীর নজর নিয়ে এসেছেন। পৃথিবীর চৌদিকে মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা সংস্থা, এনজিও গুলোকে তাগাদা দিয়েছেন। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

কিছু মানুষ আছেন যাদের নাম পরিচয় ধরেই ধন্যবাদ দিতে চাই। প্রথমেই আমার স্ত্রী উম্মে মুহাম্মদের কথা না বললেই নয়। যিনি আমার মুক্তির জন্য ক্লান্তিহীন কাজ করেছেন এবং বিশ্বাস করতেন আমি একদিন পরিবারে ফিরবই।

একই সাথে বলব আল জাজিরা পরিবারের মধ্যে সাবেক ডিরেক্টর জেনারেল ওয়াদাহ খানফারের কথা। যিনি সকল কর্মসূচী বাদ দিয়ে আমার মুক্তির পর খার্তুম বিমানবন্দরে আমাকে রিসিভ করার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। এরপর বলব ড. ফাওজি ওয়া সাদিকের কথা। যিনি হিউম্যান

রাইটস ওয়াচ, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালসহ অন্যান্য নাগরিক ও সুশীল সংগঠনগুলোর সাথে সমন্বয় করেছেন। সুদানের হাসান সাঈদ আল মুজাম্মার যিনি জনকল্যাণমূলক সংগঠনের সাথে জড়িত, অফুরন্ত সমর্থন জুগিয়েছেন, আইনি বিষয়গুলো দেখভাল করেছেন।

ফ্রান্সের মানবতাবাদী সংগঠন The International Office of umanitarian and Charitable Organisations (IOHCO) আমার পক্ষে কাজ করেছে। ড. হাইথাম এবং অ্যানা নিজে গুয়ান্তানামো কারাগার সফর করেছেন এবং প্রশাসনকে আমার নিরপরাধ হবার ব্যাপারে নিশ্চিত করেছেন যা আমার মামলার নথিপত্রের জটিলতা কমিয়েছে।

সুইজারল্যান্ডের মানবতাবাদী সংগঠন 'আলকারামা'ও আমার পক্ষে কাজ করেছে। বিশেষ করে ড. রশিদ মেসলি যিনি উক্ত সংগঠনের আইন বিষয়ক পরিচালক। কুয়েতের আদিল জসিম আল দামাকি যিনি Kuwaiti Association for the Basic Elements of Human Rights প্রধান, আমার পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছিলেন। ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য আরো আছেন, খালিদ আল আনাসি যিনি ইয়েমেনের National Organization for Defending Rights and Freedoms (HOOD) এর নির্বাহী পরিচালক এবং আসিম কুরেশী যিনি লন্ডনের মানবাধিকার সংগঠন CAGE (কেইজ)'র প্রধান।

আমি আরো ধন্যবাদ দিতে চাই আল জাজিরার আইনজীবীদের, সুদানি আইনজীবী সমিতি এবং মানবাধিকার সংগঠন, এনজিওগুলোকে যারা ক্লান্তিহীনভাবে আমার মুক্তির জন্য কাজ করে গেছেন। আমি সেসব মানুষদেরও ধন্যবাদ জানাতে চাই যারা ব্যানার নিয়ে খার্তুমের মার্কিন এম্বেসীর সামনে দাঁড়িয়ে আমার মুক্তি দাবি করেছেন। বিশ্বাস করেছেন, 'আমি নির্দোষ'। সুদানের মানবাধিকার কর্মীবৃন্দ, সংসদ সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন সংগঠন, দক্ষিণের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন গ্রুপ, খার্তুমের মানবাধিকার ও পরিবেশ উন্নয়ন কেন্দ্র, সুদানের মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ কর্তৃপক্ষ, হোপ সেন্টার, নারী ও শিশু উন্নয়ন সংগঠন তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

সেইসব প্রতিটি মানুষকে ধন্যবাদ যারা আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। আমার মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তির আশা জিইয়ে রেখেছিলেন। আমার পরম আরাধ্য সাংবাদিকতার কাজে আবার নিয়মিত হতে পারি সে চেষ্টা

করেছেন তাদের প্রতি আমি ঋণী। আমি সেসব লোকদের প্রতিও কৃতজ্ঞ যারা আমার কারণে ন্যায়বিচারের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন।

প্রতিটি হৃদস্পন্দনে আমি 'আল জাজিরা'র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। 'আল জাজিরা' আমার জন্য স্নেহস্পর্শী, বটবৃক্ষ পিতার মত ভূমিকা পালন করেছে। অন্যান্য সংস্থা ও সংগঠনগুলো মায়ের মত ভূমিকা রেখেছে। বিশ্বজুড়ে আমার মুক্তির জন্য কাজ করা মানুষেরা আমার ভাই বোন।

আপনাদের সবার প্রতি আমার স্মৃতির ডালি সমর্পণ করছি। যার ভিতর রয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে অমানবিক কারাগারে কাটানো আমার ছয় বছরের অভিজ্ঞতা। কোন কারণ ছাড়াই আমাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কোন ন্যায়বিচার করা হয়নি। আমি সেখানে ছিলাম হতভম্ব, যন্ত্রণাক্লিষ্ট। ধুকে ধুকে মরছিলাম। যতদিন না কারা কর্মকর্তারা আমাকে মুক্তি দেবার মত সুস্থতায় নিয়ে আসে। আমার স্মৃতির খেরোখাতার আঁকিবুকিতে ভুল হলে ক্ষমা করবেন। আমি আমার চিন্তা, আবেগ প্রকাশ করেছি। নিজেকে হালকা করেছি। এমন এক জিঞ্জিরজটলার বর্ণনা দিয়েছি যার ভিতর শুধুই লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা।

এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমি লাভ করেছি অর্ন্তদৃষ্টি, প্রশান্তি আর মানসিক শক্তি। আমার সংক্ষুব্ধ মনের অস্থিরতা কাগজের উপর বর্ণ হয়ে নেমেছে। এখন আমি স্থির। আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। আরো বেশি সহিষ্ণু। আমি এখন এই নিঝুম আরব্য রজনীর বন্ধুর চেয়েও বেশি। ভালোবাসার শহর দোহা এখন আমার আরো ঘনিষ্ট সঙ্গী।

রাতের পাখি

রাতের গহীনে আমি একা। নিজের নিঃশ্বাস শুনতে পাচ্ছি। হৃদস্পন্দন হচ্ছে আমার। মৃদু বায়ু বইছে। হালকা আলোর রেখা মাথার উপর। আরব সাগরের শা-শা ঢেউয়ের শব্দ কানে ভেসে আসছে। মনে পরছে এরকম আরো অনেক সাগরের ঢেউয়ের স্মৃতি। কত বিস্ময়কর এই সাগর!

একটি রাতের পাখি আমার পাশে উড়ে এসে বসল। ক্ষীণস্বরে গান গেয়ে যাচ্ছে। যেন এক হারানো সঙ্গীর শোকে কাতর। আমি জানি না এই পাখির নাম কী। অন্ধকারে এর আকৃতি বুঝার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু এর সকরুণ সুর আমাকে গভীর চিন্তায় ডুবিয়ে দেয়।

গুয়ান্তানামো। গুয়ান্তানামো আমার গল্প। আমি কয়েদী নম্বর ৩৪৫। গুয়ান্তানামো আমার গল্প। আট শতাধিক কয়েদীর গল্প। অধিকাংশ যারা সেখানে দিনগুজরান করেছি আমাদের গল্পগুলো প্রায় একই। আবার অন্য দিক থেকে গল্পগুলো ভিন্ন ভিন্ন। আমার স্মৃতিতে ভাসে নিদারুণ কষ্ট আর নির্যাতনের সেই দিনগুলোর কথা। পাষাণ হৃদয় আর পাথর আকৃতির পুরুষ ও নারী সেনাদের কথা। তারা আমার জীবনের সেরা দিন, মাস ও বছরগুলোকে পিষে ফেলেছে। একটুও বাঁধেনি তাদের বিবেকে!

কিন্তু আমি তাদের পরাস্ত করতে পেরেছি। আমি আমার শপথ দিয়ে তাদের পরাজিত করেছি। যে শপথ আমি করেছি স্বয়ং আল্লাহর অদৃশ্য হাতে। আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন যেখানেই আমরা থাকি না কেন। তিনি আছেন রাতের গহীনে। আছেন প্রলম্বিত দ্বি-প্রহরগুলোতে। তিনিই আমার মা'বুদ যিনি আমাকে কষ্ট বইতে সাহস যোগান। যতক্ষণ চেতন থাকে ততক্ষণ তাঁর রহম অনুভব করি।

আমার মাঝে আমি এক প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক শক্তি অনুভব করলাম। মনের সে শক্তি সুপ্ত থাকে। আবার প্রয়োজনে জেগে ওঠে। আমাদের সবার মাঝেই সে শক্তি ছিল। শত ঝড় ঝাপটা উপেক্ষা করেও সে শক্তি জাজ্বল্যমান ছিল। এই শক্তির স্ফুলিঙ্গ সেদিন থেকে জ্বলতে শুরু করে যেদিন থেকে আমার ক্ষুধার্ত দেহ কিন্তু আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ সত্ত্বা নিয়ে কারাজীবনের শুরু। গভীরভাবে ভাবি জীবনগতি। এরপর সিদ্ধান্ত নিই।

আমি অনশনে যাই। আমার প্রতি অন্যায় আটকাদেশের প্রতিবাদ করি। অনড়-অটল থাকি। অবিচল থাকার শক্তি আল্লাহ সুবহানুহু ওয়া তায়ালা আমার হৃদয়ে ঢেলে দেন। কি রকম অটল ছিলাম গুয়ান্তানামোর নিষ্ঠুর কারারক্ষীরা তা জানে।

সেই অন্ধকার দিনগুলোতে ইসলামের মহান হিরোদের রেখে যাওয়া দৃষ্টান্তগুলো আমার মনে পড়ত। বিলাল ইবনে রাবাহ (রা.) যাকে মক্কায় মরুভূমিতে ফেলে বুকে পাথর চাপা দেওয়া হয়েছিল। আমি আমার মনের চোখ দিয়ে তাকে দেখেছি। পাথর চাপায় পিষ্ট তিনি। ক্ষীণস্বরে আল্লাহর প্রতি ঈমান জানান দিচ্ছিলেন; 'আহাদ', 'আহাদ'।

আমি দেখেছি মুসআব ইবনে উমায়ের (রা.) কে। তিনি যুদ্ধের ময়দানে বাম হাত দিয়ে পতাকা উড্ডীন করে রেখেছেন তার ডান হাত কেটে নেয়ার পর। এরপর বাম হাত কেটে নিলে খণ্ডিত দুই হাতের উপরের অংশ দিয়ে বুকে চেপে ধরেন পতাকা। আমি খালিদ বিন ওয়ালিদের বীরত্বগাঁথা স্মরণ করি। যার দেহে অসংখ্য তলোয়ার-কাটা, তীর-বিধার চিহ্নে ভরা ছিল। এক ইঞ্চি পরিমান চামড়াও পরিষ্কার ছিল না। মনের চোখ দিয়ে তাদের দেখেছি। প্রেরণার বাতিঘর হিসেবে পেয়েছি।

আমার মন, তুমি আনমনা হয়ো না! এখনও দোহায় বসে আমি সেই কাটাতারের বেড়া, অস্ত্রের ঝনঝনানি, হিংস্র কুকুরের গর্জন, রক্তাক্ত জামা-কাপড়ের স্মৃতি মনে করতে পারি। ব্যথার গোঙানী এখনও কানে বাজে। এখনও স্মৃতিতে ভাসে যন্ত্রণার সেই কারাগার গুয়ান্তানামো।

সেখানে জেলার আমাকে একটি নির্জন কক্ষে নিক্ষেপ করে। নগ্ন করে ফেলে। সংকীর্ণ এবং ফ্রীজের মত ঠাণ্ডা সে কারা প্রকোষ্ঠ। এখন স্মরণ করে অবাক হই কিভাবে সেদিন আমাকে একটি কক্ষে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। প্রচণ্ড শীতে থরথর কাঁপছিলাম আমি। ডান পাশের কক্ষ থেকে একটি ক্ষীণ স্বর ভেসে আসছিল। 'আহাদ','আহাদ'।

কিছুক্ষণ পর, আমার বাম পাশের প্রকোষ্ঠ থেকে একজন কয়েদী বলছে, "সামি! বিলাল রা. এর সেই স্মৃতি বুকে ধারণ কর দেখবে শীত চলে গেছে।" আমি হেসে দিলাম। এতকিছু সত্ত্বেও আমি হেসে দিলাম। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের ভাষায়, "পরাজিত হবার জন্য মানুষের সৃষ্টি হয়নি। একজন মানুষ ধ্বংস হতে পারে কিন্তু পরাজিত নয়।"

গুয়ান্তানামো: কষ্টের দ্বীপ

রাতের পাখিটি জানালার পাশে এসে বসে। আরব্য রজনীর গান ধরে।

কোমল হাত স্পর্শ করে আমাকে। "সামি, কেন তুমি এখনো বসে আছো? কেন জেগে আছো? কিছু ঘটেছে?" মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করে আমার স্ত্রী। যার সযতন পরিচর্যায় গত কয়েক বছর ধরে চলা নির্যাতনের ক্ষতগুলো সেরে উঠেছে।

"না তেমন কিছু না" বললাম। আমার পরিবারের সাথে থাকতে পেরে আমি সুখী। স্মরণ করার চেষ্টা করছি ভয়ানক সেই দিনগুলোর কথা। যে দিনগুলো শুধু আল্লাহর বিশেষ সাহায্য নিয়েই কাটিয়েছি।

"হুমম... কিন্তু তোমাকে তো কিছু লিখতে দেখছি না। আল্লাহ তোমাকে সেই কষ্টকর দিনগুলো স্মরণ করার তাওফিক দিয়েছেন। তাই তোমার উচিত সে দিনগুলোর প্রতিটি মুহূর্ত লিখে রাখা।"

"যথার্থ বলেছ, আমার প্রিয়তমা।"

সে চলে গেল। ফিরে এলো কাগজ কলম নিয়ে। আমার সামনে সেগুলো রাখল। পাশে বসল। আমি লিখতে শুরু করলাম। কিছুক্ষণ পর সে উঠে দাঁড়ালো এবং চলে গেল।

প্রিয় পাঠক, আপনারা কি কখনো শীতের রাতে নগ্ন অবস্থায় খসখসে মেঝেতে শুয়েছেন?

এভাবে (বিছানাপাতি, পোশাকাদি ছাড়া, উলঙ্গ অবস্থায়) রাতের পর রাত কাটানোর চেষ্টা করেছেন?

এমন দিন কল্পনা করেছেন? যেখানে দিনের প্রতিটি মুহূর্ত দুঃস্বপ্নের মতো। দেখা মেলে দৃশ্য অদৃশ্য প্রেতাত্মাদের। চারটা করে প্রেতাত্মা একসাথে আসত। মনের খায়েস না মেটা পর্যন্ত থাকত সেখানে।

আমাদের অনেকেই গুয়ান্তানামোতে আশা হারিয়েছেন। নিয়মিত নির্যাতনই নিয়তি-মেনে নিয়েছেন। অবশ্য আমি আশাহত হইনি কখনো। যদিও মাঝেমাঝে হতাশা গ্রাস করত।

গুয়ান্তানামো আমাদের সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছিল বিশেষ করে সেসব মানুষদের যারা সমাজে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, পদে নিয়োজিত ছিল। যাদের সমাজে সম্মান ও অভিজাত পরিচিতি রয়েছে। উঁচুস্তরের মানুষ- যারা অসংখ্য পরিবার দেখাশোনা করতেন, পিতা- যারা সন্তানদের লালন পালন করতেন, সুশিক্ষা দিতেন অথবা যুবক- যারা তাদের পরিবারের জন্য গর্বের কারণ হতে যাচ্ছিল তাদের সবাই গুয়ান্তানামোর নিষ্ঠুর বুলডোজারে পিষ্ঠ হয়েছে। সীমাহীন অত্যাচার আর অদ্ভুত কৌশলের জিজ্ঞাসাবাদে বিপর্যস্ত হয়েছে।

একবার গুয়ান্তানামোতে থাকাকালীন, আমার আইনজীবী আমাকে মামলার নথিপত্র পড়তে দেয়। আমি সেখানে একটি মার্কিন সামরিক কর্মসূচী সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেলাম। 'টিকে থাকা, এড়িয়ে যাওয়া, প্রতিরোধ, পলায়ন' ধাপগুলো তৈরি করা হয়েছে যখন তারা শত্রুর হাতে আটক হয় তখনকার করণীয় সম্পর্কে। যদিও সামরিক কর্মকর্তাদের জন্য করা হয়েছে কিন্তু আমার জন্যও খারাপ হবে না।

নির্যাতন প্রশিক্ষাণার্থী এক সেনাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে যে প্রতিরোধ হলো ধর্মকে অবজ্ঞা করা। নিজেরা কয়েদী হলে যেমন এ শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। তেমনি নিজেদের হাতে কয়েদীদের উপরও তার প্রয়োগ ঘটাতে হবে। সে শাস্তিতে ধর্মীয় প্রতীকসমূহকে অপদস্থ করে কয়েদীদের মানসিকভাবে বিধ্বস্থ করা হয়। প্রশিক্ষকরা প্রশিক্ষণার্থীদের বাইবেলের বক্তব্যকে বিকৃত করে নির্যাতন করত। চিৎকার করে বলত, "তোর প্রভূর উপর অভিশাপ! যীশু খ্রীস্টের উপর অভিশাপ! প্রভুরা অপদার্থ!"

প্রশিক্ষকরা কারা কক্ষগুলোতেও ঝড় তুলত। খাবার প্লেটে লাথি মারত। প্রশিক্ষাণার্থীদের ভয় দেখাতে চোখে তীব্র আলোর লাইট মারত। একই কাজ আমাদের সাথেও করা হতো। তবে আমাদের বেলায় ট্রেনিং শেযে কলিগদের সাথে ভরপেট খাবারের আয়োজন থাকত না। গুয়ান্তানামোতে আমাদের উপর এসব ট্রেনিং ম্যানুয়ালের পুরোপুরি বাস্তবায়ন হতো।

গুয়ান্তানামোর দুটো অনুভূতির স্মৃতি আজো স্মরন করতে পারি। ১. ব্যথায় কুঁকড়ে যাওয়া ২. প্রচণ্ড শীত

জেলাররা এয়ার কন্ডিশন সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় দিয়ে রাখত এমনকি তা ফ্রীজের মাত্রার চেয়েও নিচে নেমে যেত। শীতে থরথর কাঁপতে থাকতাম।

একটি অন্তর্বাসও ছিলনা শরীরে। আমি সুদানের প্রখর তাপে বেড়ে উঠেছি। শীত আমার জন্য সত্যি সত্যি অত্যাচার ছিল।

বেলাল রা. এবং ইতিহাসের খ্যাতিমান ব্যক্তিদের জীবন স্মরণ করতে থাকি। তাদের জীবন আমাকে অভাবনীয় শক্তি যোগায়। এরপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একটু স্বাভাবিক অনুভব করি-যেন সরাসরি আল্লাহর সাহায্য। প্রচণ্ড শীতেও দেহের প্রতিটি কোষে উষ্ণতা ছুঁয়ে যেত। আমি অতিরঞ্জন করছি না, আল্লাহর কসম। আমার কক্ষ মাঝে মাঝে দশ-পনের মিনিট পর্যন্ত উষ্ণ থাকত।

যদি আমি তখন কিছু বলতে পারতাম আমি বলতাম যেমনটা ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ আর্নল্ড টয়েনবি বলেছেন যে, "মানুষ এমন সৃষ্টি যাকে জয় করা যায় না।" আমি আরো যোগ করে বলব, "হৃদয় যার ঈমানী চেতনায় ভরপুর থাকে সে সবকিছু সইতে পারে, সবকিছু।"

প্রহরীরা গুয়ান্তানামোর নিষ্ঠুরতা আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। তারা বিদ্বেষ বসত আমাদের রাতদিন ত্রাসের রাজত্বে পরিণত করত। তারা দাঙ্গাবাহিনী নিয়ে এসে আমাদের প্রকোষ্ঠগুলোতে অত্যাচারের ঝড় তুলত। সাতজন সেনা দেহবর্মীতে সুসজ্জিত হয়ে আমাদের এখানে চলে আসত কোন কারণ ছাড়াই। নির্দয়ভাবে পেটাতে থাকত আর উল্লাস করতে থাকত। আরো ভয়ংকরভাবে পেটাত তাদের যারা একটু ন্যায়বিচারের অধিকার রাখে, অধিকার চাইত।

আটজনের একটা গ্রুপ আসত টিয়ারগ্যাসের পাত্র নিয়ে। আমরা তাদের বলতাম পিপারম্যান। একজন সামনে এগিয়ে আসত। প্রথমে নরম সুরে কথা বলত। এরপর হঠাৎ পাত্রের মুখ খুলে আমার দিকে পিপার স্প্রে করত। যখন আমি চোখ বন্ধ করে ফেলতাম বা ব্যথায় মুখ ঘুরিয়ে নিতাম তখন বাকি সাত জন আমার হাত পা ধরে বাথরুমের গামলায় মুখ চুবাত। এরপর আবার পেটাত। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, সাত জন সশস্ত্র মানুষ দেখে আমার মনে কোন ভীতি কাজ করত না বরং তারাই আমাকে যেন ভয় পেত। তাদের পিটুনির কারণ মেনে নেয়া যায়, কিন্তু তাদের ভীতিকর কর্মকাণ্ড, ব্যথা আর শরীর যে ভঙ্গুর অবস্থায় রেখে যেত, সহ্য করা যেত না।

তাদের আরেকটি অস্ত্র ছিল। সে অস্ত্র দেখা যেত না। কিন্তু মনের মধ্যে যন্ত্রণা সৃষ্টি করত। সে অস্ত্র শরীরে জমা ময়লা পরিষ্কার করতে না পারার

বেদনা। আমাদের শরীরে জমা ময়লা আমাদের শুদ্ধচারিতা ধ্বংস করে দিত। পানি বন্ধ করে দিয়ে সে ধ্বংসগঙ্গায় জোয়ার আনত। শারীরিক পরিচ্ছন্নতা একটি স্বপ্নের বিষয়ে পরিণত হয়েছিল তখন। মনে হতো এভাবে চলতে থাকলে শীঘ্রই আমাদের ঈমান আবর্জনায় মিশে যাবে (কারণ পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ)। দেহের ময়লায় খুবই বিরক্ত ছিলাম। এই নির্মমতা আমাদের হীনবল করে দিয়েছিল।

আমার অনশন ধর্মঘট চলাকালে, প্রায়ই তারা আমাকে ফিডিং টিউব দিয়ে জোর করে খাওয়াত। আমি বমি করে ফেলে দিতাম। আমাকে হেনস্থা করতে সেনারা আমার রুমে পানি দেওয়া বন্ধ করে দেয় যাতে আমি সে বমি, বমিমাখা কাপড় পরিষ্কার করতে না পারি। দীর্ঘদিন আমাকে সে কাপড় পরে থাকতে হয়েছে। দীর্ঘদিন সে বমি, বমিমাখা খাবার আর ফ্রীজের মত ঠাণ্ডা শীতে রাত কাটাতে হয়েছে।

যদি আমাকে নির্বাচন করতে বলা হয় পরিবার বা আইনি সহায়তা থেকে বিচ্ছিন্নতা অথবা শারীরিক মানসিক নির্যাতন কোনটি বেশি কঠিন? আমি বলব, বিচ্ছিন্নতা। এমনকি এটা ওদের বিকৃত মস্তিষ্ক কর্মকর্তাদের বিকৃত যৌন সহিংসতা থেকেও ভয়ংকর। জেলাররা আমাকে প্রথমেই আমার পরিবারে সাথে যোগাযোগ করতে বাধা দেয়। আমি প্রায় পাগলের মত হয়ে গেলাম। নিঃসঙ্গতা আমাকে কুরে কুরে খেতে লাগল। গুয়ান্তানামোতে সৈনিকরা নিত্য নতুন খাবার মেন্যুর মত নির্যাতন স্টাইল নিয়ে হাজির হতো কয়েদীদের সামনে। অফিসাররা অর্ডার দেওয়ার সাথে সাথে সৈনিকরা শুরু করে দিত নির্যাতন। অনেকেই এসব সেনা অফিসার ও সৈনিকদের বিচারের সম্মুখীন করাতে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছেন। একজন ব্রিটিশ সাংবাদিক গুয়ান্তানামো ভ্রমণ করে মন্তব্য করেছেন, "এই জায়গাটি সত্যিকারের নরক।"

সত্যিই এটা নরক। এটা এমন এক নরক যেখানে ঘৃণার দাবানল জ্বলে দাউদাউ করে। পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয় কুৎসিত মানবদের (যদিও ওরা তা বুঝতে পারে না)। এটা এমন এক নরক যেখানে পাগলা কুকুরের মত ঘেউঘেউ করা সেনারা আমাদের দিনরাত পাহারা দেয়। এটা এমন এক নরক যেখানে দুর্ব্যবহার একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। আমাদেরকে পশুর মত টেনে হিচঁড়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হতো। হাতে পায়ে শিকল পড়িয়ে লোহার খাচার ভিতর ছুঁড়ে ফেলা হতো। সাধারণ ইটের

মেঝেতে আমরা পরে থাকতাম। আমেরিকার এই জঘন্য কয়েদখানার শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের ধরন সাধারণ মানুষের কল্পনারও অতীত।

গুয়ান্তানামো কিউবার দক্ষিণপূর্ব কোণে অবস্থিত ১১৬.৫৫ বর্গকিলোমিটারের একটি মার্কিন নৌ ঘাটি। কোন কোন সূত্র মতে, আমেরিকা ১৮৯৮ সালে কিউবার হয়ে স্প্যানিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় জায়গাটি দখল করে। স্প্যানিশরা তখন কিউবাকে শাসন করত। অন্য সূত্রগুলোর মতে, কিউবা ১৯০৩ সালে গুয়ান্তানামো জায়গাটি আমেরিকাকে উপহার দেয় স্প্যানিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সহযোগিতার নিদর্শন হিসেবে। জায়গাটির বার্ষিক ভাড়া ছিল তখন প্রায় দুই হাজার স্বর্ণ মুদ্রা বা ৪ হাজার ৮৫ ডলার।

কিউবা বিপ্লবের পর, ফিদেল ক্যাস্ত্রো আমেরিকাকে জায়গাটি ছেড়ে দিতে বার বার তাগিদ দেয়। বার্ষিক ভাড়া বাবদ অর্থ ফিরিয়ে নিতে বলে। আমেরিকানরা ক্যাস্ত্রোর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে। আগের চুক্তির উপর অটল থাকে। সেভাবেই দুই দেশ এগিয়ে চলেছে।

মার্কিন প্রশাসন গুয়ান্তানামোকে একটি জঘন্য, গোপন জায়গায় পরিণত করেছে বিশেষ করে সন্ত্রাসী হিসেবে বন্দীদের জন্য। পেন্টাগনের এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, সাবেক প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড বলেন, "আমাদের আইন মতে আমরা সেখানে বন্দীদের সাথে যা ইচ্ছা করতে পারি... যে কোন দেশের আইনি বৈধতা ছাড়াই।"

প্রেসিডেন্ট বুশ ২০০১ সালের নভেম্বরে ন্যাশনাল সিকিউরিটি প্রেসিডেন্সিয়াল ডিরেক্টিভ বিলে এই আইনি বৈধতা নিশ্চিত করেন। সেখানে আরো ঘোষনা করা হয়, "আল কায়েদা সন্ত্রাসীরা বিশেষ সামরিক আদালতে বিচারের মুখোমুখি হবে। সে আদালত সাধারণ আদালতের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নয়।" তিনি আরো নিশ্চিত করেছেন যে, তাদেরকে বেওয়ারিশ কয়েদী হিসেবে গণ্য করা হবে কোন যুদ্ধবন্দি হিসেবে নয়। এভাবে তাদেরকে ১৯৪৯ সালের জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী যুদ্ধবন্দির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। আর এভাবেই মার্কিন আইনে তাদের কারাগারে কয়েদীদের নিরাপত্তা অধিকারে নগ্ন হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক আইনকেও দুর্বল করে রাখা হয়েছে।

কয়েদীদেরকে শত্রু সেনা গণ্য করার মার্কিন প্রশাসনের সিদ্ধান্ত আমেরিকানদেরও অবাক করেছে। অবাক করেছে মার্কিন এবং আন্তর্জাতিক আইনে কয়েদীদের অবজ্ঞা করার বিষয়টি। কলিন পাওয়েল প্রশাসনকে বলেন যে, "এই কয়েদী আইন আমেরিকার শত বছরের নীতিবিরুদ্ধ। এ আইন মার্কিন সেনারা যেসব আন্তর্জাতিক যুদ্ধ আইনের সুবিধা পেয়ে থাকে তার বিপরীত। এর ফলে আমেরিকার প্রতি ইউরোপিয়ান সমর্থন হ্রাস পাবে।" মার্কিন প্রশাসন তার কথায় কর্ণপাত করেননি। আমেরিকার মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন একক কণ্ঠ।

গুয়ান্তানামোর বাস্তবতা আড়াল করতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট মিডিয়ার সামনে বলেছেন, "রাজনৈতিক ব্যাপার হিসেবে, আমেরিকার সেনারা কয়েদীদের সাথে মানবিক আচরণ করবে, একই সাথে যথাযথ এবং প্রয়োজন মাফিক সামরিক কৌশলও প্রয়োগ করবে, জেনেভা আইনের প্রতিও শ্রদ্ধা দেখাবে।"

গুয়ান্তানামোতে থাকাকালে আমাকে এর ক্যাম্পগুলোতে অনেকবার ঘোরানো হয়েছে। যদিও সবগুলো ক্যাম্পে কিংবা সবগুলো কক্ষে আমার থাকা হয়নি। তারপরও বলার মত যথেষ্ট আমি দেখেছি। সবগুলো ক্যাম্প আর কারাকক্ষ বা সেল একই ডিজাইনের, একই মানের। এরকম স্থাপত্য নকশার পেছনে যে যুক্তি থাকতে পারে তা হলো, জেলাররা যাতে কয়েদীদের পৃথকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। তাদেরকে সহজেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তাদের অপরাধের (!) মাত্রা অনুযায়ী শাস্তি দিতে পারে।

ছয়টি মূল ক্যাম্প রয়েছে। প্রত্যেকটির নাম্বার দেওয়া আছে। তার সাথে আরো দুটো ছোট ক্যাম্প রয়েছে। একটি ক্যাম্প ইকো আর আরেকটি জঘন্যতম ক্যাম্পের নাম ক্যাম্প এক্সরে। ক্যাম্প এক্সরেকে পরবর্তীতে ক্যাম্প ডেল্টা নাম দেওয়া হয়। ক্যাম্প এক্সরেতে তারা অত্যন্ত বিপদজনক কয়েদীদের রাখত। আর ক্যাম্প ইকোতে আমরা আমাদের আইনজীবীদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারতাম। এছাড়া পিছনের দিকে ৪৮টি কক্ষে রয়েছে বিভিন্ন জিনিস (যেমন খাবারদাবার, পোশাকাদি, সরঞ্জামাদি) ও সেগুলো আনা নেয়ার অসংখ্য ছোট ছোট শিপিং কনটেইনার।

ক্যাম্প-৪ ছিল সবচেয়ে সুন্দর। প্রশাসন এখানে এমন কয়েদীদের রাখত যারা মুক্তি পেতে চলেছে। এক কক্ষে আটজন কয়েদী থাকতে পারে।

কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নিই। মোটামুটি স্বাধীন। তারা একসাথে খেতে পারে, সালাত আদায় করতে পারে। অভিজাত পরিবারের মতই বাথরুমে শাওয়ার, সাবান ব্যবহার করতে পারে। এমনকি তাদের জন্য বিনোদনের ব্যবস্থাও রয়েছে। তারা খেলতে পারে ফুটবল। পিংপংও খেলতে পারে। এটি একটি চত্বরকে ঘিরে চারটি সারিতে সাজানো ভবনের সমষ্টি যা অন্যান্য ক্যাম্পের মত গুচ্ছ, ঘন নয়।

ক্যাম্প-১ এ ছিল আটটি ব্লক। আলফা, ব্র্যাভো, চার্লি, ডেল্টা, ইকো (ইকো নাম দেখে বিভ্রান্ত হবেন না কারণ ক্যাম্প ইকো নামে একটি ক্যাম্পও রয়েছে) গলফ, হোটেল এবং অপরিচিত ইন্ডিয়া। ইন্ডিয়া ব্লকে শারীরিক শাস্তির সাথে মানসিক শাস্তিও দেয়া হয় সম্পূর্ন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে। এখানকার কারাকক্ষগুলো উন্মুক্ত ধরনের। এক বাই দুই বর্গমিটার। স্টিলের কলাম দিয়ে পৃথক করা। কক্ষগুলোর রয়েছে ধাতব বেসিন, কট। সরু মুখ: যেখান দিয়ে আমাদের বের করা হয়।

ক্যাম্প-২ ছিল মাত্র একশ মিটার দূরত্বে। কিলো, লিমা, মাইক, নভেম্বর এবং অস্কার হলো এর একেকটি ব্লক। ক্যাম্প-৩ এর ব্লকগুলো হলো, পাপা, কিউবিক, রোমিও, সিয়েরা এবং ট্যাঙ্গো। যখন আমি প্রথম আসি আমাকে লিমা ব্লকের ৪০ নং সেলে রাখা হয়েছিল।

কক্ষগুলোতে তেমন আসবাবপত্র ছিল না। সামান্য যা কিছু আছে সেসব আবার মাসে মাসে পরিবর্তন করা হয়। সেখানে ছিল একটি ওয়ান টাইম কাপ, পানির বোতল, ম্যাট্রেস, এবং একটি সাধারণ প্লাস্টিকের মাদুর যা আমরা নামাজের জন্য ব্যবহার করি, (অনেক অনুন্নত এলাকায়) টয়লেট বানাতেও এই মাদুর ব্যবহার করা হয়। এটা হচ্ছে সবচেয়ে সম্মানজনক আচরণ নতুন কারো প্রতি। পাশাপাশি একটি করে বিছানার চাদর, কম্বল, তোয়ালে দেয়া হয়।

দ্রুত আমাকে তাদের স্তর বিন্যাসের প্রক্রিয়ায় ফেলা হয়। তারা প্রায়ই আমাদের আচরণের জন্য পুরষ্কার দিত ও তিরষ্কার করত। যারা লেভেল-১ এর পর্যায়ের তারা (নিজেদের সাথে প্রয়োজনীয়) সবকিছু রাখতে পারত কিন্তু যারা দুর্বব্যবহার করত (মানে, তাদের চাহিদামত [illegible]) তাদের অধঃপতন হতো। লেভেল সংখ্যা বেড়ে যেত এবং সবকিছু হারাতে থাকত।

ক্রমেই এসব মৌলিক অধিকার পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠত। কিন্তু তাদের অনুগত হলে সব পাওয়া যেত।

লেভেল-২ এ তারা আমাদের পানির বোতল, ম্যাট্রেস নিয়ে নেয়। লেভেল-৩ এ পানির বোতল, ম্যাট্রেস, কাপ এবং কম্বল নিয়ে নেয়। লেভেল-৪ এ তারা শুধু একটি কম্বল ও একটি প্লাস্টিকের মাদুর রাখে। সবকিছু নিয়ে নেয় এমনকি টুথপেস্ট, সাবানও। এরপরও তারা সন্তুষ্ট না হলে নতুন মাত্রা যোগ করত। সবকিছু নিয়ে নিতো শুধু গায়ের জামাটা ছাড়া।

জিজ্ঞাসাবাদকারীদের মন্তব্যের আলোকে কয়েদীদের লেভেল নির্ণয় করা হতো। তারা লেভেল নির্ণয় করত কয়েদী তথ্য দিয়ে কতটা সহযোগিতা করেছে, কতটা সন্তুষ্ট করতে পেরেছে তার ওপর ভিত্তি করে। সবচেয়ে কঠিন শাস্তি ছিল বিচ্ছিন্নতা। সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে কয়েদীকে একটি নির্জন কক্ষে রাখা হয়। সে কক্ষটির পুরো দেয়াল কালো রং করা। এয়ার কণ্ডিশন বন্ধ। সারাক্ষণ হাজার পাওয়ারের লাইট জ্বলা। কয়েদীদের মধ্য থেকে যাদেরকে সেখানে নেয়া হয় তাদের মাথা মুণ্ডানো হয়। দাড়ি-গোঁফ পুরোপুরি শেভ করা হয়। সাথে যা কিছু আছে সবকিছু কেড়ে নেওয়া হয়।

সৈনিকেরা আমাদের ভয় নিয়ে নির্ভয়ে কাজ করত। আমরা জানতাম তারা আমাদের উন্নতি চায়। কিন্তু কিসের উন্নতি? এই অবস্থা থেকে আরো কষ্টদায়ক স্তরে যা মৃত্যুর আরো কাছে?

গুয়ান্তানামোতে আমাদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের প্রধান কারিগর ছিল ডাক্তাররা। তারা আরো নির্মম ও কষ্টদায়ক শাস্তির পথ বাতলে দিত মার্কিন সৈন্যদের।

তারা স্পষ্ট আমাদের বলত, "আমরা তোদের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত শাস্তি দেব। কিন্তু আবার মরতেও দেব না। তোরা এই পৃথিবীতে জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে পরে থাকবি।"

এরা ছিল এমন ডাক্তার যারা ব্যথা আর কষ্ট নিয়ে হাজির হতো, উপশম করার জন্য নয়। মানুষকে সেবা দেয়ার ডাক্তারি শপথের সাথে তারা বেঈমানী করত। চিন্তা করতে পারেন! বছরের পর বছর এদের বাবা মা ডাক্তারি পড়ার খরচ যুগিয়েছে এই জঘন্য কাজ করার জন্য। তারা নতুন নতুন ব্যথার আয়োজন উপভোগ করে। মেয়াদউত্তীর্ণ বা ভুল ঔষধ প্রয়োগ করে। যেমন, চোখের ড্রপ কানে, কানের ড্রপ চোখে দিতে বলে।

সেখানে তিন ধরনের চিকিৎসা কষ্ট আমরা সহ্য করেছি (অবশ্য আমাদের সবাই সহ্য করে বেঁচে নেই। কেউ কেউ মারাও গেছে)।

প্রথম কষ্ট হলো, একটি জঘন্য সরল উক্তি যেটা গুয়ান্তানামোতে প্রায়ই করা হতো। সেটা হলো "ভুল চিকিৎসা" (Medical Mistakes)। আমি একবার একটা লেখা পড়েছিলাম যে, আমেরিকাতে দেড় লাখ মেডিকেল মিসটেকস হয় প্রতিবছর। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ ও আইনী মারপ্যাঁচের ভয় সত্ত্বেও এ ভুল হয়। অতএব, চিন্তা করে দেখুন গুয়ান্তানামোতে আমাদের অবস্থা কীরকম হতে পারে! কোন পরীক্ষা ছাড়াই ঔষধ দেয়া হতো। সম্পূর্ন মন মতলবি চিকিৎসা দেয়া হতো।

ব্রাদার আব্দাল রহমান আল মাশরির পা এমন জঘন্য ভাবে অপারেশন করা হয়েছে যে তারচেয়ে নিজে নিজে অপারেশন করলেও আরো ভাল হতো। পায়ের ১৫ সে.মি. যেখানে প্লাস্টার করার কথা সেখানে করা হয়েছে ৫ সে.মি.। বাকি অংশের গোসত ঝুলে থাকত আর ব্যথা তাতিয়ে উঠত। প্রায়ই ব্যথায় সে আধমরা হয়ে যেত।

দ্বিতীয় কষ্ট হলো, চিকিৎসায় ব্যর্থ অপারেশন বা অস্ত্রোপচার। তারা ইচ্ছা করেই ব্যর্থ হতো। একাজ করেছে তারা পাকিস্তানের ব্রাদার আনসার আল পাকিস্তানির সাথে। ভাইটি অত্যন্ত সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। ছিলেন শক্তিশালী ও উচুস্তরের একজন সংগঠক। তার দেহে এত বেশি ব্যর্থ অপারেশন চালানো হয়েছে যে তিনি প্রায় পঙ্গু হয়ে গেছেন।

তৃতীয় যে কষ্ট চিকিৎসা ক্ষেত্রে দেওয়া হয় তা হলো, তুচ্ছ কারণে অপারেশন। এ অপারেশন করা হতো মার্কিন সেনাদের মনমতো না চলার কারণে অথবা নতুন চিকিৎসকদের অনুশীলনের প্রয়োজনে। আমরান আল তাঈফীকে বিশবার অপারেশন করা হয়েছে প্রতিবাদে নেতৃত্ব দেয়ার অপরাধে। অপারেশনগুলো চালানো হতো সাধারণত পরিকল্পনামাফিক এবং হঠাৎ করে। মার্কিন সেনারা একে 'সাধারণ রুটিন মাফিক অপারেশন' বলে মন্তব্য করত।

তারা সঠিক ঔষধ না দিয়েও কষ্ট দিত। কষ্ট দিয়ে মজা পেত। গুয়ান্তানামোর নিয়ম অনুযায়ী কোন কয়েদীকে একজন জেলার ঔষধ নাও দিতে পারবে যতক্ষণ না সে মনে করে কাংখিত গোপন তথ্য সে পায়নি। কয়েদী যত অসুস্থই হোক না কেন জেলার ইচ্ছা করলে হাসপাতালকে বলে

দিতে পারে তার চিকিৎসা না করাতে। কয়েদী ব্যথায় চিৎকার করতে থাকবে, চিকিৎসার জন্য মিনতি করতে থাকবে তখন ডাক্তার বলবে, তোমার জেলার বা তদন্ত কর্মকর্তাকে আগে রাজি করাও!

এ ঘটনা ঘটেছে ব্রাদার আলী আল ওয়াইলীর সাথে। তার দুই কান ব্যথায় টনটন করছিল কিন্তু চিকিৎসা দেওয়া হয়নি। আমি আপনাকে প্রশ্ন করি প্রিয় পাঠক, আপনি সে ব্যথার কথা কল্পনা করুন। তাকে ব্যথার যন্ত্রণায় ছটফট করতে দেখেছি। তিনি ব্যথায় বসে থাকতে পারছিলেন না। মার্কিন সেনারা শুধু বলত, "তোমার তদন্তকারীকে বলো।"

বলতে কষ্ট হচ্ছে যে কয়েদীদের চিকিৎসা না দেওয়ার চাইতেও নিষ্ঠুর আরেক পদ্ধতি তারা প্রয়োগ করে। সেটা হলো কয়েদীদের মাদকাসক্তির দিকে ঠেলে দেওয়া। তারা এটা করে দু'ভাবে।

১. অসুস্থ কয়েদীকে তারা নারকোটিক নামক একটি মাদক দ্রব্য দেয়। আসক্তি না আসা পর্যন্ত দিতে থাকে। এরপর এক পর্যায়ে বন্ধ করে দেয়। একে নির্যাতনের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে। তারা এটা যে কারো সাথেই করতে পারে। বিশেষ করে যাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে বলে মনে করে। আমি এরকম একজন আসক্ত কয়েদীকে দেখেছি। যে তার সেলের ভিতর চরকার মতো চারদিকে ঘুরত। নেশার ঔষধ না দেওয়া পর্যন্ত সে ঘুরতে থাকত। নিশ্চিতভাবে সে তাদের সব তথ্যই দিয়েছে যা সে জানত। অথবা যা জানতে চেয়েছে সবই বলে দিয়েছে।

২. অধিকাংশ কয়েদীদের জোরপূর্বক মাদকদ্রব্য গ্রহণ করানো হতো। কয়েদীরা যাতে কারাগারে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে, কোন প্রতিবাদ করতে না পারে। এক কয়েদীকে ছয় মাস পর্যন্ত পাগল করে রাখা হতো। সে দিন রাত বুঝত না। কাউকে চিনতে পারত না। সে তার কক্ষেই পরে থাকত। শুধু পাগলের প্রলাপ বকতো।

কারাগারে ভাইয়েরা নিরবে এসব নির্যাতন সহ্য করে যেত। কাউকে বলত না। পাশের কয়েদীকেও বলত না তার সাথে কী আচরণ করা হয়েছে। কী যন্ত্রণা সে সহ্য করে যাচ্ছে। এ কষ্ট তারা সহ্য করে যেত শুধু অপর ভাইদের ঈমান দুর্বল হয়ে যাবার আশঙ্কা থেকে। এমনকি তাদের সহমর্মিতা, সমর্থন যখন প্রয়োজন হতো তখনও তারা নিরবে সয়ে যেত।

'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে'র সংবাদ সংগ্রহে নিয়োজিত

মাঝে মাঝে আমি ভাবি। ভাবনায় ডুব দিই। কিভাবে শুরু হলো এই যাত্রা। স্মৃতির ডায়েরি খুলে যায়। পৃষ্ঠা ওল্টায়। এক অদ্ভুত শিহরণ জাগে মনে। দেহের ব্যথা আমি ভুলে যাই। কিন্তু মন মুনিয়ার যাতনা বেড়ে যায় বহুগুণ।

আফগানিস্তানে আমার প্রথম নিয়োগের কথা মনে পড়ে। আমাদেরকে সেখানে আমেরিকার 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' সংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহে পাঠানো হয়। প্রথমে আমরা পাকিস্তানে আসি। এরপর সেখান থেকে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে আফগানিস্তানে প্রবেশ করি। আমাদের প্রথম অবতরণ ছিল করাচী; ইসলামাবাদ যাওয়ার ফ্লাইটে সেখানে অবতরণ করেছিলাম। ইসলামাবাদ এয়ারপোর্টে কাতার এম্বেসীর একদল অভ্যর্থনাকারী আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। তারা আমাদের এম্বেসীতে নিয়ে গিয়েছিল সেখানে আরো অনেকেই আমাদের জন্য অপেক্ষামান। এর মধ্যে আছেন রাষ্ট্রদূত আব্দুল্লাহ ফালাহ। তারা আমাদেরকে তাদের সাথে খাবার খেতে দাওয়াত করে। দাওয়াত দেয় আরব আতিথেয়তার নিয়মে। খাবার কক্ষে গিয়ে দেখি বিশাল ডাইনিংয়ে আস্ত ভেড়ার রোস্ট। পাশে আরব্য কফির বিশাল পাত্র।

খাবারের পর নিকটস্থ হোটেলে গিয়ে উঠি। সেখানে আমাদের অনেক সহকর্মী, শুভানুধ্যায়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। সহকর্মী আল জাজিরার প্রতিনিধি আহমাদ জায়দান সেখানে ছিলেন। জায়দান আমাকে টানা তিন দিন সঙ্গ দেন। আফগানিস্তানের ভিসা সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি সহযোগিতা করেন।

আমার মনে পড়ে সে সময় রাষ্ট্রদূত ছিলেন আব্দুস সালাম যাঈফ। যিনি পরবর্তীতে গুয়ান্তানামোতে আমার বন্ধু হয়েছিলেন।

পাকিস্তানে থাকাকালে সেখানকার চমৎকার উর্দু ভাষার শব্দ শুনতে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে যাই। রাস্তায়, অলিগলিতে মানুষের সাথে কথা বলতে আমার ভাল লাগত। ভাল লাগত বিরিয়ানী, চিকেন ভোজ আর মশলা মেশানো কালো চা পান।

ভারতীয় উপমহাদেশে আমি একেবারে নতুন নই। যদিও পাকিস্তানে আমার তেমন চেনাজানা নেই। আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবন পার করেছি ভারতে। যার অভিজ্ঞতা আমাকে এই মাটি ও মানুষের বৈচিত্র সম্পর্কে সমৃদ্ধ করেছে। সুদীর্ঘ ইতিহাস আর সমৃদ্ধ সভ্যতার মিশেলে এক বিস্ময়কর সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। আমি সত্যিই ভারতের মানুষ ও দেশটাকে ভালোবাসি। ভারত আমার জীবন গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ের অংশীদার।

একপর্যায়ে আমরা আমাদের ভিসা পাই। কোয়েটার উদ্দেশ্যে ইসলামাবাদ ত্যাগ করি। সেখানে হাসান আল রাশিদীর সাথে সাক্ষাৎ করি। সেখানে একটি হোটেলে ওঠি যেখানে সব বিদেশি সাংবাদিকরা ওঠে। আমাদের সাথে সিএনএনের এক সহকর্মীও সেখানে ছিল।

সিএনএনের সাথে যৌথভাবে কাজ করেছি চুক্তিবদ্ধ হয়ে। সিএনএন উত্তর আফগানিস্তানের নিউজ কভার করত আল জাজিরার জন্য আর আল জাজিরাও কাবুল ও অন্যান্য এলাকার নিউজ কভার করে সিএনএনকে দিত। কান্দাহারে সিএনএনের একটি ভবন ছিল যেখানে তাদের এক প্রতিনিধি থাকত। কিছু দিনের জন্য আমরা সেখানে থাকার পরিকল্পনা করি।

আমরা আফগানিস্তানে প্রবেশ করি স্থল পথ দিয়ে। প্রথমে শামান পরে বলদাক যাই। জায়গাটি আমার জন্য আফগানে ঢোকার যেমন প্রথম স্থান তেমনি গুয়ান্তানামোতে যাওয়ারও প্রথম স্থান।

আফগান বর্ডারে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন কারি সাহিব। আমাদের আফগান গাইড। আরবিতে কথা বলেন। সে রাতে আমাদের কান্দাহার নিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। গুয়ান্তানামো থেকে বের হবার পর আমি জানতে পেরেছি কারি সাহিবকে হত্যা করা হয়েছে। সে রাতে তার সন্তানেরা আমাদের সাথে ছিল। তারা আজ ইয়াতীম।

আমরা যখন কান্দাহারের সদর দরজায় এসে উপস্থিত হই তখন আকাশে বিমান টহল চলছিল। নগরীর বিমান বন্দর থেকে বিমানগুলো শাঁ শাঁ করে উড়ে আসছিল। আমার মনে পরে, আমাদের সহকর্মী ইউসুফ আল সোমালী যখন কান্দাহার এয়ারপোর্ট থেকে লাইভ করছিল। তখন এয়ারপোর্টে হামলা হয়েছিল। সেটাই ছিল কান্দাহার থেকে প্রথম কোন আন্তর্জাতিক মিডিয়া কাভারেজ।

আমরা সিএনএন সংবাদ মাধ্যমের ভবনে থাকতে শুরু করলাম। কান্দাহার থেকে প্রতিদিন আপডেট দেয়ার কাজ চলতে থাকে। সংবাদের ফোকাস ছিল সে সময় উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধের খবর। কান্দাহারকে তখন তালেবানের রাজধানী বলা হতো। যুদ্ধাঞ্চল হওয়ায় আমাদের চলাচল ছিল সীমিত।

একদিন আমরা ছিলাম বাসার বাইরে। বাজারে কিছু ছবি তোলা, ভিডিও করার কাজে ব্যস্ত। এমন সময় তালেবানরা আমাদের গ্রেপ্তার করে ফেলে। তারা আমাদের সারা দিন আটকে রাখে। কাগজপত্র চেক করে দেখে আমরা সত্যি আল জাজিরার সাংবাদিক কিনা। সন্ধ্যার দিকে তারা আমাদের মুক্তি দেয়। বলে দেয় তাদের অনুমতি ছাড়া যেন বাসার বাইরে না যাই। আমরা বাসায় ফিরে আসি। কাজে নেমে পড়ি। বিভিন্ন এলাকায় মার্কিন বিমানটহলের খবর সংগ্রহ করি।

কান্দাহার একটি পশতুন শহর। কাবুল ও হেরাতের পর তৃতীয় বৃহত্তম আফগান নগরী। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত নগরীটি কৌশলগত কারণে গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসে দেখা যায়, আগেকার সফল শাসকগণ এই নগরীকে দখলে রাখতে ভুল করতেন না।

এর নাম নিয়ে নানান মত রয়েছে। একটি মত অনুযায়ী, নামটি নেয়া হয়েছে পার্শ্ববর্তী আফগান কাশ্মীর সীমান্তে গান্দাহারা রাজ্যের নাম থেকে। আরেকটি মত অনুযায়ী, আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের নামানুসারে কান্দাহার নামকরণ হয়। যিনি এই নগরীকে পুনরুজ্জীবন দান করেন। এবং এশিয়ার এই শহরে তার শাসনের চিহ্ন রেখে যাওয়ার ইচ্ছা পোষন করতেন।

আব্বাসীয়দের যুগে ইসলাম আসে কান্দাহারে। আরব শাসকদের প্রভাব শুরু হয়। সুদৃঢ় হয়। এরপর তুর্কীদের শাসন আসে। ১৮ শতকে এটি আফগানের রাজধানী হিসেবে পরিচিতি পায় পশতুনদের উথানের সাথে

সাথে। কিন্তু অচিরেই কাবুলের কাছে এর জৌলুস ম্লান হয়ে যায়। এখন কাবুল রাজধানী।

যদিও আমেরিকানরা বিশ্বকে জানিয়েছে যে তাদের বিমান টহল সাধারণ মানুষের জন্য হুমকি নয় কিন্তু তাদের অধিকাংশ বোমা নিক্ষেপ ঘটেছে বেসামরিক মানুষের ঘরবাড়ির উপরই। হাসপাতালে শিশুরা কাতরাচ্ছে। বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে গেছে। সব মিলিয়ে বোঝা যাচ্ছে বোমা হামলার লক্ষ্যবস্তু সাধারণ মানুষও। একটি দৃশ্য আমি দীর্ঘ দিন বয়ে বেড়িয়েছি যে, একবার একটি জ্বালানী ট্রাকে যখন বোমা হামলা হলো তখন চালকসহ গাড়িটি পুড়ে ভষ্ম হয়ে গেল। ড্রাইভার ভিতরে ছিল। বের হবার সুযোগ পায়নি। তার শরীর এমনভাবে পুড়ে কয়লা হয়ে গেল যে চেনার উপায় থাকল না। ঘটনাটি ঠিক আমার সামনেই ঘটে। কিন্তু আমার করার কিছুই ছিল না। ঘটনাটি দীর্ঘদিন আমার স্মৃতিপটে একটি কষ্টের স্মৃতি হয়ে থাকে।

আরেকদিন, এক তালেবান সেনা আমাকে একটি বিমান হামলার ব্যাপারে বলে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর কান্দাহারের একটি গ্রামে। আমরা দুইঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে ঘটনাস্থলে কী ঘটেছে দেখতে গিয়েছিলাম। দেখলাম পুরো একটি গ্রাম ধ্বংস হয়ে গেছে। বিমান থেকে এমনভাবে বোমা ফেলা হয়েছে একটি কবরস্থান, মসজিদও অখণ্ড নেই।

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে বিপর্যয় ঘটানো হয়েছে। তার নিচে চাপা পরেছে অজস্র কান্না। গ্রামবাসীদের অনেকে গিয়েছিল জীবিকার সন্ধানে। নিরিবিলি গ্রামে নিরাপদে রেখে গিয়েছিল স্বজনদের। কিন্তু এসে দেখে এক বিধ্বস্ত গ্রাম। ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত স্বজনদের দেহ নিথর পড়ে আছে। তারা বিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কুড়িয়ে এনে কবর দেয়। সেখানে এক বৃদ্ধ কাঁদছিল। কী হয়েছে জানতে চাইলাম। বললেন, পাশের বাজারে গিয়েছিলেন কিছু জিনিস বিক্রি করে প্রয়োজনীয় খাবার কিনতে। এসে দেখেন পরিবারের স্ত্রী, সন্তান নাতী-নাতনীসহ আঠারো জনের সবাই মরে পড়ে আছে।

আমি একজন দোভাষীর মাধ্যমে তার সাথে কথা বলছিলাম। একপর্যায়ে ওই বৃদ্ধ আমাদেরকে তার নাতী যে খেলনা বিমান দিয়ে বিছানায় খেলত তা দেখাতে নিয়ে যায়। দোভাষী আমাকে বলে যে বৃদ্ধটি বলছিল,

'কী অপরাধ করেছিলাম আমরা যে আমাদের পরিবারের সবাইকে মেরে ফেলতে হবে? কী আমাদের অপরাধ যার দরুন আমার দুধের শিশুর এই পৃথিবী সম্পর্কে জ্ঞান হবার আগেই পৃথিবী ত্যাগ করতে হলো? কেন এই গ্রামে হামলা? বিধ্বস্ত গ্রামবাসীদের উত্তর ছিল-এই গ্রামে প্রতি বুধবার হাট বসে। প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। এই সমাগম দেখে মার্কিন সেনারা ভয় পেয়ে যায়। তারা মনে করে এটা তালেবানদের সমাবেশ। তারা নিশ্চিত না হয়েই সাধারণ নিরীহ দরিদ্র মানুষের উপর বোমা হামলা শুরু করে। আমরা সে গ্রামের ব্যাপারে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে আল জাজিরায় পাঠিয়ে দেই।

যখন মাগরিবের সালাতের সময় হলো আমরা ইমাম সাহেবকে সালাত শুরু করতে বললাম। কিন্তু তিনি শরীর ভাল না লাগার কথা বললেন। আমরা মেনে নিলাম। আমাদের সহকর্মী ইউসুফ সালাত পড়ালেন। সালাত শেষে ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি কেমন বোধ করছেন, কেন তিনি ইমামতি করতে পারলেন না। তিনি বললেন তিনি এরকম আর কখনো বোধ করেননি। এই প্রথম একজন তার কাছে সাহায্য চেয়েছে আর তিনি সাহায্য করতে পারেননি।

আমি তাকে বললাম ঘটনা খুলে বলতে। তখন তিনি বললেন, আপনার কি মনে পড়ে আপনি যখন একজন লোকের সাক্ষাতকার নিচ্ছিলেন তখন আপনার পাশে আরো কিছু লোক কাঁদছিল এবং আপনার সাথে কথা বলছিল?

"তারা বলছিল যে বিমানগুলো যখন গ্রামটিকে ঘিরে বোমা বর্ষণ করতে থাকে। তখন পাহাড়ের পাদদেশেও কিছু বসতি ছিল। সে বসতিগুলো এখন পাথর চাপা পড়েছে। গ্রামের সে লোকটি চাচ্ছিল কেউ একজন তাকে ধ্বংসস্তূপ থেকে তার পরিবারের লোকদের মৃতদেহ উত্তোলনে সাহায্য করুক। যাতে সে তাদের কবরস্থ করতে পারে।"

আমি ইমাম সাহেবকে কথা দিলাম পরদিন ফজরের নামাজের পর আমরা তার সাথে সেখানে যাব। হতভাগা লোকগুলোর শেষ পরিণতি কী হয়েছে দেখব। ছবি, ভিডিওসহ পুরো ঘটনার বিবরণ নিউজ করব। পরদিন ভোরে শপথমত বেরিয়ে পরলাম। গ্রামের বন্ধুর পথ ধরে গাড়ি ছুটিয়ে দিলাম।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর গাড়ি থামিয়ে দিতে হলো। পায়ে হাঁটলাম প্রায় দু'ঘন্টা। আমি গ্রাম্য উঁচুনিচু পথে হাঁটতে কিংবা হিমালয়ের হিমশীতল পথে গাড়ি চালাতে, হাঁটতে অভ্যস্ত না। আমি হাঁপাচ্ছিলাম তারপরও চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম হাঁটতে, পায়ের জোর ধরে রাখতে।

গ্রামের কাছাকাছি আসতেই আমরা দেখি রকেটের কাটা, মার্কিন সেনাদের নিক্ষিপ্ত বোমায় সৃষ্ট হওয়া বিশাল গর্ত। গর্তটিতে একজন আস্ত মোটাসোটা মানুষ পুঁতে রাখা সম্ভব। বোমার আকার ও পরিমাণ দেখে আমি খুবই অবাক হলাম। কত কত টন বোমা তারা তৈরি করেছে কত কত বিস্ফোরক দ্রব্য লেগেছে এসব বানাতে। এই বিধ্বংসী বোমা তারা নিক্ষেপ করছে এসব গ্রাম্য মানুষের উপর!

আমরা হাঁটতে লাগলাম। গ্রামের যত ভেতরে যাচ্ছি ততই বড় বড় গর্ত দেখতে পাচ্ছি। এক পর্যায়ে গিয়ে দেখি শুধু পাথর। এক নজর চোখ বোলালেই আসলে বোঝা যায় যে এরা একরকম যাযাবর, গুহাবাসী। তাদের না আছে আমেরিকান সেনাদের মোকাবিলা করার শক্তি। না আছে তালেবানদের সাথে কোন সম্পর্ক। এই প্রচণ্ড শীত কবলিত গ্রামে মানুষজন বোমার ভয়ে কাঁচা মাটিতে গর্ত করে থাকছে। উন্নত রুমহিটার সমৃদ্ধ বাড়ি বাদ দিয়ে। অনেকটা সৈনিকদের তাঁবুর মত দেখতে সেসব ঘরবাড়ি। মার্কিন সেনারা এসব তাঁবুর মত ঘরবাড়িকে তালেবানদের আস্তানা ভেবে বোম্বিং শুরু করে। নিরীহ মানুষগুলোকে মারতে শুরু করে।

কাবুল দখল করে আমেরিকানরা হেরাত দখলের জন্য এগোতে থাকে। বোম্বিং করে করে দখল করে নেয়। এরপর নজর দেয় কান্দাহারের দিকে। মার্কিন সেনারা কান্দাহার শহরে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পরে। প্রতিদিন অসংখ্য বেসামরিক মানুষ বোমায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে মারা যায়। নারী, শিশু, বৃদ্ধরাই বেশি। শহরের প্রধান হাসপাতাল চাইনিজ হাসপাতাল তখন জনাকীর্ণ হয়ে উঠে।

সেই রাতে কান্দাহারে ঘুমাইনি। সারারাত বাইরে ছিলাম। কাজে ব্যস্ত ছিলাম। সকালে ফিরে এসেছি যদিও তখন বাইরে বোম্বিং হচ্ছিল। অবস্থা আরো খারাপ হলো যখন বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হলো। তখন শুধু ওই চাইনিজ হাসপাতাল ছাড়া আর কোথাও কোন আশ্রয় নেবার জায়গা নেই। তাই আমরা চ্যানেলে নিউজ পাঠাতে সেখানে গেলাম।

এই কঠিন মুহূর্তে বরকতের মাস রমাদান এসে পড়ে। কিন্তু সেবার রমাদানের প্রথম দিনেই আমরা তালেবানদের থেকে শহরের দখল ছেড়ে দেওয়ার ঘোষণা শুনি। আমাদের আফগান দোভাষী আমাদেরকে এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বলে। তার সোজা কথা, "যদি তালেবান চলে যায় তবে শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে। আফগানীরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়বে।" আমি এখনো তার সে কথা স্মরণ করতে পারি। সে বলেছিল, "সামি, আপনি আফগানদের চেনেন না। যখন তারা নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তখন তারা কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে যায়। আমি আপনাকে একটিই পরামর্শ দেব-আপনি কান্দাহার ত্যাগ করুন।"

তাই আমরা রমাদানের প্রথম দিনেই কান্দাহার ত্যাগ করি। ইউসুফ আল সোমালি, ইঞ্জিনিয়ার ইবরাহীম নাসার এবং আমি। আমরা বলদাকের সীমান্ত অঞ্চলে যাই। সেখান থেকে চামান এবং কোয়েটাতে।

তালেবান নেতা মোল্লা মুহাম্মদ ওমরের বিশেষ সচিব তাইয়্যেব আগার বলদাকে একটি প্রেস কনফারেন্স করার ঘোষণা দেওয়ায় আমরা কোয়েটাতে কয়েকদিন থাকার সিদ্ধান্ত নিই। তাই অন্যান্য সাংবাদিকদের সাথে আমরাও সাংবাদিক সম্মেলন কভার করতে থেকে যাই।

বলদাকে আমাদের আফগান উদ্বাস্তুদের দেখার সুযোগ মেলে। আরো একটি অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হই। অত্যন্ত তিক্ত সে অভিজ্ঞতা। বলদাকে আমরা উদ্বাস্তু শিবির পরিদর্শনে যাই। বছর বিশেকের একজন নারীর দিকে চোখ আটকে যায়। সে তার সন্তানদের মাঝে বসে ছিল। বসে বসে তিনি কাপড় ধুচ্ছিলেন। কর্দমাক্ত পানিতে। কোন সাবান ছিল না। এক হাতে কাপড় ধোয়া আরেক হাতে সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছিলেন। তার পাশে তিন বা চার বছরের এক ছোট বালক দাঁড়িয়ে কাঁদছিল।

আমার কাছে মনে হয়েছে, এই দৃশ্যটিই আফগানিস্তানের চিত্র। আমি তার অবস্থা ভিডিও করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি পৃথিবীকে জানাতে চাই এখানে কী পরিস্থিতি চলছে। দেখাতে চাই আমেরিকার যুদ্ধে আক্রান্ত মানুষদের অবস্থা কি রকম। আমেরিকার বোমা বর্ষণে কতটা বিধ্বস্ত হয়েছে আফগান জনপদ। অথচ মার্কিনিরা প্রচার করে বেড়াচ্ছে তারা বিশ্ব শান্তি, মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের সুরক্ষাদাতা।

আমি ভিডিও করা শুরু করলাম। সেখানে তার সামনে একটি পুড়ে যাওয়া সুটকেস ছিল। আমি তার চারপাশের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জিনিসগুলোরও ভিডিও করি। আমি তার পাশে আংশিক পুড়ে যাওয়া এক কপি কুরআন মাজীদও দেখতে পাই। আমি যখন সে দৃশ্য আরো কাছ থেকে ধারন করতে যাই দেখি তার উপর একটি লাল সুতা পেঁচানো বল রাখা। আমি কাপড়ের টুকরাটি একটু একপাশে রাখতে গিয়েছি ওমনিই সে মহিলা এক ছো মেরে মাটিতে ধপাস করে বসে পড়ে। যেন তাকে জ্বীনে ধরেছে। সে কান্না-চিৎকার করে বিলাপ করতে শুরু করে দিল। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম না কেন এমন করছে সে। আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। দোভাষীকে জিজ্ঞেস করলাম, “কেন সে এত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল? আপনি তাকে সোজা করে ধরে রাখুন যাতে তার কাপড় চোপর ঠিক থাকে।”

হঠাৎ তার মা দৌড়ে এলো। সে আমাকে একপাশে ঠেলে দিল। পশতু ভাষায় রাগতস্বরে আমাকে কি যেন বলল। দোভাষীকে জিজ্ঞেস করলাম। দোভাষী জানালো, আমি কেন লাল কাপড়ে বাধা গোলাকার বস্তুটি ধরেছি, কেন তার মেয়ে এভাবে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে- সে জন্য তিনি চটেছেন।

মহিলাটি দোভাষীকে বলল, লাল বস্তুটিতে তার মেয়ের যুবক স্বামী, পিতা, ভাই এবং ভাইয়ের স্ত্রীর পোড়া লাশের ভস্ম জমানো আছে। যুদ্ধবিমানের বোমা নিক্ষেপে তাদের গ্রামের প্রায় সবাই মারা যায় শুধু মেয়েটি তার দুই শিশু সন্তান আর মা বেঁচে যায়। সবকিছু হাতছাড়া হয়ে গেছে শুধু আছে এই স্মৃতিটুকু। যা সে সব সময় তার সঙ্গে রাখে।

এই মহিলার চিত্র আর তার পরিবারের ঘটনাটি আমার হৃদয়ে গেঁথে যায়। বিশেষ করে তারা এমন লোক যারা জানে না তাদের সাথে কী ঘটছে। তারা জানত না কাবুল আফগানিস্তান নামক দেশের রাজধানী, তাদের একটি জাতীয়তা রয়েছে। তারা এটাও জানত না যে আমেরিকার সাথে তাদের 'সন্ত্রাসবাদ' ইস্যুতে যুদ্ধ চলছে।

যখন আমরা শুনতে পেলাম যে তালেবানদের পতন হয়েছে তখন পাকিস্তানে চলে আসি। ভিসা সংক্রান্ত কাজগুলো সমাধা করি। ইসলামাবাদে আসার পথ ধরি। সেখান থেকেই আমরা পরিকল্পনা করি এ যাত্রা এখানেই ইতি টানার। তখনো রমাদান চলছিল। পাকিস্তানে এসে আমরা অংশ নিই কাতারি রাষ্ট্রদূত আব্দুল্লাহ আবু ফালাহর ইফতারির দাওয়াতে।

ইফতারিতে যাই সহকর্মীরা মিলে। ইউসুফ আল সোমালি, ইঞ্জিনিয়ার ইবরাহীম, আহমেদ জায়দান এবং মিয়া বাইদুন ছিলেন আমার তখনকার সহকর্মী। আমরা সেখানে সৌদি এম্বেসীর কর্মকর্তাদের সাথেও মিলিত হই। তাদেরকে পাকিস্তানি সীমান্তে আটক সৌদি নাগরিকদের সম্পর্কে বলি। এছাড়া আটক অন্যান্য আরবদের সম্পর্কেও বলি। তাদের মধ্যে অধিকাংশই ইয়ামেনী যারা বিভিন্ন কারণে সেখানে এসেছিল। আফগানিস্তানের অবস্থা বেগতিক দেখে পাকিস্তান সীমান্ত দিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে নারী, শিশুসহ প্রায় শতাধিক পরিবার।

রাষ্ট্রদূত আবুল ফলাহ নিশ্চিত করেন যে এসব পরিবারের ব্যাপারে তিনি আগেও শুনেছেন। ইয়ামেনী রাষ্ট্রদূতের সাথে আলাপ করে তিনি দ্রুতই সর্বশেষ অবস্থা জানবেন এবং তার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিবেন।

খাবার শেষে আমি হোটেলে ফিরে আসি। দোহায় ফিরে যাবার প্রস্তুতি নিই। রুমে আসার কিছুক্ষণের মধ্যেই রাষ্ট্রদূত আবুল ফলাহর ফোন। জানালেন, আল জাজিরার ডিরেক্টর মুহাম্মদ জসিম আল আলী তার সাথে যোগাযোগ করে আমাকে পাকিস্তানে থেকে যেতে বলেছেন। আফগানিস্তানে যাবার ভিসা রিনিউ করা হবে। দোহা থেকে নতুন একজন সহকর্মী আসছেন। আব্দুল হক সাদ্দাহ। কান্দাহারে নতুন সরকারের নিউজ কভার করার জন্য।

এম্বেসী আমার পাসপোর্ট নিয়ে নেয় রিনিউ করার জন্য। যাতে পাকিস্তানে আরো তিন মাস থাকতে পারি। কাজ শেষে রাষ্ট্রদূত আমাকে জানালেন, আমিরাতের রাষ্ট্রদূত কোয়েটায় তার ব্যক্তিগত বিমানে করে সফরে যাবেন। আমি ইচ্ছে করলে তার সাথে যেতে পারি। সেখানে আব্দুল হক সাদ্দাহ রয়েছেন। সেখান থেকে আমরা কান্দাহার যাবো।

পরদিন আমি আমিরাতের রাষ্ট্রদূতের সাথে কোয়েটায় যাই। বিমান যখন এয়ারপোর্টে পৌঁছে, দেখলাম, একটি সামরিক বিমান, আবুধাবি টিভির একঝাক সাংবাদিক তার জন্যে অপেক্ষা করছে। তারা পাকিস্তানি সীমান্তে আরব আমিরাত সরকারের মানবতাবাদী কর্মকান্ডের নিউজ কভার করতে এসেছে। আমি তাদের সাথে থাকতে চাইলাম কিন্তু পাকিস্তানের এক সেনা তাতে বাঁধ সাধলো। বলল তাদের বিমানে আর কোন জায়গা নেই। রাষ্ট্রদূত না নিতে পারায় দুঃখ প্রকাশ করলেন।

এয়ারপোর্টে আমার কাগজপত্র চেক করা এক সেনা কর্মকর্তা আমার বিস্তারিত পরিকল্পনা জানতে চাইলেন। আমি তাকে বললাম, কোয়েটার এক হোটেলে আমার সহকর্মীর সাথে মিলিত হবো এরপর আমরা তালেবান সরকারের পতন পরবর্তী নিউজ কভার করব। ইমিগ্রেশনের কাজ শেষে গাড়ি ভাড়া করি। আব্দুল হক সাদ্দাহর কাছে এসে কান্দাহার যাবার পরিকল্পনা হয়।

পরদিন শামানের উদ্দেশ্যে কোয়েটা ত্যাগ করি। শামান দিয়ে আফগানে প্রবেশ করব। রাস্তা ভাল না। আমরা আমাদের আফগান দোভাষীকে খুঁজে পেলাম না। জানি না সামনে কি হবে। শামানের ব্যাপারে আমাকে সতর্ক করা হয়েছিল। এখানকার মানুষদের কাছে আরবীয় চেহারার মানুষেরা নিরাপদ নয়। বার্তাটি সত্য হলে আমরা নিশ্চিত বিপদের মুখে আছি।

আমরা শামান সীমান্তে থেকেই কিছু আপডেট দেবার চেষ্টা করলাম। আমার মনে পড়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও সীমান্তরক্ষী বাহিনী আফগান সীমান্তের দুই তিন কিলোমিটারের মধ্যে টহল বসিয়েছে। পাকিস্তানি পতাকা নিয়ে তারা চলাফেরা করছে।

“আমরা জানি এটা একটি ভুল”

ভালোবাসার হাত ছুঁয়ে যায় আমায়। “সামি! তোমার অনেক দেরি হয়ে গেছে,” আমার স্ত্রী বলে উঠে।

আমার স্মৃতিগুলো জেগে উঠে। জীবন্ত হতে চায়। এরকম আগে কখনো মনে হয়নি। আমি সবকিছু লিখে ফেলতে চাই। সে জানালা খুলে দেয়। হাসিমুখে। বলে, “তোমার রাতের বন্ধু তোমার পাশেই থাকবে। তোমার জন্য গান গাইবে। নিজেকে পরিশ্রান্ত মনে করো না।”

সে সন্তর্পণে রুম ত্যাগ করে। আমি লিখতে শুরু করি,

আমরা সীমান্তে কিছু দিন অবস্থান করি। রমাদানের শেষ দিনে, ১৫ ডিসেম্বর, আমরা কান্দাহারের দিকে এগোই। সকাল সকাল পাকিস্তান ত্যাগ করে আফগানিস্তানে প্রবেশ করতে পাক সীমান্তে গিয়ে হাজির হই। আমরা একদল সশস্ত্র লোককে ভাড়া করি কান্দাহার পর্যন্ত নিরাপত্তার জন্য।

বিভিন্ন মিডিয়ার প্রায় সত্তরজন সাংবাদিক সীমান্তে অপেক্ষা করছিল কান্দাহার ঢোকার জন্য। দেখলাম অসংখ্য ছোট ছোট দল আল্লাহর ওয়াস্তে বের হবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। আমরা আমাদের পাসপোর্ট, সাংবাদিকের কার্ড পাক সেনাদের হাতে দেই চেকিংয়ের জন্য। আমাদের কাগজপত্র দিতে সময় নিচ্ছিল কর্মকর্তারা। সহকর্মী সাদ্দাহ এই প্রথম যাচ্ছিল কান্দাহার। সে সন্দেহ করছিল তাদের এই সময় নেওয়া নিয়ে। আমি বললাম সীমান্তের পাক সেনারা মাঝেমাঝেই কাগজপত্রের জন্য ঘুষ চায়। সে বলল, কোন ভাবেই এমনটা হতে পারে না আমাদের সকল কাগজপত্র ঠিক আছে সুতরাং তারা

কিছু দাবী করতে পারে না। আমি তাকে বাস্তবতাটা বুঝানোর চেষ্টা করলাম। এইসব অফিসাররা অনেকটা নিঃসঙ্গ, উচ্ছিন্ন জীবনযাপন করে। একটু উপরি কামাইয়ের ধান্দায় লেগে যায় সুযোগ পেলেই।

সময় আমাদের পক্ষে যাচ্ছে না। ব্যাপারগুলো কেমন অস্বাভাবিক লাগে তাই সাদ্দাহর কাছে। এক সীমান্ত অফিসারের কাছ থেকে জানা গেল ব্যাপারটা আসলে ঘুষের না। কোথাও একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে।

আমরা আরো এক দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করলাম। এরপর একজন অফিসার আসলেন। আমার হাতে একটা কাগজ ধরিয়ে দিলেন। এতে বলা আছে সুদানি এক সাংবাদিক/ক্যামেরাম্যান আল জাজিরার হয়ে কাজ করছেন। বলা হলো, তাকে কাজ বন্ধ করতে হবে এবং পাকিস্তানে ফিরে আসতে হবে। কাগজে আমার জন্মদিন, পাসপোর্ট নাম্বার এবং নামের ইংরেজি বানান ভুল।

অফিসার বললেন, আমরা জানি এটা ভুল। আপনি এর আগেও সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ওপারে গিয়েছেন আর আমরা আপনাকে ভাল জানি। কিন্তু এই কাগজ ইস্যু করা হয়েছে চার পাঁচ দিন আগে।

আমি তাকে বললাম আমি ইসলামাবাদে নিজে থেকে কাগজপত্র করিয়েছি। যদি কোন ভুল হয় তাহলে কী আর করা এখানেই ক্ষান্ত দেই। তিনি আবারো বললেন কোন একটা ভুল হয়েছে। সে ভাল করেই জানত আমি এখান দিয়ে এর আগেও যাতায়াত করেছি। তিনি আমার প্রবেশ এবং বাহির প্রসেসিং করেছেন। তিনি ভুল ঠিক করে দিতে বলেন কয়েকবার।

আমরা আরো কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করি। আমাদের আল জাজিরা সহকর্মীরা নতুন খবর জানানোর জন্য ফোন দিচ্ছে। আমরা ঘটনা জানালাম যে আমরা এখনো সীমান্ত পার হতে পারিনি। আল জাজিরা ডিরেক্টর জনাব আল আলী আমাদের ইমিগ্রেশন অফিসে বসিয়ে রাখার কারণ অনুসন্ধানের কথা বললেন।

"কিছু একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে" তিনি মন্তব্য করলেন। তিনি কাতার এম্বেসীকে হস্তক্ষেপ করারও অনুরোধ করবেন বলে জানালেন। কাতার এম্বেসীর দ্বিতীয় সচিব আমাদের ফোন দিয়ে পরিস্থিতি জানতে চাইলেন। আমরা তাকে বিস্তারিত জানালাম। তিনি ব্যাপারটাকে তুচ্ছ বিষয়

মনে করলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সমাধা করে দেবেন বলে আশ্বাস দিলেন। আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম।

প্রায় বিকেলবেলায়, জনাব আল আলী আবার ফোন দিলেন। আবারো জানালাম আমরা এখনো সীমান্তে আছি। আমাদেরকে একাধিকবার সীমান্ত অফিসাররা চেক করে। জিজ্ঞেস করলে বলত গোয়েন্দা সংস্থা এখনো অনুমতি দেয়নি।

বিকেল তিনটার দিকে একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তা সীমান্ত অফিসে আসে। এসেই সে আমার পাসপোর্ট এবং সাংবাদিক কার্ড তদন্ত করে দেখে। তার সহকর্মীরা তাকে গোয়েন্দা বাহিনীর কাগজপত্রও দেখায়। একটি ভুল হয়ে গেছে। সমস্যার সমাধান হবে কোয়েটা সদর দফতরে। সে চলে গেল। আমরা সে রাত সীমান্তে কাটালাম। পরদিন সকালে ঈদ।

পাসপোর্ট কর্মকর্তারা গোয়েন্দা শাখায় যোগাযোগ করে আমার ব্যাপারে বলল, যেহেতু আমার ব্যাপারে (যে গোয়েন্দা অফিসার এসেছিল সে) কোন সিদ্ধান্ত দিয়ে যায়নি তাহলে কেন আমাকে আটকে রাখবে, বরং পাসপোর্ট ফেরত দিয়ে আমাকে ছেড়ে দিবে। গোয়েন্দা শাখা থেকে বলা হয়, "যদি আপনি এমনটি করেন তবে আপনাকে জেলে যেতে হবে।"

সীমান্ত কর্মকর্তা জেদ করে বলেন, "যদি আপনি দু'ঘণ্টার মধ্যে কোন সিদ্ধান্ত না জানান তবে আমি তাকে ছেড়ে দেব।"

দু'ঘণ্টার মধ্যে একটি গোয়েন্দা শাখার গাড়ি এসে উপস্থিত হয়। তারা আমাকে তাদের সাথে যেতে বলে। এরপর থেকে সহকর্মী আব্দুল হক সাদ্দাহর সাথে আর দেখা হয়নি।

গোয়েন্দা শাখার অফিসে আমাকে একটা কক্ষে রাখা হয়। তারা আমাকে এটাও নিশ্চিত করে যে ভুলটি সংশোধন করা হবে। আমি ঈদের দিনের অবশিষ্টাংশ তাদের সাথে কাটাই। পরের দিন কাতার এম্বেসীর দ্বিতীয় সচিব এখানে আসেন। তার সাথে একজন কাতার গোয়েন্দা কর্মকর্তা ও বেশ কিছু কর্মচারী ছিল। তারা প্রায় আঠারো ঘণ্টা সড়ক পথ পাড়ি দিয়ে এখানে এসেছেন কারণ তারা বিমান টিকেট পায়নি।

প্রতিনিধিদল পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার সংশয় দূর করে আমাকে দোহায় নিয়ে যেতে এসেছেন। দ্বিতীয় সচিব কাতার এম্বসীর সীল সম্বলিত ইংরেজিতে লেখা একটি দাপ্তরিক পত্র তুলে ধরলেন। যাতে নিশ্চিত করা

হয়েছে যে আমি সামি আলহায। একজন সাংবাদিক। এত সুপরিচিত মুখ যার ব্যাপারে পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থার সন্দেহ করার কোন কারণ থাকতে পারে না। কাতারের কূটনৈতিক কর্মকর্তা আরো বলেন যে সে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে চেনেন এবং আমি কাতার দূতাবাস অসংখ্যবার ঘুরে গেছি।

গোয়েন্দা কর্মকর্তা তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিকট সে পত্রটি ফ্যাক্স করে পাঠায়। আমরা কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করি কিন্তু কোন উত্তর আসে না। গোয়েন্দা কর্মকর্তা কাতার প্রতিনিধি দলকে ফেরত যাবার অনুরোধ করেন। সম্ভবতঃ কোয়েটা অফিস ঈদের ছুটিতে বন্ধ ছিল। সচিব ও তার সফরসঙ্গীরা কোয়েটায় ফেরত গেলেন। তারা কথা দিয়েছিল তারা পরের দিন একটা সুরাহা করবে অথবা নতুন কিছু জানাবে।

পরের দিন কাতার কূটনৈতিক দল আমাকে জানালেন যে তারা কোয়েটা অফিসে আলাপ করেছেন কিন্তু তাদেরকে বলা হয়েছে যে ব্যাপারটা ইসলামাবাদ গোয়েন্দা অফিসের সিদ্ধান্ত ছাড়া কোন সুরাহা হবে না। সময় লাগবে। পাক গোয়েন্দা কর্মকর্তারা সেসময় ব্যস্ত ছিলেন। হয় ঈদের ছুটির কারণে নয়তো কাশ্মীরে ভারতের অভিযানের আশঙ্কা থেকে। এছাড়া গোয়েন্দা প্রধান তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে চীন সফরে ছিলেন।

দু'দিন পর। দূতাবাস থেকে ফোন আসে। তারা জানায়, কোয়েটা অফিস এখনো কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেনি। ইসলামাবাদ অফিসের সাথে যোগাযোগ শুরু করবে। আমি গোয়েন্দা অফিসের এক রুমেই পড়ে থাকি। পাকিস্তানি গোয়েন্দা অফিসারের কাছে আমার পরিবারের সাথে কথা বলার অনুমতি চাইলাম। তিনি অনুমতি দেন। বুঝতে পারেন আমার আটকাবস্থা একটি ভুল বোঝাবুঝি। তাই তিনি আমাকে আমার ফোনে কথা বলতে দেন। আমি তাকে টাকা দিই। তিনি মোবাইল রিচার্জ কার্ড কিনে দেন।

স্ত্রী উম্মে মুহাম্মদকে ফোন দিই। সে আজারবাইজান দেশের মানুষ। তাকে এবং তার পরিবারকে বরকতময় ঈদের শুভেচ্ছা জানাই। শীঘ্রই দেখা হবার প্রত্যয় ব্যক্ত করি। এরপর সুদানে বাবা-মার কাছেও ফোন দেই। তাদেরকে আমার আটকাবস্থার কথা জানালাম না। কারণ, আমি এখনো আশাবাদী একটি ফোন আসবে যার ফলে এই জটিল অবস্থার অবসান ঘটবে।

সাদ্দাহকে কল দেইনি। যেহেতু কাতার দূতাবাসের মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে সে কান্দাহার পৌঁছে গেছে এবং আমার প্রতীক্ষায় রয়েছে।

পাকিস্তানি গোয়েন্দা অফিসে প্রায় তেইশ দিন অবস্থান করি। ১৬ ডিসেম্বর হতে ৭ জানুয়ারী পর্যন্ত। এ সময় স্বাধীনভাবে এদিক সেদিক ঘুরতে পারতাম। ভবনের বাইরের টয়লেটের পাশাপাশি ভিতরকার গরম পানির টয়লেটও ব্যবহার করতে পারতাম। নিজের টাকায় খাবার কিনতাম পরবর্তীতে অসুস্থ হলে ঔষধ কিনতাম। তারা একজন ডাক্তার নিয়ে এসে আমার চিকিৎসাও করিয়েছিল।

জানুয়ারি ৭ তারিখে একটি আদেশ এসেছে আমাকে সুদানি সরকারের কাছে হস্তান্তরের। আমি খুব খুশি হই। কাতার এম্বেসীতে ফোন দিয়ে দ্বিতীয় সচিবকে পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের সে আদেশের কথা জানাই। "তারা মিথ্যা বলছে" তিনি বলেন। আমরা আপনার ব্যাপারে তৈরি করা পাক গোয়েন্দাদের ফাইল দেখাতে বলি। সেখানে কি কি অভিযোগ আনা হয়েছে তার প্রতিউত্তর আমরা যাতে দিতে পারি। কিন্তু যে ফাইল দেখানো হয়েছে তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আমরা তাদেরকে ব্যাপারটা মিটমাট করতে বলি কিন্তু তারা বিশ্বাসই করে না যে আপনি অপরাধী নন। বরং তারা বলেছে তারা কিছু মার্কিন গোয়েন্দা কর্মকর্তার সাথে আপনাকে সাক্ষাৎ করাবে আপনার ব্যাপারে আরো কিছু জানতে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। এ ব্যাপারে কাজ করছি। রাষ্ট্রদূত আজকেই ব্যাপারটি নিয়ে স্বরাষ্টমন্ত্রীর সাথে দেখা করবেন।

গোয়েন্দা অফিসে আগমনের পর থেকে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে আসছি। কিন্তু সেদিন আমি প্রথম শেকল, হাতকড়া দেখলাম। রাতে আমার কক্ষের সামনে সশস্ত্র পাহারা দিতে শুরু করে। আশ্চর্য ব্যাপার। আমি একই মানুষ এতদিন ধরে এখানে। কী এমন ঘটে গেল হঠাৎ করে যে সবকিছু বদলে গেল?

আমার কক্ষে একটি রেডিও ছিল যাতে প্রতিদিন সকালে খবর শুনতাম। একটা খবর শুনলাম কিছু আরব কয়েদীর ব্যাপারে। তারা নাকি পাকিস্তানি পুলিশ বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় যখন তাদেরকে গাড়িতে করে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সংঘর্ষে দু'পক্ষের লোকই নিহত হয়।

যখন বসে খবর শুনতাম কিছু অফিসার আমার পাশে বসত। খোশ গল্প করত। একজন আফগানি আমার রুমে আসত। সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা আরবি

বলত। একবার সে বলল, "আমি অফিসার আফতাবের বন্ধু এবং আপনাকে সাহায্য করতে পারি।"

বললাম, "কিভাবে তুমি আমাকে সাহায্য করবে?"

সে বলল, "আমি আপনাকে ছেড়ে দিতে বলব। আর সে তাই করবে।"

তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বললাম, "আমার কারো সাহায্যের প্রয়োজন নেই। আমার মামলা একটি ভুল মাত্র। আর সেটা দ্রুতই মিটমাট হয়ে যাচ্ছে।"

পরদিন তাকে আমি আবার দেখলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, সে কোথা থেকে আরবি শিখেছে। বলল, সে দুবাইতে ছিল কয়েক বছর।

কিছুদিন পর একটা ব্যাপারে আফগান ওই লোকটি এবং একজন পাকিস্তানি অফিসারের সাথে তর্ক বেঁধে গেল। বিবাদ মেটাতে আমার কাছে এল। বিবাদের কারণ জিজ্ঞেস করলাম। অফিসারটি বলল, "এই আফগানি লোকটি দাবী করছে তার কাছে নাকি স্ট্রিংগার মিসাইল আছে। আমি তাকে মিথ্যাবাদী বললাম।"

সে বলল তার কাছে আছে। এরপর সে অফিসারের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "যদি আমি তোমাকে দেখাতে পারি কত টাকা দিবে?"

অফিসার বলল, "আমি এক হাজার ডলার দেব প্রতিটির জন্য।"

আফগান লোকটি বলল তার দু'টি স্ট্রিংগার মিসাইল আছে। দু'টিই সে নিয়ে আসবে।

তর্ক বেশ জমে উঠেছে।

"তোমার রকেটগুলো এখন মেয়াদোত্তীর্ণ। আমেরিকানরা আফগান-রাশিয়া যুদ্ধের সময় আফগানদের এসব স্ট্রিংগার দিয়েছিল। যেগুলো ১৯৮০'র দশকের শেষের দিকে বানানো। আর কাজ করে ৫ বছর পর্যন্ত। সে হিসেবে ওগুলো ব্যবহার অনুপযোগী। যদি তোমার গুলো ওই রকম পুরনো হয় তাহলে কিন্তু বাজি থাকবে না।"

পাক অফিসারের এই কথার জবাবে আফগান লোকটি উত্তর করল পুরনো হলেও ব্যাপার না তুমি আমাকে এক হাজার ডলার দিবে বলেছ প্রতিটি স্ট্রিংগার মিসাইলের জন্য এখন তোমাকে দিতেই হবে। আমি নিয়ে আসছি।

বলার অপেক্ষা রাখে না অফিসারটি তার শপথ থেকে পিছু হটার এক মওকা পেয়ে গেল।

তর্ক শেষ হয়ে গেলে আমি আফগানি লোকটাকে আবার জিজ্ঞেস করলাম সে কিভাবে আরবি শিখেছে। বলল, সে ছিল একজন মাদক ব্যবসায়ী। এই কাজে তাকে দুবাই যেতে হতো। সে মাদক নিয়ে বলদাক, আফগনিস্তান, পাকিস্তানের চামানে এরপর কোয়েটা, করাচী যেত। সেসব জায়গায় সে স্বাভাবিক ভাবে বেচাকেনা করত। ব্যবসা বাড়াতে সে দুবাইয়ের কারবারিদের সাথে যোগাযোগ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

"মাদক বেঁচে কেমন আয় করছো?" জিজ্ঞেস করলাম।

জানাল, "আফগানিস্তানে মাদক খুব সস্তা। যদি বলদাকে এক কেজি কোকেইন এক হাজার ডলার দাম পাওয়া যায় তবে কোয়েটাতে সেটার দ্বিগুন দাম পাওয়া যায়। করাচীতে সেটা পাঁচ গুণ। আর দুবাইতে সেটা মূল দামের দশগুণ বেশি পাওয়া যায়।"

তুমি সীমান্তের পাহারা ফাঁকি দিয়ে কিভাবে মাদক চালান করো? জিজ্ঞেস করলাম।

লেফ. কর্নেল আফতাবের সাথে আমার চুক্তি আছে। চামান থেকে কোয়েটা আসি। এ যাত্রা চার পাঁচ ঘণ্টার। পাকিস্তানি পুলিশরা মেইনরোডে টহল দেয়। তারা ব্যাক রোডে দাঁড়ায় না।

কখনো কখনো প্রয়োজন হলে আফতাব স্যারের গাড়িতে চেক পয়েন্ট পার হতাম। সে আমাকে কোয়েটায় নামিয়ে দিত বিনিময়ে তাকে টাকা দিতাম। কোয়েটার বিশেষ গোয়েন্দা অফিসারের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তাকেও টাকা দেই। দুবাইতে এক কারবারির সাথে আলাপ করতে যাই। কিভাবে মাদক আনব, কিভাবে বিক্রি করব এসব আলাপ।

জানতে চাইলাম, "তুমি কোন ধর্মের অনুসরণ করো?" উত্তরে বলল, সে একজন মুসলিম।

"তুমি একজন মুসলিম আবার মাদকও বিক্রি করো? তুমি কি জানো না যে এটা ইসলামে নিষিদ্ধ? পার্থিব আইনেও এটি একটি অপরাধ। মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। অর্থ, স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে।"

সে আমাকে বলল, "আমরা এটা অমুসলিমদের কাছে বেচি।"

"সেভাবে বিক্রি করাটা জায়েজ কে বলল?" আবারো প্রশ্ন করলাম। তুমি তো করাচী ও দুবাইতেও মাদক বেচো। সেগুলো মুসলিম ভূখণ্ড। তোমার ঈমান দুর্বল বলছি না কিন্তু আমি জানি প্রতিটি মুসলিমই জানে যে মাদক হারাম। ইসলামে সেসব বেচা, কেনা, পরিবহন এবং বিতরণ নিষিদ্ধ।

তাকে তওবা করতে বলি এবং একটি হালাল জীবিকা উপার্জনের পথ খুঁজে নিতে বলি। সে আমাকে বলে যে এগুলো বেচাকেনা বৈধ হবার দলিল তার কাছে আছে। এরপর থেকে তার সাথে আর কথা বলিনি। কিন্তু অফিসে তাকে আসতে দেখেছি বহুবার।

একদিন তারা আমাকে কোথাও নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। সকাল ৮টার দিকে তারা আমাকে একটি বাসে তুলতে যায়। যখন আমি বাসে ওঠার জন্য দাঁড়ালাম একজন সৈনিক আমাকে শিকল পরাতে এগিয়ে এল। আমি দেখলাম একজন অফিসার, যে কিনা ওই আফগানির সাথে স্টিংগার মিসাইল নিয়ে বাজি ধরেছিল, সে অফিসারকে বলছিল, "সামিকে শিকল পরিও না। সে কোন অপরাধ করেনি। আমরা শুধু তাকে তার দেশের কাছে অর্পন করব। তার হাতে হ্যান্ডকাফ পরিও না।"

অফিসারটি আমাকে তার মোবাইল নাম্বার দিলেন। বললেন, আমি আমার পরিবারের সাথে মিলিত হয়ে যেন তাকে ফোন করি। বাসে উঠে বুঝলাম তাদের অন্যান্য ভবনগুলোতেও আরো কিছু কয়েদী ছিল যারা দেখতে অনেকটা আরবদের মতো। আমি তাদেরকে শুভেচ্ছা জানালাম কিন্তু তারা কোন জবাব দিল না।

দু'টি পুলিশ ভ্যান আমাদের নিয়ে যাচ্ছিল। একটি সামনে আরেকটি পিছনে। অফিসার আলাদা গাড়িতে আসলেন। আফগান মাদক ব্যবসায়ীও আমাদের সাথে যোগ দিলেন। যা দেখে এবার তার নোংরা ব্যবসার কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো। আমি একটি জিন্স প্যান্ট ও একটি নরমাল শার্ট পরা ছিলাম। মাথা টেকো, মুখও শেভ করা। যা দেখে আমাকে আরব মনে হয় না। কিছুক্ষণ পরে বুঝলাম, আমি মনে মনে যা ভাবছিলাম আমার সহযাত্রীরাও আমাকে তাই ভাবছে। তারা ভাবছে আমি নিগ্রো আমেরিকান। আমাকে হয়তো কেউ নিতে এসেছে।

দশ ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে ড্রাইভার কোয়েটা পৌছে। সন্ধ্যা ৬টায়। যাত্রা পথে আমি পাঁচজন ভাইয়ের সাথেই আলাপ করেছি। বলেছি আমি সুদানিজ।

আল জাজিরার সাংবাদিক। আমাকে বলা হয়েছে যে, আমাকে সুদান সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। প্রথমে তারা আমার সাথে মিশতে চায়নি। কৌশল পাল্টাই। দেশি বিদেশি খবরাখবর বলি যা রেডিওতে শুনেছি। একটা খবর ছিল এরকম, কান্দাহারে একজন মার্কিন কয়েদী আছেন এবং কিছু আরব কয়েদীকে কিউবার গুয়ান্তানামোতে নেয়া হচ্ছে।

প্রকৃতপক্ষে, তারা পাঁচজন ছিল রিলাক্স মুডে। তাদের নামও বলেছিল: আব্দুল্লাহ আল শারকি, আল কুরবি বাকি তিনজনের নাম মনে নেই। আমরা হালকা কথাবার্তা বলেছিলাম। তারা আমাকে জানিয়েছিল যে তাদেরকে পাকিস্তান সীমান্ত থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গোয়েন্দা সংস্থার অফিসে আটক রেখেছে। তারা আমাকে সৌদি দূতাবাসে তাদের খবর জানাতে বলে।

কোয়েটা শহরে যখন প্রবেশ করি তাদেরকে বললাম, "আল্লাহকে স্মরণ করুন শহরে প্রবেশের সময়ে। এবং তাঁর কাছে এই শহরের মানুষের খারাবী থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করুন।"

আমাদেরকে গোয়েন্দা সংস্থার ভবনে রাখা হয়। এটা ঠিক একটি হোটেলের বিপরীতে। যে হোটেলে আমি ইতঃপূর্বে থেকেছি। সে হোটেলের সামনে প্রায় আধাঘণ্টা গাড়ি পার্ক করে। আফগানি মাদক কারবারি গাড়ি থেকে নামে। অফিসার আফতাবও নামে। এরপর একটি পুলিশ ভ্যান আমাদের সামনে দিয়ে যায়।

আমরা কোয়েটার সামরিক কারাগারে এসে নামি। পাঁচজন সৌদি নাগরিককে নিয়ে যাওয়া হয়। আমাকে বাসে তোলা হয় এই বলে, এয়ারপোর্টে নিয়ে যাওয়া হবে সুদানে ফিরিয়ে দিতে। পাঁচজন আরব নাগরিকের পর আমার পালা আসে। তারা আমাকে তাদের সাথে যেতে বলে কয়েক ঘণ্টার জন্য। এয়ারপোর্ট যেতে যতক্ষণ লাগে।

জানুয়ারি মাসের ৭ তারিখ, ২০০২ সাল। আমরা সবাই রোজা। তারা সবাই আমাদের জন্য ইফতার বানাচ্ছিল। ইফতারির পর তারা আমাকে একটি একক প্রকোষ্ঠে রাখে। কিন্তু সৌদিদের রাখে যৌথ প্রকোষ্ঠে। কোয়েটার রাস্তা খুব বন্ধুর। ঝাকুনিতে আমি ক্লান্ত। সূর্য ডোবার সাথে সাথে তাই আমি বেশি ক্লান্ত অনুভব করি। যাহোক আমরা মাগরিব এবং এশার সালাত জামায়াতের সাথে আদায় করি। রেডিওতে কিছুক্ষণ খবর শুনে বন্ধ করে দেই। বিছানায় শুতে যাব এমন সময় একজন এসে দরজা খুলে প্রবেশ

করে। আমাকে নীল রঙ্গের একজোড়া জামা ট্রাউজার দিয়ে সেগুলো পরতে বলে।

"এগুলো পরে নিন যাতে আমরা আপনাকে এয়ারপোর্টে নিতে পারি।" সেগুলো বিশ্রী দেখাচ্ছিল তাই বললাম, আমি আমার জামা কাপড়ই পরবো। সে রাগত স্বরে বলল, "বেশি কথা বলবেন না। এগুলো পরে নিন।"

সেগুলো আমার জামাকাপড়ের উপর দিয়েই পরলাম। আমার ব্যাগ গুছিয়ে নিলাম। আরেকজন লোক এল আমার কক্ষে। তার হাতে হাতকড়া। বলল, "আমরা আপনাকে আমেরিকানদের হাতে তুলে দিতে যাচ্ছি। যাতে আপনার ব্যাপারটা তারাই দেখভাল করতে পারে।"

আমি বললাম, আপনি কি বলেননি "আপনাকে আপনার দেশের কাছে তুলে দিতে যাচ্ছি?"

"না" সে বলল। "আমরা তোমাকে আমেরিকানদের হাতে তুলে দিচ্ছি যাতে তারা তোমাকে মেরে ফেলতে পারে।"

"কোন সমস্যা নেই" আমি বললাম, "আমি মৃত্যুকে ভয় পাই না। মৃত্যুতো স্বাভাবিক। এটাই জীবনের শেষ নয় বরং আরেক জীবন আছে। জবাবদিহিতা আছে। শাস্তি আছে। আল্লাহ ন্যায়পরায়ণ। তিনি মানবাধিকার সম্পর্কে বেখবর নন।"

"তাতে কোন সন্দেহ নেই" সে বলল। "মৃত্যুই জীবনের শেষ নয়। কিন্তু মার্কিন সেনারা তোমার মৃত্যু কার্যকর করবে।"

সে আমার হাতে পায়ে শেকল পরায়। আমার ব্যাগ নিয়ে নেয়। বাসে ওঠানোর জন্য লাইনে দাঁড় করায়। আমি চামান থেকে আমাদের সাথে আসা পাকসেনার সাথে কথা বলি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, "ব্যাপার কি? কেন আমাদেরকে আমেরিকার কাছে বিক্রি করে দেয়া হচ্ছে?

"আমরা বাধ্য হচ্ছি" সে উত্তর দেয়। সরকারি নির্দেশ পালনের সে কি ঠুনকো অজুহাত তাদের!

বললাম, "আমরা আপনাদের ভুলব না। সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে আমরা অভিযোগ দেব। সেদিন আমরা অধিকার আদায় করে ছাড়বো।"

গাড়িতে আটজন ছিলাম। আমি, সৌদির পাঁচজন, এবং আরো দুজন সৌদি নাগরিক। রেডিও বাজছিল। আর আমরা সাড়ে দশটার সংবাদ শুনছিলাম। সৌদি নাগরিকেরা তখনো আশা করছিল তাদেরকে সৌদি

দূতাবাসে নেওয়া হবে। কিন্তু আমি তাদেরকে বললাম, মার্কিনিরা আমাদের নিয়ে নেবে কান্দাহার থেকে কিউবার পথে। তারা তখনো আশাবাদী। কিন্তু আমি যতটুকু জানি তাতে আগামীকাল ছাড়া ইসলামাবাদের কোন ফ্লাইট নেই।

মর্মাহত হই এই ভেবে যে, এই নিরীহ ভাইয়েরা এখনো আশায় আছেন তারা বাড়ি ফিরছেন। অথচ এই সত্য লুকানোর কোন উপায় নেই যে আমরা মার্কিন সেনাদের হাতে হস্তান্তরিত হতে যাচ্ছি। আর তাই ঘটেছিল।

"উঠে দাঁড়া! তুই কে?"

এটাই ছিল প্রথম শব্দ যা আমরা চোখ বাঁধা অবস্থায় শুনতে পাই। সময় তখন রাত সাড়ে ১১ টা। সে ছিল একজন মার্কিন সেনা যে মিশরীয় আরবিতে কথা বলছিল। সে আমাদের প্রত্যেকের সামনে আসছিল। যখন সে আমরা সামনে আসে আমি বলি, "আমি সামি মুহি আল দীন মুহাম্মদ আলহায। একজন সুদানি সাংবাদিক।

"বেশি কথা বলবি না।" সে আমাকে তার দিকে টেনে নেয়। বলে, "কোন কিছু করার চেষ্টা করবি না। নইলে কিন্তু পিটুনি দেব।"

"আমার সাথে একটি ব্যাগ ছিল", আমি বললাম।

"চুপ কর!" সে বলল।

সে আমাকে এবং আমার ব্যাগটি নিয়ে কয়েক কদম হেঁটে দরজার কাছে গেল। দরজা পেরিয়ে বিশাল কক্ষে নিয়ে গেল। আলো ঝলমলে চারদিক। বিমানের পেছনে ইঞ্জিনের মতো শব্দ হচ্ছিল। সুসজ্জিত মার্কিন সেনারা আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে।

তখনো আমার পকেটে আমার রেডিওটি ছিল। একজন মার্কিন সেনা তল্লাশি করতে এসে আমার পকেটে হাত দেয়। হাতের সাথে রেডিওটির স্পর্শ লাগতেই সে থমকে যায়। তার সারা শরীর যেন বরফ হয়ে যায়। তার সহকর্মী যে মিশরীয় আরবি বলছিল সে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি কিছু পেয়েছো?"

সেনাটি তখনো বরফ হয়ে আছে। এরপর সন্তর্পণে আমার থেকে সরে গেল। আমার ধারণা সে রেডিওটিকে বোমা মনে করেছে। তার আরব সহকর্মী জিজ্ঞেস করে, "এটা কী?"

সেনাটি বলে, "তার পকেটে শক্ত একটা কিছু।"

মিশরীয় ভাষায় কথা বলা লোকটি আমার দিকে লাইট মারে আমাকে মাটিতে শুয়ে যেতে বলে। আমি তাই করি। এরপর সে বলে, "আপনার পকেটে কী?"

"একটি রেডিও" আমি বলি।

তিনি অনুবাদ করে তার সহকর্মীকে বুঝালেন। এরপরও অনুসন্ধান চলতে থাকে যেহেতু আমি প্রথমে তাদের বলেছিলাম আমার পকেট খালি। বের হয়ে এলো আমার রেডিও, হাতঘরি, মানিব্যাগ, টাকা, পাসপোর্ট, প্লেন টিকেট, চশমা, আংটি, জুতা। এসব কিছু তারা আলাদা করে আমার লাগেজের পাশে রাখে। তারা আমাকে পরানো শিকল ধাতব থেকে প্লাস্টিকের করে দেয়। শুধু হাতগুলো বাঁধে সেসময়। আমার মাথার উপর কালো ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দেয়। দু'জন সৈন্য বিমানে নিয়ে যায়।

ওমর আল কেনেডি (ওমর খেদর)

ওমরকে শুধু একা ধরে আনেনি। মার্কিন সেনারা তার ভাইকেও ধরে এনেছে। তার বাবাকে একক জিজ্ঞাসাবাদে মেরে ফেলেছে পাকিস্তান সীমান্তে। ঘটনার দিন মার্কিন সেনারা তাদের এলাকায় একটি বাড়িতে ঢুকে সবাইকে মেরে ফেলার চেষ্টা করে ওমরও তাদের মধ্যে একজন ছিল। সংঘর্ষে এক মার্কিন সেনা নিহত ও আরেকজন আহত হয়। তাই তারা ওমরকে বোমা মারায় অভিযুক্ত করে যে বোমায় তাদের এক সেনা নিহত হয়।

যখন সে প্রথম আসে সে ছিল ১৪ বা ১৫ বছরের বালক। তার এক চোখে গুলি করা হয়। গুলি করা হয় তার ফুসফুসে। তখন সে ছিল খুবই অল্প

বয়সের, খুবই ছোট। একটি সেলে একা বন্দি করে রাখা হতো। সে কারাগারেই বড় হতে থাকে। এটা তার জন্য ভালই হবে। সে বড় হবে একজন ভাল মানুষের স্বপ্ন নিয়ে। গুয়ান্তানামো ত্যাগ করবে একজন চরিত্রবান মানুষ হিসেবে।

আমি ছিলাম চার্লি ব্লকে যখন সে আসে। তাকে রাখা হয় আমার সেলের ঠিক দুটো সেলের ব্যবধানে। আমি শুনতাম তাকে তার নিহত বাবার ছবি দেখিয়ে মারা হতো।

আমরা দু'জন চিৎকার করে একে অপরের সাথে কথা বলতে পারতাম। আমি তার কাছে এ টেকনিকটা শিখেছি। কিন্তু পরবর্তীতে তাকে ক্যাম্প-৪ এ নিয়ে যাওয়া হয়। তাই আমি তার সহকয়েদীদের কাছে, আমার আইনজীবীর কাছেও তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। ক্যাম্পে তার নিকট কয়েদ ছিল সালেম। সৌদি নাগরিক। ওমর সম্পর্কে তার সাথেও অনেক কথা হয়েছে।

আমি জানতে পারি ওমর একজন কানাডিয়ান-মিশরীয়। বাবার সাথে আফগানিস্তানে এসেছে। তার বাবা একজন এনজিও কর্মকর্তা। বয়স কম হওয়ায় গুয়ান্তানামোর ভয়াবহ নির্যাতনে ভীতসন্ত্রস্ত এবং মানসিক রোগীতে পরিণত হয় ওমর। গুয়ান্তানামোতে ভয়ংকররূপে আক্রান্তদের সে একজন। শারীরিকভাবেও সে আহত ছিল। তার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ। এক চোখ অন্ধ। আরেক চোখে কোনমতে দেখতে পেত।

তার ভাই আবদেল রহমান। একই ব্লকে কয়েদ ছিল। কিন্তু সে বের হয়ে যায়। আমেরিকার গুপ্তচর হিসেবে কাজ করে। ওমরের সামনেও একই সুযোগ এসছে কিন্তু সে যায়নি। বছরের পর বছর ধরে পরে আছে। কানাডা যাওয়ার সুযোগ পায়ে ঠেলে নির্মম নির্যাতন সয়ে যাচ্ছে।

বাগরামে আমি

আমরা কার্গো বিমানে ছিলাম। শেকল-পরা অবস্থায় মেঝোতে পড়েছিলাম। আমাদেরকে বলা হয়েছে কোনো নড়াচড়া করা যাবে না। করলে দুর্গতি আছে, গুলিও করা হতে পারে। আমি বসেছিলাম। আরো অনেকেই বসে ছিল। প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে কোয়েটা থেকে বিমান ছেড়ে যায়। এক ঘণ্টা পার হবার পর বিমানটি কোথাও থামে। সেখানে প্রায় দু'ঘণ্টা অবস্থান করে। এরপর আবার ছেড়ে যায়। বিমানে আমার পাশের কয়েদী কাঁদছিল, তার টয়লেট চেপেছে বলে। যখনই সে টয়লেটে যাবার আকুতি করত তখনই এক সেনা তাকে পেটাতে আসত। কিছুক্ষণ পরই আমি ভেজাভেজা অনুভব করলাম। আসলে সেই জায়গায় বসেই সে প্রাকৃতিক কর্ম সেরে ফেলেছে। পরে সে আমাকে বলে তাকে কথা বলা থেকে বিরত রাখতেই চেপে ধরা হতো।

অবশেষে জানুয়ারির ৮ তারিখে আমরা বাগরাম বিমানঘাঁটিতে অবতরণ করি। প্রথম মার্কিন কারাগারের অভিজ্ঞতা অর্জন করি। তথাকথিত 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধবন্দি' আটক রাখতে এই কারাগার তৈরি করা হয়েছে। লক্ষ্য, তাদের কাঙ্ক্ষিত শত্রুদের ব্যাপারে তথ্য আদায় করতে কয়েদীদের উপর কঠোর জিজ্ঞাসাবাদ করা।

এককথায়, বাগরামে আমাদের বন্দিদশা ছিল চরম কষ্টকর। এখানে আমাদের ওপর আরোপ করা হয় জঘন্য সব শাস্তি। আমাদের মারতে মারতে বেহুঁশ করে ফেলা হতো। চরম দুর্ব্যবহার করা হতো। সামাজিক ও ধর্মীয়ভাবে অবমাননাকর, অপমানজনক আচরণ করা হতো। আমরা সাধারণ নাগরিক কিন্তু তারা প্রত্যাশা করত তাদের চাহিদামাফিক দুনিয়ার সব অপরাধীর খবর যেন আমরা তাদের দেই। তাদের হাতে বন্দি হওয়ায় সবসময় তাদের আদেশমতো চলি। এমনকি মিথ্যা বলে হলেও তাদের চাহিদা পূরণ করি।

একবার বিমান অবতরণ করে। সৈন্যরা বিমানে প্রবেশ করল। তারা আমাদের দিকে চিৎকার করে বলতে লাগল, "কেন আমাদের মারতে এসেছিস তোরা?"

বিমানের অধিকাংশই ইংরেজি বলতে পারে না। ফলে তারা আরো বেশি নির্যাতন করছিল, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছিল। আমার পালা এল। বিমান থেকে নামতে হবে। কিন্তু চার পাঁচ ঘণ্টা শিকল পরা অবস্থায় বসে থাকতে থেকে পা অচল হয়ে গেছে। সৈন্যটি আমাকে ওঠানোর চেষ্টা করে কিন্তু আমি টলছিলাম। দাঁড়াতে পারছিলাম না। আমাকে জোরে ধাক্কা দিয়ে চিৎকার করে উঠল, "কেন তোরা আমাদের মারতে এসেছিস?"

"আমি কোনো যোদ্ধা নই। আমি একজন সাংবাদিক", বললাম।

"মিথ্যা বলবি না। কোথা থেকে এসেছিস?"

"আমি সুদান থেকে এসেছি। আমি কোনো বাহিনীর সদস্য নই। আমি একজন সাংবাদিক।"

আমি বিমানের দরজা খুঁজে পেলাম। আমার মাথা তখনো কালো কাপড় দিয়ে মোড়ানো। দরজার কাছে এনে আমাকে জাম্প দিতে বাধ্য করে। ব্যাপারটা অন্ধকারে পাহাড় থেকে ঝাপ দেওয়ার মতো। আমি জাম্প দিলাম। ডান পা মচকে হাঁটুতে প্রচণ্ড ব্যথা পাই। হাঁটুর লিগামেন্টে ছিঁড়ে যায়। ব্যথা এতই প্রচণ্ড ছিল যে চিৎকার করে উঠলাম।

তারা আমাকে মেঝেতে শুয়ে পড়তে বলে। আমি তাই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ি। ব্যথায় তখনো চিৎকার করছি। তাদের কাজের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী চিৎকার-চেঁচামেচি করতে শুরু করে। মারতে থাকে। আমাকে নড়াচড়া করলেই হত্যার হুমকি দেয়। আমি শুনতে পেলাম কাছেই কোথাও কুকুর ঘেউঘেউ করছে। বাকি কয়েদীদের আতঙ্কিত করে তুলছে। আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হিমশীতল হয়ে গেছে। আমি নিজেও শীতে কাঁপছি।

তারা কৌশল পাল্টায়। চিৎকার করে বলে ওঠে, "কেন তুই নড়ছিস না?" তারা আমার পিঠে পেটানোর ফলে আমাকে পায়ের উপর ভর দিয়েই উঠতে হবে। তারা আমার হাত বাঁধে। অন্যদের সাথে আমাকেও লাইনে দাঁড় করায়। সবার হাত এক দড়িতে বাঁধার জন্য হাতকড়া নিয়ে আসে। একজন সৈন্য সে দড়ি ধরে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। দড়ির দুইপাশ দিয়ে সারিবদ্ধ আমরা দাঁড়িয়ে আছি। কুকুরগুলো তখনো ঘেউঘেউ করছে

চারপাশে। জলবায়ু এতই ঠাণ্ডা ছিল যে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠছিল। মুখে কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকায় সব অন্ধকার লাগছিল। হাঁটুর লিগামেন্ট ছিড়ে যাওয়ায় হাঁটুর ব্যথাও বাড়ছিল।

তারা আমাদের দড়ি ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। আমরা তেমনটা করতে বাধ্য ছিলাম, কেননা যদি কেউ একটু ধীর হয়ে যেত তার মনে তখন এই টেনশন কাজ করত যে সৈন্যরা এই বুঝি পেটানো শুরু করল।

আমাদের ঠাণ্ডা লাগছিল কিন্তু আবার ভয়েও কাঁপছিলাম। কুকুরের ঘেউঘেউ, সেনাদের চিৎকার চেঁচামেচি এবং অন্য কয়েদীদের ব্যথার গোঙানি, কান্না মিলেমিশে এক করুণ রোনাজারিতে ভরে উঠেছে চারপাশ যা তখন আল্লাহ ছাড়া শোনার কেউ ছিল না। একশো মিটার দূরে একটি ভ্যান গাড়ি এসে থামল। তারা আমাদেরকে আদেশ করল হেঁটে হেঁটে গাড়ির কাছে যেতে এবং একজন একজন করে গাড়িতে উঠে পড়তে। আমাদের মাথা তখনো কালো কাপড়ে মোড়া।

কল্পনার ডানা অন্ধকারে বেশি ঝাপটায়। আমাদের কল্পনাও নানান ভাবনায় ঘুরে ফিরছে যেহেতু আমরা অন্ধকারে বসে আছি। আমি কল্পনা করছি যে যাদেরকে ধরে আনা হয়েছে তাদের গায়ে ঠাণ্ডা পানি ঢালা হচ্ছে। চাবুক দিয়ে শপাং শপাং আঘাত করা হচ্ছে। কুকুর লেলিয়ে দেয়া হচ্ছে। আমার মনে পাশবিক হিংস্র সব শাস্তির কথা ভেসে উঠছে। দুঃখজনকভাবে, আমি আসলে খুব অবাস্তব কিছু ভাবছিলাম না।

তারা আমাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসে যেহেতু আমি হাঁটতে পারছিলাম না। পায়ের ব্যথায় চিৎকার করে কেঁদে উঠছিলাম। কিন্তু যখনই কেঁদে উঠি একজন সৈন্য আমাকে শান্ত না হওয়া পর্যন্ত পেটাতে থাকে। টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায়। বুটজুতা পায়ে লাথি মারে। আমার মুখের কাপড় খুলে দিলে হঠাৎ উজ্জ্বল আলো চোখে লাগে। চোখ প্রায় অন্ধ হবার উপক্রম। তাদের ঘেরাওয়ের মাঝে পড়ে আছি। তাদের অস্ত্রগুলো আমার দিকে তাক করা। একদল নারী সৈন্যও রয়েছে তাদের মধ্যে। যথারীতি ডগস্কোয়াড ঘেউঘেউ করছে আশেপাশে। একজন বলে ওঠে, "একটুও নড়বি না। তোকে অবশ্যই আমাদের কথা শুনতে হবে। একটু যদি নড়িস তো তোর মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।"

এরপর তারা আমার কোমরের বাঁধন কেটে দেয়। আমাকে গায়ের জামা কাপড় সব খুলে ফেলতে বলে। আমি তাদের কথা শুনতে শুরু করলাম। তবে ধীরে ধীরে। শীতে কাঁপছিলাম। শারীরিক দুর্বলতায় টলে পড়ছিলাম। পড়ে যেতে গেলেই তারা চিৎকার করে উঠত। প্রথমেই আমি পাকিস্তানে পরা নীল কাপড়গুলো খুলে ফেলি। তারা আমাকে ট্রাউজার ও শার্টটি খুলে ফেলতে বলে। তার নিচে লং জাঙ্গিয়া পরেছিলাম শীত থেকে বাঁচার জন্য। তারা সেসবও খুলে ফেলতে বলে। সংকোচ করছিলাম। তখনই একজন চিৎকার করে ওঠে "যদি তুই সব না খুলিস তো তোকে গুলি করব।"

ভেতরের গেঞ্জিটিও খুললাম। পরনে শর্টপ্যান্ট। সর্বোচ্চ সংকোচ বোধ করছি। এমতাবস্থায়ও তারা চিৎকার করে ওঠে। আমার দিকে অস্ত্র তাক করে আছে চারদিক থেকে। তারপরও আশা করছিলাম যে, শর্টপ্যান্ট অন্তত পরনে রাখতে পারব। চূড়ান্ত সম্ভ্রমটুকু অক্ষত থাকবে।

এক মার্কিন সেনা আমার দিকে এগিয়ে এল, নিরাপত্তার জন্য তার অস্ত্রটি আমার দিকে তাক করে আমার লং শর্ট প্যান্ট খুলে ফেলতে বলল। আমি খুলে ফেললাম। পরনে শুধু জাঙ্গিয়া। সে আমাকে বলল সোজা সামনে তাকাতে। পিছনে তাকাতে নিষেধ করল। আমি পুরোপুরি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। শরীরের ব্যথার চেয়েও বেশি কষ্ট অনুভব হচ্ছে। জানি না এ ব্যথা অসুস্থ হবার কারণে কিনা। নাকি এ ব্যথা একজন কয়েদী হবার দুঃখ থেকে। নাকি কতগুলো অসভ্য ও কুকুরের সামনে উলঙ্গ হবার অপমান ও অপদস্থ হওয়া থেকে।

এমতাবস্থায় যখন দাঁড়িয়ে ছিলাম, আমি ভয়ে এতটাই জড়সড় হয়ে গেলাম তাতে আমার শারীরিক ব্যথা কমে গেছে কিন্তু মানসিক আঘাত গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছিল।

আমি একজন সচেতন মুসলিম। আমার ধর্মে পুরুষরা উলঙ্গ হতে বিব্রতবোধ করে এমনকি তাদের স্ত্রীদের সামনেও। আর এখানে কিনা কতগুলো নারী সদস্যদের সামনে আমাকে উলঙ্গ হতে হলো। এমতাবস্থায় কিভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব?

চিৎকার চেঁচামেচি কুকুরের ঘেউঘেউ বেড়েই চলেছে। পিস্তল, বন্দুকের শব্দ শীতের তীব্রতা ভুলিয়ে দিচ্ছে। আমার মস্তিষ্কে সেই খণ্ড খণ্ড চিত্রগুলো আজও ধারণ করে আছে। প্রচণ্ড শীত, আমার চোখে লাইটের আলো

নিক্ষেপ, মার্কিন সেনাদের কুৎসিত, ভয়ংকর মুখ আর হিংস্র কুকুর। তারা আমাকে দাঁড় করিয়ে রাখে উলঙ্গ অবস্থায়, থরথর কাঁপা শীতের মধ্যে। ভাগ্যিস আমি জ্ঞান হারাইনি। জ্ঞান হারালে, তাদের চূড়ান্ত এই অবমাননাকর শাস্তির কথা মনে করতে পারতাম না।

কিছুক্ষণ পর তাদের একজন আমার দিকে আমার জামাকাপড় ছুড়ে মারে। কিন্তু আমি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকি। ভয়ে। কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তারা আমার দিকে কয়েকটা কুকুর ছেড়ে দেয়। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে লাফ দেই আমার জামা কাপড়গুলোর উপর। ছোঁ মেরে নিয়েই লজ্জাস্থান ঢাকি। অবশ্য জামার বোতাম লাগানোর মত শক্তি হাতে ছিল না। হাতের আঙুলগুলো শীতে বরফের মতো জমে গেছে।

দু'জন সৈন্য আমার দিকে এগিয়ে আসে। পিছন থেকে আমার দুই হাত বেঁধে ফেলে। আরেকটি কক্ষে আমাকে ঠেলে দেয়। সেখানে দুজন লোক একটি টেবিলের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে তাদের সামনে আনা হয়। আমার ডানে বামে দুই সারিতে কিছু সেনা সদস্য দাঁড়ায়। দু'জন সৈন্য তখনো আমার দু'বাহু ধরে আছে।

সামনে দাঁড়ানো দু'জন সেনা অফিসারের একজন উত্তর আফ্রিকান টানে আরবি বলছিল।

"তোর নাম কি?"

"আমার নাম সামি মুহি আল দীন মুহাম্মদ আলহায"

"তুই কোন দেশের লোক?"

"সুদানি"

"তুই কি ওসামা বিন লাদেনের ভিডিও করেছিলি?"

"না, আমি বিন লাদেনের ভিডিও করিনি?"

"কিন্তু তুই বিন লাদেনের ভিডিও ক্লিপ নিয়েছিলি", সে বলল।

"না, আমি বিন লাদেনের ভিডিও ক্লিপ সংগ্রহ করিনি। আমি আফগানিস্তানে একজন সাংবাদিক হিসেবে যুদ্ধ সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়েছিলাম", আমি বললাম।

"অস্বীকার করিস না, অস্বীকার কোনো কাজে আসবে না। যদি অস্বীকার করিস আমরা তোকে পেটাব, অপদস্থ করব, ন্যাংটা করে দাঁড় করিয়ে রাখব। জীবনটা শেষ হয়ে যাবে তোর। বাঁচতে চাইলে সব প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ বলবি।"

আমি আমার উত্তরটা কয়েকবার দিলাম।

"চুপ কর! প্রশ্ন না করলে উত্তর দিবি না।" সে আবারো প্রশ্ন করা শুরু করল, "কিরকম টাকাপয়সা আছে তোর কাছে?" "তোর অন্যান্য জিনিসপত্র আছে কী কী?"

উত্তর দিলাম, অল্প কিছু ডলার আছে, কিছু পাকিস্তানি মুদ্রা আছে, কিছু আমিরাতের দিরহাম, কাতারি রিয়েল, পাসপোর্ট, আমার বিমান টিকিট, আর সাংবাদিক কার্ডটা আছে। আমার একটা ছোট রেডিও, ভিডিও ক্যামেরা ও সরঞ্জামাদি, হাতঘড়ি, চশমা কিছু ঔষধপত্রও আছে।

"থাম", অফিসারটি বলল। সে আমার উত্তর তার নোট খাতায় লিখে নিল এবং সৈন্যদের নির্দেশ দিল আমাকে নিয়ে যেতে। সৈন্যরা আমাকে টেনে হিচঁড়ে বিমান মেরামতের পুরোনো একটি কক্ষে নিয়ে গেল। টাইলস করা ফ্লোর। যন্ত্রপাতির কিছু বক্স রাখা। তারা একটি দরজা খুললো। আমাকে ভিতরে ঠেলে দিল। সেখানে আরো কিছু মানুষ ঘুমাচ্ছিল।

আমাকে দুটো কম্বল দেয়া হয়। জানানো হয় একটি বিছানা করার ও আরেকটি গায়ে দেয়ার জন্য। প্রবল শীতের রাতে না বিছানা যথেষ্ঠ ছিল না গায়ের কম্বল। আমি তখন পুরোপুরি বিধ্বস্ত। তাই তাদের সাথে কথা না বাড়িয়ে সোজা শুয়ে পড়ি। বেঘোর ঘুম হয়। ঘুম ভাঙে সৈন্যদের নাম ডাকাতে। সেখানে আমার নাম্বার ছিল ৩৫। দেখলাম, নাম্বারটা কম্বলের গায়ে লেখা আছে।

যথারীতি কুকুর ঘেউঘেউ করছে। সৈন্যরা চিৎকার করে ডাকছে, "ওঠ, ৩৫, এদিকে আয় ৩৫"। যেহেতু মরা মানুষের মতো ঘুমের ঘোরে পড়েছিলাম তাই হঠাৎ ডাকাডাকিতে আতঙ্কিত হয়ে পড়ি।

অন্য কয়েদীরা সামনে খাবার নিয়ে বসে আছে। প্যাকেট করা খাবার। ২০০ গ্রামের মতো খাবার হবে ছোট সেই প্যাকেটে। সৈন্যটি খাবারের একটি প্যাকেট আমার দিকে ছুঁড়ে মারল। এরপর একটা চামচ। আমি সেগুলো নিলাম। আবারো ভয় জেঁকে বসল মনে। আমি জানি না গত কয়েকদিন কোথায় ছিলাম, এখন কোথায় আছি। আমার চারপাশে কী ঘটছে!

দিন আর রাতে ঘটনার ঘনঘটা দ্রুতই বয়ে যাচ্ছিল। কেন এমন ঘটছে চিন্তা করতাম। মনে মনে যুক্তি খুঁজতাম। বাইরে স্থির দাঁড়িয়ে থাকতাম।

ভেতরে ভেতরের ব্যথায় কুঁকড়ে যেতাম। আমার সাথে কী ঘটছে, কেন ঘটছে বোঝার চেষ্টা করতাম। খাবার শেষে সৈন্যরা খাবার প্লেট ফেরত দিতে বলত। অবশিষ্ট খাবার বিড়ম্বনার কারণ হতো।

"আমি এখনো খাইনি", আমি বললাম।

সে আমার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল। খাবার পাত্র ফেরত চাইল। ফেরত দিলাম। চামচটা রেখে দিতে চাইলাম। কিন্তু সে সেটাও ফেরত চাইল।

আমি চারদিকে লক্ষ্য করলাম। জায়গাটিকে প্রাথমিকভাবে আমার কাছে বাগরাম এয়ার বেসের একটি পুরাতন বিমান রাখার স্থান বলে মনে হলো।

আফগান কমিউনিস্ট সরকার এটা নির্মাণ করেছে বলে মনে হলো। পরবর্তীতে জানতে পারি এটা ছিল আফগানিস্তানে রাশিয়ান ঘাঁটি যা সোভিয়েত ইউনিয়নের সময় নির্মাণ করা হয়।

পুরো ভবনটি অবহেলা, অযত্নে পড়ে আছে। এর দু'টি ভাগ রয়েছে। প্রতিটি ভাগেই রয়েছে দু'টি করে ফ্লোর, চারটি করে কক্ষ। আলাদা চত্বর। নিচতলা।

ভোরবেলা আমি ফজর নামাজ পড়তে চাইলাম। সূর্য দেখতে পেলাম না। কিন্তু ধারণা করছি সকাল ৭টা কি ৮টা বাজবে। কিছুটা আলো অনুভূত হচ্ছে। যখন আমি দাঁড়ানোর চেষ্টা করলাম। একজন সৈন্য আমাকে বসে পড়তে বলল।

"দাঁড়ানো নিষেধ", সে বলল। "একইভাবে উপরে নিচে তাকানো, অন্য কয়েদীদের সাথে কথা বলাও নিষেধ"। সে আমাকে নিয়মনীতি পড়ে শোনাতে লাগল। যদি আমার কোনোকিছু দরকার হয় আমাকে কথা বলার অনুমতির জন্য হাত তুলতে হবে। সৈন্যদের সকল নির্দেশ মানতে হবে। সে পড়ার পর আমি বললাম, "আমার কিছু পানি দরকার অজু করার জন্য।"

"তুমি দৈনিক এক বোতল পানি পাবে। সে পানি দিয়ে তুমি কিছু ধুতে পারবে না। শুধু খেতে পারবে। যদি তা না কর তবে শাস্তি পাবে", সৈন্যটি বলল।

সৈন্যরা হেলমেট পরে থাকত। তাদের হাতে থাকত এম সিক্সটিন রাইফেল, পিস্তল, ব্যাকপ্যাক ও রড। কেউ কথা বললে মাটিতে আঘাত করে

শব্দ করত। তারা আমাদের হুমকি দিত। অভিশাপ দিত। অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করত। এমন অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করত যা আমি মুখেও আনতে পারব না।

লক্ষ্য করলাম একজন কয়েদী ফ্লোরে হাত ঘষছে। সে আসলে তায়াম্মুম করেছে। এরপর সালাত আদায় করল বসে বসেই। আমিও তাই করলাম। নামাজ শেষে খাবার পানি চাইলাম। প্রহরী ছোট এক বোতল পানি দিল। দুই ঢোক গিললাম। বসে বসে চারদিক দেখতে লাগলাম। নতুন পরিবেশের সবকিছু দেখার প্রয়োজন থেকে হোক কিংবা দীর্ঘক্ষণ বন্ধ থাকার পর খোলা চোখের আকুতি থেকে হোক। দেখাটাই এখন কাজ।

সব সময় আমাদের হাতে পায়ে শিকল পরানো থাকত। ভোরে, মধ্যদুপুরে আর সন্ধ্যায় আমাদেরকে টয়লেট করতে দেয়া হতো। দুপুরের খাবারের পর, তারা এ সুযোগটা দেয়। সবাই পালা করে যাচ্ছে। আমার পালা আসতেই উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি। কিন্তু পা কাজ করছে না। তারপরও দাঁড়ানোর চেষ্টা করি। বলা হলো আস্তে আস্তে পা ফেল। একজন আমার হাত উঁচিয়ে ধরে।

সৈন্যরা কাঁটাতারের ফাঁক গলিয়ে একটি দরজা খুলে। আমার হাত ধরে রাখে। যদিও আমার হাত ও পা শেকলে বাঁধা। এরপর বাইরে বের করে। তাড়াতাড়ি করে গেট লাগিয়ে দেয়। আবারো তারা আমাকে নিচে তাকাতে বলে এবং তাদের অনুমতি ছাড়া নড়াচড়া করতে নিষেধ করে। কক্ষের দরজা থেকে তারা আমাকে কয়েক মিটার দূরে নিয়ে যায়। যেখানে একটি গর্ত ছিল। গর্তের সামনে আমাকে নিয়ে বলে, "তোমার প্রয়োজন সারো।"

তাদের বললাম আমার হ্যান্ডকাফ খুলে দিতে। তার হ্যান্ডকাফ খুলে দেয়। কিন্তু তাদের সরে যাওয়ার অপেক্ষা করছিলাম। তারা গেল না।

"এখনি করো," তারা বলল।

"আপনারা কিছু সময়ের জন্য অপেক্ষা করুন অথবা একটু ঘুরে আসুন," বললাম।

"না", তারা বলল। আমরা যাব না। আমরা এখানে অবস্থান করব। আর যদি তুমি দু'মিনিটের মধ্যে টয়লেট না কর তবে আমরা তোমাকে ফেরত নিয়ে যাব। আবার অন্য সময়ে আনব। দৈনিক তিনবার টয়লেটের

সময় পাবে। এরমধ্যে এটি দ্বিতীয় সুযোগ। পরের বার হবে একেবারে দিনের শেষে।

আমি আবার নিজের মতো চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু তারা চেঁচামেচি করতে লাগল। "সোজা সামনে তাকাও। দেরি করার সময় নেই।" আমি শুনতে পেলাম এক নারী সৈন্য হাসছে আমার দিকে তাকিয়ে। আমার দিকে রাইফেল তাক করে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার আঙুল নেড়ে আমাকে তাড়া দেয়। যদিও সে অন্য সেনাদের সাথে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করছিল। আমি কোনমতে টয়লেট সেরে নিই। কিন্তু তারা আমাকে পরিষ্কার হওয়ার জন্য কিছু দেয়নি। না কাগজ না পানি, কিছুই না। আমিও দাঁড়িয়ে আছি।

তারা আমাকে টেনে নিয়ে আসে। হ্যান্ডকাফ পরায়। আগের মতো টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যেতে থাকে। পরবর্তী নম্বর ৩৬ কে আনা হয়েছে। এভাবেই আমরা বাগরামে বেঁচে ছিলাম। নোংরা, নড়াচড়ার অবস্থা নেই। খাবার দিনে একবেলা। খাবার আসত সৈন্যদের রেশন প্যাকেটে। ওটাই মূল খাবার। ২০০ গ্রামের মতো হবে, যা কখনোই আমাদের ক্ষুধা নিবারণ করত না।

এ খাবারের খাদ্য উপাদান সম্পর্কে কিছুই জানতাম না আমরা। শুকর খাচ্ছি নাকি হালাল প্রাণী? কখনোই জানতে পারিনি। প্রথমবার টয়লেটে যাবার পরই শুধু দুই ঢোক পানি ছাড়া কোনো খাবার না খাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। তখন ছিল জানুয়ারি মাস। প্রচণ্ড শীত। শীতের সকালে তারা ফ্রিজের মতো বরফ পানির বোতল দিত।

দ্বিতীয় রাতে সেদিনকার দুপুরের খাবার না খেয়ে ঘুমোতে যাই। সেটা ছিল প্রচণ্ড শীতের রাত। হাঁটুর ব্যথা তখন সারা দেহে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে দীর্ঘক্ষণ শেকল পরা অবস্থায় থাকায়। ব্যথা কমানোর জন্য আমি পা নড়াচড়া করতাম। কিন্তু একদিন প্রহরীরা দেখে ফেলে। এরপর থেকে প্লাস্টিকের শেকলের বদলে লোহার শিকল পড়ায়। তাতে ব্যথা আরো বাড়ে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় আমার পা ফুলে যেতে থাকে। পা ফুলে গেলে শেকলের চাপ আরও বাড়ে।

আমি শুয়ে থাকতাম। ব্যথা আর ঠাণ্ডায় ঘুমাতে পারতাম না। পাতলা কম্বলে শীত মানত না। হাড়কাঁপানো শীত। যখন সকাল হতো আমি ফজর পড়ে নিতাম। কিন্তু খেতাম না। পানি আমার জন্য যথেষ্ট। আমার বাথরুমও

চাপত না। আমি দেখতাম রাতে বাথরুম চাপলে অনেকেই কষ্ট করত। সৈন্যদের ডাকলে মেজাজ দেখাত। রেগে যেত। কাউকে কাউকে পেটাত। তারা আহত হয়ে মেঝেতে গড়াগড়ি খেত। টয়লেটের চাপে দিশেহারা হয়ে যেত।

একবার এক কয়েদী যার খুব টয়লেট চেপেছিল। সে সৈন্যদের কাছে টয়লেটের অনুমতি চায়। অনুমতি না দিয়ে তাকে তার একহাত দরজার সাথে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখে। অন্য হাত দিয়ে সে চেষ্টা করে ছুটে যেতে কিন্তু পারেনা। তার ওই হাত যে শেকলে বাঁধা। সে সারা রাত সেখানেই ছিল। আমাদের সবার জন্যই এর মাধ্যমে একটা বার্তা দেয় তারা। সে রাতে আমরা কেউ ঘুমাতে পারিনি।

জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এক সপ্তাহ সেভাবেই কাটাতে হয়। একজন করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়। আমার মনে পড়ে তারা একদল নতুন কয়েদীকে সে সপ্তাহে ধরে এনেছিল। এরপর তারা তিন চারদিন পরপরই এমন একদল নতুন কয়েদীকে ধরে নিয়ে আসত। তেরো দিন পর তারা আমাকে উপর তলায় নিয়ে যায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। যখন আমি প্রবেশ করি কিছুটা উষ্ণ বোধ করছিলাম। এক মিনিটের জন্য মাথাটা ঝিম ধরে ছিল। টলতে টলতে চোখ বন্ধ হয়ে আসছিল। তখনি তারা চিৎকার দিয়ে বলে, "যদি চোখ বন্ধ করিস তো তোকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করব।"

একজন অফিসার সেখানে বসে ছিলেন। তার সাথে ছিল সে আরব লোকটি যার সাথে প্রথম রাতে সাক্ষাৎ হয়েছিল।

"তোর নাম কি?" সে জিজ্ঞেস করল। "কোথা থেকে এসেছিস? জাতীয়তা কী? জন্মদিন কবে? তোর পেশা কি?

"আমি একজন সাংবাদিক," বললাম।

"সেটা কি তুই ছিলি যে ওসামা বিন লাদেনের ভিডিও করেছে?"

অস্বীকার করলাম। সত্যটা বললাম। যদিও আমি সেই ব্যক্তি যে আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার দৃশ্য প্রথম দেখেছিল এবং তা ধারণ করে দুনিয়াবাসীকে দেখিয়েছিল।

"আমি বিন লাদেনের সে ভিডিও দোহায় বসে দেখেছিলাম," বললাম "আল জাজিরার হেড অফিসে বসে। রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছিল কাবুল অফিস থেকে। আপনার হাতে থাকা পাসপোর্টই তার প্রমাণ। আমি ১১

অক্টোবর ২০০১ এর আগে দোহা ত্যাগ করিনি। কিন্তু রিপোর্টটি ছিল দুই দিন আগের।"

ব্যাপারটা খুলে বললাম যে, দ্বিতীয় যে রিপোর্টটি তৈরি হয়েছে ওসামা বিন লাদেনকে নিয়ে তা হয়েছে কাবুলে। আর সেটা সরাসরি কোন ভিডিও নয় বরং অন স্ক্রীন করে তৈরি করা। দর্শকদের অনেকেই সেটা সরাসরি ভিডিও বলে মনে করেছে।

"তুমি সত্য বলছো তো যে তুমি ভিডিও করনি?", অফিসারটি বলল।

"আমি সত্য বলছি। তখন আমি কান্দাহারে ছিলাম। সেখানকার নিউজ সংগ্রহ করছিলাম। কাবুল কখনো যাওয়া হয়নি। আরো বললাম, আমি কান্দাহারে সিএনএনের সাংবাদিকদের সাথে ছিলাম, তাদের সাথে একসাথে কাজ করেছি, একসাথে থেকেছি। আশাকরি আপনারা সেখান থেকে ব্যাপারটা নিশ্চিত হতে পারবেন।"

সে এবার জানতে চাইল, "তাহলে, ১১ সেপ্টেম্বর তুমি কোথায় ছিলে?"

বললাম- "আমি তখন সিরিয়ায় ছিলাম।" ছুটি কাটাচ্ছিলাম। আমার সাথে আমার স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন। তারা সুদান থেকে এসেছিলেন। আল জাজিরা তখন আমাকে খবর দেয় যে আমাকে দ্রুত দোহায় আসতে হবে। সংবাদ সংগ্রহে আফগানিস্তান যেতে হবে। আমার পরিবারকে এরপর আজারবাইজান পাঠিয়ে দিই। সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে অথবা অক্টোবরের শুরুতে দোহায় চলে আসি। সেখানে কিছু প্রশিক্ষণ নিই। ভিডিও গ্রহণ, সম্পাদনার উপর কোর্স শেষে আমাকে আফগানিস্তান পাঠানো হয়। এভাবেই আমি এই কাজে নামি।

তাকে আরো বললাম যে, প্রথমে পাকিস্তানি অ্যাম্বাসীতে ভিসার জন্য পাসপোর্ট জমা দিই। তারপর সেখান থেকে ভিসা নিয়ে ১১ অক্টোবর পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে দোহা ত্যাগ করি। ১২ অক্টোবর ইসলামাবাদে অবতরণ করি। সাংবাদিক ইউসুফ আল সোমালি সে ফ্লাইটে আমার সাথে ছিল। আর বাকি ইতিহাস আপনি জানেন। তার পরের প্রশ্নটি আমাকে অবাক করে দেয়। তিনি বলেন, "যদি আমরা তোমাকে ছেড়ে দেই তবে তুমি গিয়ে আমাদের সম্পর্কে কী বলবে?"

আমি বুঝতে পারলাম, সে জানত যে আমি বিন লাদেনের ভিডিও করিনি। আরো জানত আমি ১১ সেপ্টেম্বর সিরিয়ায় ছিলাম। তার সাথে

একজন অনুবাদক ছিল যে আমার পাসপোর্ট চেক করে তথ্যগুলো তাকে ইংরেজিতে বুঝিয়ে দিচ্ছিল। আল্লাহ সাক্ষী আমি তখন বলেছিলাম: "যা যা ঘটেছে আমি তাই বলব। বলব তোমরা আমাকে পিটিয়েছ, আমার পায়ের লিগামেন্ট ছিঁড়ে ফেলেছ, আমাকে সালাত আদায়ে বাঁধা দিয়েছ, না খাইয়ে রেখেছ, কোন কারণ ছাড়াই সম্মানহানি করেছ, অপমান-অপদস্থ করেছ, আমাদের ধর্ম পালন করতে দাওনি, প্রয়োজনীয় কথা বলতে দাওনি, একটু নড়াচড়া করতেও দাওনি।"

তিনি হাসলেন। জিজ্ঞাসাবাদের সময় শেষ হয়ে আসছিল বলে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার কোনো কিছু প্রয়োজন কিনা।

"হ্যাঁ", আমি বললাম। "আমার ডাক্তার দেখানো প্রয়োজন। হাঁটুর ব্যথায় প্রচণ্ড কষ্ট পাচ্ছি। ঠাণ্ডায় আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি।" আমি তাকে আমার হাঁটু দেখালাম। ফুলে ব্যথায় টনটন করছিল। লিগামেন্ট সন্ধি ছিঁড়ে গিয়েছে। আমি তাকে আমাদেরকে দেয়াল ঘেরা টয়লেট ব্যবহারের অনুমতি দিতে বললাম। আমাদের ধর্ম পালনের অধিকার দিতে বললাম। পর্যাপ্ত খাবার দিতে বললাম। আরো কিছু কম্বলও দেয়ার অনুরোধ করলাম।

আমি বললাম "আমরা শীতে ঘুমাতে পারি না।" তিনি বললেন, তিনি আমাদের খুব বেশি সাহায্য করতে পারবেন না। তবে আমাকে একটি কম্বল দিতে পারবেন। তিনি সত্যিই একটি কম্বল দিয়েছিলেন। আমার কাঁধে উঠিয়ে দিলেন। যদিও তখন আমার হাতে হ্যান্ডকাফ পরা। সৈন্যকে আদেশ করলেন আমাকে বন্দিশালায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

পরদিন মধ্যরাতে একদল কয়েদীকে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদেরকে লাইন ধরে দাঁড় করানো হয়। একটা দড়ির সাথে লাইন করা হয়। তাদের নিয়ে আসা হয় এয়ারপোর্টের একদম মাঝখানে। হঠাৎ তারা অদৃশ্য হয়ে গেল। আমর ধারণা তাদেরকে কান্দাহারে মার্কিন বন্দিশালায় নিয়ে যাওয়া হয়।

আমার মনে পড়ে একজন আফগান কয়েদী একবার রাতে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। তারা তাকে ধরে ফেলে। একটি কক্ষে নিয়ে পাগলা কুকুরের মতো পেটাতে থাকে। জেগে থেকে আমরা তাকে নির্যাতনের শব্দ, তার রোনাজারি শুনছিলাম। হঠাৎ তারা বের হয়ে এল। চারদিকে আতঙ্ক। কিছুক্ষণ পর তার লাশ বের করে আনা হলো।

বাগরামে নিয়ে আসার ষোলো দিন পর এবং জিজ্ঞাসাবাদের তিন দিন পর, এক তীব্র শীতের রাতে কয়েকজনের সাথে আমার নাম্বার ধরেও ডাকে সৈন্যরা। তারা আমাদেরকে এক লাইনে দাঁড় করায়। প্রথম রাতের মত আমাদের সবার হাত এক দড়িতে বাঁধা। এরপর বিমানে টেনে তোলে। তীব্র শীতের রাত। কুকুর ঘেউঘেউ ডাকছে। সৈন্যরা চিৎকার চেঁচামেচি করছে। আমাদের মাথা কালো কাপড় মোড়ানো। তারা আমাদেরকে বিমানে তোলে। বিমান ছাড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। বাগরাম ছেড়ে যাচ্ছি। নিয়ে যাচ্ছি অপমান অপদস্থ হবার অভিজ্ঞতা ও এক শরীর ব্যথা। কিন্তু কোথায় যাচ্ছি?

আজ সে সময়গুলো নিয়ে ভাবি। ভাগ্যের নির্মম গতিপথ নিয়ে ভাবি। একটা প্রশ্ন হাতড়ে ফিরি। গুয়ান্তানামোতে প্রবেশের দিনটা যেন কেমন ছিল? পাকিস্তানে এসে বিমানের গেট খোলা হয়। হাতে পায়ে শেকল বাঁধা অবস্থায় নিচে নামি। আমার ব্যথার মতো আরেকজনের ব্যথা ছিল। সে হলো শেইখ আলা।

তারা আমাকে পাখির ডানা ধরার মতো করে দুহাত ধরে। টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায়। পিছনে আমার হাত বাঁধা। তারা আমার চশমা খুলে নেয়। চোখ বেঁধে ফেলে। শক্ত ধারালো প্লাস্টিকের শেকল দিয়ে আমার পা এমনভাবে বাঁধে যেন পা কেটে যাচ্ছিল। মাথাসহ মুখ কালো কাপড়ে ঢেকে দেয়। পায়ে ব্যালেন্স রাখতে পারছিলাম না। ফলে পড়ে যাই। তারা আমাকে একটি গাড়িতে ওঠায়। প্রতিবার ওঠা-নামায় শরীরের সবকিছু তল্লাশী করে বর্বরভাবে। আমাকে বিমানের সিঁড়িতে টানা হেঁচড়া করে হাঁটানো হয়। বিধ্বস্ত আমি, শারীরিকভাবে অসুস্থ। কানে শুনতে সমস্যা হচ্ছে। চোখেও কম দেখছি। এমতাবস্থাতেই তারা আমাকে জোর করে বিমানে ওঠায়। বিমানের মেঝেতে বসিয়ে রাখে। পাগুলো ছড়িয়ে দেয়। হাতগুলো কোমরের শেকলের সাথে বাঁধে। আরেকটি শিকল দিয়ে দুপা কোমরের সাথে বাঁধে।

বাগরাম থেকে কান্দাহার

বাগরাম থেকে কান্দাহারে বিমান অবতরণের মুহূর্তটি আমার আজও মনে পড়ে। দিনটি ছিল ২৩ জানুয়ারি ২০০২। আনুমানিক দেড় ঘণ্টা বিমান চলার পর গন্তব্যে এসে হাজির হই। সেনারা এসেই আমাদের পেটাতে থাকে। আমরা মাটিতে শুয়ে পড়ি। শিকারি কুকুর ঘেউঘেউ করছে। সৈন্যরা চিৎকার চেঁচামেচি করছিল। আমাদের পিঠের উপর লাফাচ্ছিল। তারা একজন কয়েদীর পিঠ থেকে আরেক কয়েদীর পিঠে লাফ দিচ্ছিল।

আমার পিঠে সৈন্য লাফ দিলে আমার দম বের হবার উপক্রম হয়। শরীরে রক্ত চলাচল বেড়ে যায়। তারা আমাদের পেটাতে থাকে। লাঞ্ছিত করতে থাকে।

সৈন্যরা জানতে চায় আমরা কেউ ইংরেজি জানি কি-না। বললাম আমি জানি। আমার পাশের এক কয়েদী বলে সেও জানে। পরে আমি তার নাম জেনেছি। তিনি সৌদি নাগরিক শাকির। তারা তাকে পেটাত আর বলত, "তোর সঙ্গী কারা বল! তোর সঙ্গীদের কে কে এই কয়েদখানায় আছে এখন? যদি না বলিস তাহলে তোর মা, বোন, স্ত্রীকে আমরা..." তারা এমন অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার করত যা আমার মুখে আসেনা। আমাদের মা বোনদের নিয়ে এমন কথা বলত যা মুখে আনা যায় না। সকল সীমা ছাড়িয়ে যেত।

সৈন্যরা শাকিরকে তার পাশের কয়েদীকে তাদের কথাগুলো অনুবাদ করে বলতে বলত। তাদের সে কথা মুখে নেয়া যায় না। তারা তার মা ও বোনের সাথে জেনা করতে চায় এই কথা আবার অনুবাদ করে পাশের

জনকে শোনাতে বলত। যখন শাকির এই জঘন্য কথা বলতে অস্বীকার করত, তাকে পেটানো হতো। পেটাতে থাকত যতক্ষণ না সে অনুবাদ করে শোনাত। অন্য কয়েদীর উত্তরটিও সৈন্যদের অনুবাদ করে শোনাতে হতো। যদি সে উত্তর না দিত তাকে পেটানো হতো। আবার উত্তর যদি তাদের পছন্দ না হতো তাহলে তাকেও পেটানো হতো।

একজন একজন করে তারা আমাদের সবাইকে কোথাও নিয়ে যেত। চোখ বাঁধা থাকত। আমার পালা এল। দু'জন সৈন্য আমাকে ধরে একটি বিশাল বিমান মেরামত কক্ষে নিয়ে গেল। বাগরামের মতো। আমি দেখলাম একদল সেনা অফিসার সেখানে বসে আছে। প্রত্যেকের সামনে টেবিল।

প্রথমজন আমাকে জিজ্ঞেস করল, "নাম কী? জাতীয়তা কী? কোন ভাষায় কথা বল? বয়স কত? পেশা কী?"

যথাসম্ভব সঠিক উত্তর দিলাম। যদিও বললাম, "আমি শুধু আরবি ভাষা জানি।" যখন আমি আমার পেশার কথা বললাম সে খুশি হলো। "আমাদের সাথে একজন সাংবাদিকও এখানে আছে?" বলে উঠল।

"কী ধরনের সাংবাদিকতা করতে?"

বললাম, "আমি আল জাজিরার সাংবাদিক।" সে ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দিল আমার গালে। সে আল জাজিরাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে জঘন্য ভাষায় গালিগালাজ করল। আবারো আমাকে চড় মারল।

"আচ্ছা, এই জন্যই তুই আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিস। তুই আমেরিকাকে ঘৃণা করিস। আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিস।" সে বলল। এরপর পাশের টেবিলের দিকে ঠেলে দিল।

তারা আমাদের পুরো গ্রুপটিকে উলঙ্গ করে। কাঁচি দিয়ে আমাদের জামা কাপড়গুলো কেটে দেয়। এরপর আমাদের জিজ্ঞেস করে, "তোদের অভিযোগ করার মতো আর কিছু আছে?"

যখন তারা আমার পিঠ থেকে রক্ত বের হতে দেখে তখন জিজ্ঞেস করে, "এই রক্ত কিসের?"

আমি উত্তর দেইনি কারণ কী বলব ভেবে পাই না। সে আরেকজনের দিকে ঠেলে দেয়। আমার সারা দেহ নির্লজ্জভাবে তল্লাশী করা হয়। সে টেবিল থেকে আরেক টেবিলে ঠেলে দেয়া হয়। যার কাজ ছিল কয়েদীদের ছবি তোলা।

আরেকজন মানুষ এল। সে আমার দাড়ি থেকে চুল টেনে তুলে একটা ব্যাগে রাখল। এরপর মুখের লালা নিল। পরের জন চুল কেটে নিল। আমার মাথার উপর ক্রশ চিহ্নের শেভ করল। যা অন্য কয়েদীরা আমাকে পরে বলেছে কারন আমার আয়নায় দেখার সুযোগ ছিল না।

শেষের জন কাপড় আর জুতা ছুঁড়ে দেয় আমার দিকে। সে জুতা আমার পায়ের মাপে খুবই ছোট। যখন তাকে ব্যাপারটা বললাম উত্তর দিল, "যদি তুই পায়ে পড়তে না পারিস তো মুখে দিয়ে রাখ।"

সৈন্যরা আমাকে একটি সেলে নিয়ে গেল। সেখানে অন্য একদল কয়েদীকেও নিয়ে যাওয়া হয়। আসলে তারা আমাদের সবাইকে এক নতুন কক্ষে নিয়ে আসে। এসময় আমাদের হাত পায়ের শিকল ছিল না। সেখানে একটি তীব্র লাইটের আলো আমাদের চোখে মারা হয়। বাগরামেও এরকম একবার করা হয়েছিল। তারা আমাদের কম্বল দেয় কিন্তু তবুও আমাদের শীতের সাথে লড়াই করতে হয়। পাতলা কম্বলের একটা বিছিয়ে আরেকটা গায়ে দিতাম। কিন্তু এরপরেও হাঁড়-কাপুনি শীতে ঠকঠক করে কাঁপতাম। জড়োসড়ো হয়ে থাকতাম শরীর গরম হবার আশায়।

সূর্য ওঠার পর সকালে আমিই প্রথম ঘুম থেকে জেগে উঠি। আমাদের কেউ কেউ সালাত আদায় করতে চাইত। কেউ টয়লেট করতে চাইত। টয়লেটের জন্য আমাদের সেলের সাথে একটি করে বাকেট লাগানো আছে। আমরা অবাক হলাম! কিভাবে তারা চিন্তা করে যে সব কয়েদীর সামনে আমরা প্রকৃতিক কাজ সারবো?

একজন কয়েদী পরামর্শ দিল, আমরা কম্বল দিয়ে বেড়া দিয়ে দেব বাকেটের চারপাশে। কিন্তু একজন সৈন্য চিৎকার করে বলে উঠল, তুমি আইন ভঙ্গ করছো। যদি তা করো তবে তুমি কম্বল পাবে না।

আমরা যা করতে পারি তা হলো সবাই মুখ ফিরিয়ে রাখা। আমরা শুনতে পেলাম পুরুষ ও নারী সৈন্যরা হাসাহাসি করছে। কারণ তারা আমাদের প্রত্যেকের গোপনাঙ্গ সম্পর্কে জানে। আমি আসলে ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না তারা যেসব জঘন্য কথা বলছিল আমাদের কয়েদীদের সম্পর্কে।

একদিন এক সুঠামদেহের আফগান কয়েদীকে তারা আমাদের সম্মুখে নিয়ে আসে। তাকে পেটাতে থাকে, মাথায় আঘাত লাগায় রক্তক্ষরণ শুরু

হয়। তার জামাকাপড় রক্তে ভিজে যায়। দেখে মনে হচ্ছে যেন সে কঠিন মারামারি করেছে সর্বশক্তি দিয়ে। সৈন্যরা তাকে আমাদের সাথে রাখে।

সে মাথা তুলে জিজ্ঞেস করে, "আপনারা কি আরব?"

আমরা ইতিবাচক মাথা নাড়লাম। সে বলল, "আমাকে বাঁচান! তারা আমাকে মেরে ফেলবে!"

আমরা কোনো উত্তর দিলাম না। আমাদের অক্ষমতা দেখে সে কান্নায় ভেঙে পড়ে। আমাদের কেউ কেউ তার সাথে কাঁদে। কিন্তু আমরা তার সাহায্যে এক ইঞ্চিও এগিয়ে যেতে পারিনি। মনুষ্যত্বের, মানবতার পরাজয় দেখেছিলাম সেদিন। নিজ চোখে।

ফজরের নামাজের পর একদিন সৈন্যরা ঘণ্টায় ঘণ্টায় আমাদের এখানে আসত আর কজন করে নিয়ে যেত। যাদের নিয়ে যাওয়া হতো তারা আর ফিরে আসত না। শীঘ্রই আমার পালা এল। তারা আমাকে আমার আগের নাম্বার ধরে ডাকে এবং নতুন নাম্বার দেয়, ৪৪৮।

তারা আমাকে নিয়ে যায় এবং যথারীতি শেকল, বেড়ি পড়ায়। একটি তাঁবুতে নিয়ে যায় এবং মেঝেতে বসিয়ে রাখে। একজন সৈন্য রুটিনমাফিক জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। তোমার নাম কী? কোথা হতে এসেছ? জন্মতারিখ? জন্মস্থান? কখন তুমি আফগানিস্তানে এসেছ? ইত্যাদি।

তার একজন অনুবাদক ছিল যে মিশরীয় আরবিতে ভাষান্তর করে দিচ্ছিল। আধা ঘণ্টা চলল এভাবে। জিজ্ঞাসাবাদকারী আবারো বিন লাদেনের ভিডিও করা নিয়ে জিজ্ঞেস করল। উত্তর করলাম আমি জানি না। শেষে তিনি ফাইলপত্র বন্ধ করে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, "শোন, তোর প্রভুও তোকে এখান থেকে বাঁচাতে আসবে না যদি তুই সত্যটা না বলিস। সত্য কথা না বললে আমরা এখানেই তোকে পুতে ফেলব।"

একদল সৈন্য একটি কালো বস্তা নিয়ে এসে মাথা ঢেকে আমাকে নিয়ে যায়। মাথা নিচু করে হাঁটুর সাথে লাগিয়ে রাখে। আরো শেকল পরায়। আরো কষ্টদায়ক পরিস্থিতি তৈরি করে। এরপর হাঁটিয়ে একটি ঘরের সামনে নিয়ে আসে। যেখানকার মানুষরা আরবিতে কথা বলছিল। সৈন্যরা দরজা খুলল। ধাক্কা দিয়ে আমাকে ভেতরে ঠেলে দিল। মাথার বস্তাটি খুলে ফেলল। হাতে পায়ের বাঁধন মুক্ত করল । বাইরের থেকে দরজা লাগিয়ে দ্রুত চলে গেল।

আরো কিছু মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। আমাকে দাঁড়াতে উৎসাহ দিচ্ছিল তারা। তাই আমি উঠে দাঁড়ালাম। দেখলাম আমি একটি বিশাল তাঁবুতে আছি। যেখানে আরও ২০ জন কয়েদী ছিল। আমি সেখানকার আরব কয়েদীদের কাছে গেলাম। তারা আমাকে জড়িয়ে ধরলো। আবেগতাড়িত হলাম। আমিও তাদের জড়িয়ে ধরলাম। কাঁদলাম, সবাই কাঁদলাম।

কোলাকুলির পর আমার সহযাত্রী কয়েদীরা আমার হাঁটুর ব্যথা আর পা ফোলা কমাতে কিছু করতে চাইল। তারা আমাকে তাঁবু ঘুরে দেখতে সাহায্য করল। আমরা আরো গভীরভাবে একে অপরকে জানলাম। তারা আমাকে বললেন এ বন্দিজীবনের কথা। আমি জানলাম যে আমরা কান্দাহার বিমান বন্দরের আশেপাশে কোথাও আছি। আমাদেরকে এখানে যে কয়েদখানায় রাখা হয়েছে তার ভিতর তিনটি সারি রয়েছে। আমি যখন আসি তখন সেখানে আরও কিছু তাঁবু খালি ছিল। শুধু তিনজনকে ঘোরাফেরা করার অনুমতি দেয়া হয়। যেকোনো সময় কথা বলার অনুমতিও রয়েছে তাদের জন্য।

সেখানে এমন মানুষও ছিল যাদেরকে আমি বাগরামে দেখেছিলাম। পাকিস্তানের সামরিক কারাগার থেকে দু'জন সুদানি নাগরিক, কোয়েটা যাবার পথে শামান থেকে আমরা একসাথে ছিলাম। যখনই তারা নতুন কোনো কয়েদী নিয়ে আসত আমাদেরকে লাইন ঠিক রাখতে পিছনে চলে যেতে হতো। মাথায় হাত রেখে হাঁটু দিয়ে হামগুড়ি খেয়ে। তাঁবুতে আমাদের প্রতিমুহূর্তের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করত এক সেনা। কাঁটাতার ঘেরা তাঁবুর চারপাশে অন্যান্য সৈন্যরাও থাকত।

পায়ের অবস্থা আরো খারাপ হতে থাকে। ব্যথা আরো বেড়ে যায়। বহু কষ্ট করে আমাকে দাঁড়াতে হতো। এমতাবস্থায় চিন্তা করুন কতটা বীভৎস জীবন যাপন করতে হতো আমাদের যেখানে সৈন্যরা আমাদের পিটিয়ে, লাথি মেরে মজা করত।

একদিন সৈন্যরা আমার নাম্বার ধরে ডাকল। আরেকটি তাঁবুতে নিয়ে গেল। সেখানে আমি এক বাহরাইনি লোকের দেখা পাই যার নাম আল-মুরাবিত। সে আমাকে বলল সে গত তিন দিন ধরে এই তাঁবুতে। সে নিয়মকানুন ব্যাখ্যা করল, যেমনটা তার আগের কয়েদীরা তাকে

জানিয়েছিল। বাগরামের মতোই নিয়মকানুন। কিন্তু এখানে আমরা দুবেলা খাবার পেতাম। একবেলা মধ্য দুপুরে আরেকবেলা মধ্য রাতে।

খাবার বিতরণের আগে তারা আমাদের নাম ধরে ডাকত। সবাই আছি কিনা নিশ্চিত হবার জন্য। আমরা লাইন ধরে দাঁড়াতাম নাম ডাকা সেই সৈন্যের সামনে। আমরা আমাদের নাম্বার একাধিক বার বলতাম যাতে সৈন্যটি আমাদের পেছনে দেয়া নাম্বারটি পড়তে পারে। এরপর ভিতর থেকে নাম্বার অনুযায়ী খাবার আসত। পনের মিনিটের মধ্যে খাবার শেষ করতে হতো। এরপর সৈন্যরা চলে আসত তুমি সে খাবার খেতে পার আর না পার।

একরাতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বৃষ্টি হচ্ছিল। খাবার দেয়া হবে। আমরা ছিলাম প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত। শীতে ঠক ঠক করে কাঁপছি। বাড়ির উষ্ণতার কথা মনে পড়ছিল। কিন্তু আমরা আমাদের চারপাশের নারকীয় অবস্থার কথা ভুলতে পারছি না। আমি তখন প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত ও প্রাণ ওষ্ঠাগত। তাই খাবার নিলাম আর খেতে শুরু করে দিলাম। মুরাবিতের সাথে টুকটাক কথাও বলছিলাম। সে জানাল কিভাবে সে এখানে এসেছে। সে তাবলীগ জামাতের সাথে কাজ করত। এইকাজে ব্যস্ত থাকার সময়েই তাকে তুলে নিয়ে আসে। আফগানিস্তানে যুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ তাকে গ্রেপ্তার করে। এরপর মার্কিন সেনাদের হাতে তুলে দেয়।

সে আমার ইতিহাসও জানতে চায়। আমি আমার পেশা, গ্রেপ্তারের ধরন তাকে বর্ণনা করি। সে আমাকে বেশ কিছু পরামর্শ দেয়। কিভাবে মার্কিন সেনাদের আচার-আচরণ বুঝতে হয় কারণ সে বাহরাইনে মার্কিন সেনাদের সাথে ওঠাবসা করেছে। কিভাবে তাদের সাথে মিশতে হয়, কখন রাগ করতে হয়, কখন হাসতে হয়, কখন নিজের পরিচয় তুলে ধরতে হয় ইত্যাদি বিষয়ে সে জ্ঞান দিল।

আমরা বসে কথা বলছিলাম দেখে এক মার্কিন সেনা ক্ষেপে যায়। চিৎকার করে বলে, "কেন তোরা খাবার জায়গা পরিষ্কার করিসনি?" তাকে মাথায় হাত তুলে হাঁটু গেড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বলল। সৌভাগ্যক্রমে সৈন্যটি এ শাস্তি এক ঘণ্টার বেশি দেয়নি। এরকম শাস্তি তেমন কোন অস্বাভাবিক কিছু না। আর সৈন্যটিরও স্বেচ্ছায় হোক আর নিয়মমাফিক হোক শিফট পরিবর্তন হবেই। শাস্তির আদেশ তার শিফটেই শেষ হয় আরেকজনের বেলায় থাকে না।

মুরাবিত তার শাস্তির মেয়াদ শেষ হলে বলে, "আল্লাহই চায়নি তোমাকে আরো পরামর্শ দেই। কারণ উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যদের কোন বোধবুদ্ধি নেই।" আমি বেশ কয়েকবার সেসব কৌশলের প্রয়োগ ঘটাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছি।

মুরাবিতের সাথে দ্বিতীয় রাত কাটানোর দিন, সৈন্যরা আমার নাম্বার ধরে ডাকে। আরেকটি তাঁবুতে স্থানান্তর করে দেয় আমাকে। সেখানে আমিসহ নয়জন আরব, তিনজন পাকিস্তানি কয়েদী ছিলাম। আরবদের মধ্যে একজন ইয়ামেনি আটজন সৌদির। তাদের মধ্যে মক্কার মাজিদ আল ফারিহও ছিলেন, যার সাথে শামান থেকে একসাথে এসেছিলাম।

মাজিদের বয়স আঠারোর বেশি হবে না। সেও পাকিস্তানে গিয়েছিল তাবলীগ জামাতের কাজে। যুদ্ধ বেঁধে যাবার পর তারা গ্রামের দিকে যাচ্ছিল। কিন্তু পুলিশ তাদের পুরো জামাতটিকে আটক করে। তার কাগজপত্র দেখে তাকে মার্কিন সেনাদের হাতে তুলে দেয় পাকিস্তান পুলিশ। মার্কিন সেনারা তার পাসপোর্ট চাইলে দেখাতে পারেনি। কারণ সেসব নথি পাক পুলিশ রেখে দিয়েছিল।

সেখানে কিছু মরোক্কান ও তিউনিশিয়ান কয়েদীও ছিল আমাদের পাশের তাঁবুতে। বহু জাতীয়তার, বহু ভাষার বিচিত্র মানুষদেরকে একসাথে এই কয়েদখানায় আনা হয়েছে। জিঘাংসা, জুলুম সব করা হচ্ছিল শুধু একটি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে, আর সেটা হলো 'ইসলাম'। সেই পাকিস্তানিরা কতটা নির্মম; যারা অর্থের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে, বিবেক বন্ধক রেখে অত্যাচার, অবিচারের মুখে নিজেদের ভাইদের ঠেলে দিয়েছে।

কান্দাহারে আমার প্রথমদিকের দিনগুলোতে রেডক্রস থেকে একটি প্রতিনিধি দল দেখা করতে আসে। আমি তাদেরকে আগ্রহ নিয়ে আমাদের সাথে করা নির্মমতার বর্ণনা দিয়েছিলাম। আমাদেরকে পেটানো, নাজেহাল করা, অপমান অপদস্থ করা, খাদ্যের অভাবে রাখা ইত্যাদি বলেছিলাম। আমাদের সকল অধিকার হরণ করার কথা বিস্তারিত বলেছিলাম। একজন প্রতিনিধি তখন বলেছিল তার সাথে ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা বলতে যাতে মার্কিন সেনারা আমাদের কথা বুঝতে না পারে। আমাদের একজন ফ্রেঞ্চ ভাষা বুঝত কিন্তু সে এক শব্দ আরবি বোঝে না। ফলে আমরা সে প্রতিনিধিকে তেমন কিছু আর বলতে পারিনি।

আমি এক প্রতিনিধির সাথে কথা বললাম। সে বাড়ির ঠিকানা দিতে বলল। আমার বিস্তারিত পরিবারকে জানাবে। আমি ঠিকানা দিলাম। আমাদের উপর শাস্তির যতটা সম্ভব বর্ণনা দিলাম। মধ্যরাতে মাথায় হাত রেখে হামাগুড়ি দেয়ার কথা, শাস্তি হিসেবে হোক আর পর্যবেক্ষণ হিসেবে হোক হাঁটু গেড়ে মাথায় হাত তুলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার কথা বললাম। আরো বললাম আমাদের অনবরত গালিগালাজ, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা হতো। প্রহার করা হতো। কখনো লাঠি আবার কখনো বন্দুকের বেয়নেট দিয়ে।

দুঃখজনকভাবে, সে প্রতিনিধির সাথে কথা বলে আমি বুঝতে পারলাম যে কয়েদীদের অধিকার সম্পর্কে তাদের আসলে তেমন কোনো জ্ঞান নেই। তাই এসব ক্যাম্পে পড়ে থাকা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিলনা। আমি দু'টি চিঠি লেখার জন্য কাগজ চাইলাম। একটি আমার স্ত্রীর কাছে এবং অন্যটি আল জাজিরার অফিসে পাঠাব। যে চিঠি পাঠিয়েছিলাম, তার কোন উত্তর আমি পাইনি। কিন্তু আমি যখন রেড ক্রস প্রতিনিধিদের কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাইলাম তারা সাদামাটা উত্তর দিল যে, তারা কোন উত্তর পায়নি। তাতে আমি দমে যাইনি। আমি বার বার চিঠি পাঠাতে লাগলাম।

কান্দাহারের জঘন্য বিষয় ছিল নাম ডাকা। তারা নাম ডাকত কনকনে শীতের রাতে আর গ্রীষ্মে ঘামঝরা দুপুরে। কষ্ট শুধু বিরূপ আবহাওয়ার কারণেই হতো না বরং সৈন্যদের বর্বর আচরণের কারণেই বেশি হতো।

প্রায় চার মাস আমরা গোসল করতে পারিনি। পানি দিয়ে হাত মুখ ধুতে পারিনি। অজু করতে পারিনি। তারা শুধু বোতলে পানি দিত খাবার জন্য। ময়লার স্তর জমে গিয়েছে শরীরে। উকুন হয়ে গিয়েছে কাপড়ে, মাথায়, শরীরে। আমি কখনোই সে ভোগান্তির কথা, দুর্দশার কথা, অপমান অপদস্থের কথা ভুলব না।

কান্দাহারে জীবন এভাবেই চলেছে। অদ্ভুত সব পরীক্ষণ, যাচাই বাছাই। তাদের সেখানে প্রশিক্ষণ দেবার জিনিসপত্রও ছিল যাতে কয়েদীকে এক বিদ্রোহী পরিবেশে বেড়ে উঠতে এবং সেভাবে জিজ্ঞাসাবাদ চালানোর কথা রয়েছে। ট্যাংক, সেনাবহনকারী ছোট ছোট গাড়ি বন্দুকধারী সৈন্যদের উন্মাতাল মিউজিক অতঃপর কয়েদীদের তাঁবুতে এসে উন্মাতাল, বেপরোয়া

পিটুনি দেয়া সবই এর অন্তর্ভুক্ত। প্রশিক্ষণে হাতে কলমে শিক্ষার জন্য তারা কয়েদীদের তাঁবুগুলোতে আসত। কয়েদীদের অসুস্থ বানিয়ে ফেলত।

এসব কিছু ছিল মনস্তাত্ত্বিকভাবে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করার মতো। মার্কিন সেনারা এসব ভালোভাবেই রপ্ত করেছে। তাদের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে'র রং মেখে তা চালিয়ে দিচ্ছে, যা আসলে ক্রুসেড যুদ্ধেরই বর্ধিত অংশ।

বাগরামে কয়েদীদের মাথায় ক্রুশ চিহ্ন এঁকে দেয়া এবং কান্দাহারে ওয়াচ টাওয়ারের উপর একটি বিশাল কাঠের ক্রুশ স্থাপন করা আমাদের মুসলিম কয়েদীদের নৈতিকভাবে আহত করে। আমাদের কেউই ক্রুশ ইস্যু নিয়ে কারো কাছে কোন অভিযোগ করেনি। বরং আমরা বেশি আহত হয়েছিলাম নারী সৈন্যদের অশ্লীল বাক্যবাণে, শারীরিক ও নির্যাতনে।

আফগানের এক বৃদ্ধ

কয়েদীদের মধ্যে আফগানি এক বৃদ্ধ লোক ছিলেন। বিশালদেহী। গায়ের কাপড় ঠিকমতো লাগতে পারত না। এবং তা অনেকটা ছেঁড়াফাঁড়া ছিল। প্রহরীর কাছে সে সুঁই সুতো চায় ছেড়াগুলো সেলাই করতে। প্রহরী তখন তাকে এমনভাবে গলাটিপে ধরে যে গলায় দাগ বসে যায়। গলার সে দগদগে দাগ বেশ কিছু দিন ছিল।

এক দোভাষীর সাহায্যে তার সাথে কথা বলি। সে জানায়, সে একজন ভবঘুরে মানুষ। পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকায় পড়ে থাকত। মার্কিনিরা তাদের এলাকায় হামলা চালায়। তাদেরকে আটক করে। তার ছেলে, ভাইয়েরা এবং অন্যান্য আত্মীয় পাশের তাঁবুতে আটক। আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তানে চোরাচালান কারবারের সাথে জড়িত থাকার অপরাধে তাদের আটক করা হয়। তার বিরুদ্ধে কিছু আরব নাগরিকের যোগসাজশে চোরাকারবারির সাথে অভিযোগ আনা হয়।

লোকটি কসম কেটে বলে যে, সে কোনো আরবকে চেনে না। সে ছিল বধির। মানুষ তাকে কী বলে তা বুঝতে অক্ষম। সে সালাত আদায়ের নিয়মকানুন কিছুই জানত না। আমরা তাকে শিখিয়ে দিয়েছিলাম। সে ধর্মীয় বিধিবিধান তেমন জানত না। কিন্তু তারপরেও মার্কিনিদের হাত থেকে তার শেষ রক্ষা হয়নি। তিন মাসের নির্যাতন ও জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাকে ও তার পরিবারকে মুক্তি দেয়া হয়। এই সময়ের মধ্যে সে সূরা ফাতিহা ও আরো কয়েকটি ছোট ছোট সূরা শিখে ফেলেছিল।

রেডক্রসের এক কর্মকর্তা পরে আমাদের জানায় যেসব নিরপরাধ কয়েদীরা তাদের এলাকায় ফেরত গেছে মার্কিন বিমান সেসব এলাকা বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছে। সেসব ভবনে অনেক বৃদ্ধ, অসহায় নারী ও শিশুরা বসবাস করত।

কান্দাহারে জিজ্ঞাসাবাদ

বাগরামের চেয়ে কান্দাহারের জিজ্ঞাসাবাদ ছিল আরো জঘন্য। সে জিজ্ঞাসাবাদ আরো দীর্ঘ সময়ব্যাপী, আরো জটিল। জিজ্ঞাসাবাদ দিনে রাতে যেকোনো সময় শুরু হতো। মধ্য রাতের জিজ্ঞাসাবাদ সবচেয়ে আতঙ্কের এবং কষ্টকর ছিল। জিজ্ঞাসাবাদের সময় দীর্ঘায়িত ছিল। একই প্রশ্ন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার করা হতো। প্রথমবার আসার দিন একবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। দু'সপ্তাহ পর আবার ডাক পড়ে। প্রতিবারই আমার পুরো জীবন কাহিনি বলতে হতো।

বাগরামের মতোই সৈন্যরা আসত একজন কয়েদীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যেতে। সবাইকে লাইনে দাঁড়াতে বলত। হাঁটু গেড়ে মাথার ওপরে হাত তুলে দাঁড়াতে হতো। কয়েদীদের নাম্বার ধরে ডাকা হতো। যার নাম্বার বলা হতো সে তাঁবুতে সৈন্যদের পাশে চলে যেত। পাশে গিয়ে মুখ নিচের দিকে করে শুয়ে থাকত। হাত পিছনে বাঁধা। একজন সৈন্য তার পিঠের উপর হাঁটু দিয়ে চাপ দিয়ে রাখত। আরেকজন সৈন্য তার লোহার বেড়ি পরানো পায়ে পাড়া দিয়ে রাখত এবং মাথায় কালো কাপড় মুড়িয়ে দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখত। আবার কখনো দাঁড় করিয়ে রাখত নামাজে রুকু করার মতো করে। কখনো দুজন সৈন্য দু-বাহু ধরে নিয়ে যেত। তাদের একজন কয়েদীর ঘাড় মাথা চেপে ধরত। আরেকজন সেলের খোলা তালাটি লগিয়ে দিত।

তারা জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষে পানির জগ পাঠিয়ে দিত যাতে পানির কষ্ট হয়। ধুলাবালি, পাথর মাড়িয়ে টলতে টলতে গিয়ে কয়েদীরা জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষে হাজির হয় তখন পানি দেখেও যাতে পান না করতে পারে কষ্ট পায়।

সৈন্যরা তাঁবুতে ঢোকার আগে কখনো কয়েদীদের সতর্ক করত না। পানি না পেয়ে কয়েদীরা দরজার চৌকাঠে মাথা ঠুকত।

মনে করুন, আপনাকে মাটিতে শুইয়ে রাখা হয়েছে। তখনো আপনার মাথা কালো কাপড়ে ঢাকা। আর আপনার পাশেই একজন সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞাসাবাদকারী একজন দোভাষী নিয়ে কথা বলছে। আপনাকে দোভাষী আর জিজ্ঞাসাবাদকারী থেকে দুই মিটার দূরে রাখা হলো। একজন সৈন্য আপনার মাথার কালো কাপড় খুলে দিল আর জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হলো। আবার সেই নিজের জীবন কাহিনী বলার বিরক্তিকর কাজ। এরকম আরো চার-পাঁচ বার বলা হয়ে গেছে। তখন আপনার কাছে কেমন লাগবে?

আমি ছিলাম খালি পায়ে। কারণ তারা যে জুতা দিয়েছে তা আমার পায়ের মাপে হয় না। ঠাণ্ডায় পা ফুলে গেছে। বিরূপ আবহাওয়ার মধ্যেও তারা আমাকে খালি পায়ে নিয়ে যেত। কনকনে শীতে খোঁড়াতে খোঁড়াতে যেতাম। তাঁবুতে ফিরেও আমি ঠকঠক করে কাঁপতে থাকতাম। ব্যথার বিষে গোঙ্গাতে থাকতাম। ঘুম দূরে থাক দুচোখের পাতা এক হতো না, এক মুহূর্তের জন্যও না।

একবার এক নতুন জিজ্ঞাসাবাদকারী এল। যার কথা শুনে খুব অভিজ্ঞ মনে হলো না। আমাকে জিজ্ঞেস করল, "আমরা যুদ্ধে আছি। তুমি জানো যে যুদ্ধে কিছু ভুলত্রুটি হয়ই। তদন্ত করে আমরা নিশ্চিত হয়েছি যে তোমার ব্যাপারে আসলেই আমরা ভুলের মধ্যে আছি। তাই সামরিক প্রশাসন তোমাকে ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তোমাকে তোমার দেশে ফিরিয়ে দেবার প্রক্রিয়া চলছে। আমরা তোমাকে তোমার জামাকাপড় ফেরত দিয়ে দেব। কিছু টাকা পয়সা দেব। তুমি বাড়ি চলে যাবে।"

আমি তার দিকে তাকালাম। সে বলল, "টাকা বেশি হবে না, শুধু বাড়ি যাবার জন্য যা লাগে, ততটুকুই পাবে।"

আমি উত্তর করলাম, "দোহায় যাবার জন্য আমার ফিরতি টিকিট আছে। আমার টাকা পয়সা যা আপনাদের কছে জমা রয়েছে তা যথেষ্ট। অতিরিক্ত কোনো টাকার প্রয়োজন হবে না। শুধু প্রয়োজন একটি বিবৃতি যাতে আপনি বলবেন আপনারা ভুল করেছেন। বিবৃতিটি আল জাজিরা কর্তৃপক্ষকে পাঠাবেন যাতে আমি আমার কাজে যোগ দিতে পারি।"

সে একমত হলো, "আমরা তোমাকে একটি বিবৃতিপত্র দিব। কিন্তু শর্ত হলো বিবৃতিপত্রটি তুমি প্রকাশ করতে পারবে না।"

আমি কথা দিলাম। সেও কথা দিয়ে গেল কিছু দিনের মধ্যে সে আমাকে মুক্তির বিবৃতিপত্রটি দিচ্ছে। বলার অপেক্ষা রাখে না সে প্রতিশ্রুতি কখনোই বাস্তবায়িত হয়নি। এক সপ্তাহ পর তারা আমাকে আরেকটি তাঁবুতে স্থানান্তর করল এবং আমাকে এমন শাস্তির মুখোমুখি হতে হলো যা আগে কখনো ভাবিনি। জিজ্ঞাসাবাদকারী আমাকে সাদর আমন্ত্রণ জানালো। আমাকে একটি সিট ও কম্বল দিল। সে অনেক পরিপাটি মানুষ ছিল। তার প্রশ্নগুলোও ছিল অনেক বন্ধুসুলভ। প্রশ্নগুলো ছিল আমার পরিবার সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট। বিবাহ পরবর্তী জীবন সম্পর্কে। আজারবাইজানের সাথে আমার সম্পর্ক নিয়ে।

সে নরম সুরে কথা বলত এবং বেসামরিক পোশাক পরিহিত ছিল। ব্রিটিশ উচ্চারণে ইংরেজি বলত। তার সাথে মার্কিন সেনাদের কোন তুলনা চলে না। আমি জানি আমেরিকানরা হলো মিশ্র জাতির। আর সম্ভবত এই জিজ্ঞাসাবাদকারী একজন অভিবাসী মার্কিন নাগরিক। অবশ্য আমার জানা নেই তারা ব্রিটিশ নাগরিকদের কাজে নিয়োগ করে কিনা!

এক মাস পর। আবার আমার ডাক এল। নারী ও পুরুষ সৈন্য আছে এমন একটি তাঁবুতে নিয়ে যাওয়া হলো। তারা আমাকে চেয়ারের নিচে বসাল। জিজ্ঞাসাবাদকারী দু'জন বলল যে তারা জানে আমি একজন আল জাজিরার ক্যামেরাম্যান। আফগানিস্তানে গিয়েছিলাম সংবাদ সংগ্রহের কাজে।

শান্তভাবে বললাম, "আপনারা কি নিশ্চিত যে আপনারা আমাকে চেনেন? কিন্তু আপনারা কারা?"

নারী সৈন্যটি কৌতুক করে বলল, "আমরা হলাম টম এন্ড জেরি। ও টম আর আমি জেরি।"

আমার হাসি এল না বরং উত্তর করেছিলাম, "তো আপনারা আমার কাছে কী চান?"

"আমরা জানতে পেরেছি যে তুমি চলে যাচ্ছ। তাই আমরা তোমার কাছে থেকে কিছু বিষয় জেনে নিতে চাই। তোমরা যে তাঁবুতে থাকছো সেখানে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রদ্ধাভাজন কে? কে তোমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যাকে তোমরা নেতার মতো মনে করো? কে সে

ব্যক্তি যার কথা সবাই শোনে? অথবা সে যখন আদেশ করে সবাই মেনে চলে?

আমি তাদের বললাম, "এখানে এই বর্ণনার মতো কোনো ব্যক্তি নেই। আমরা সবাই সাধারণ।"

পাল্টা প্রশ্ন, "হামজা আল বাতাল কেমন? তার কম্বল কয়টা? দৈনিক সে কয় বেলা খাবার পায়?"

হামজা আল বাতাল একজন তিউনিশিয়ার লোক এবং স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব। আরবিতে বাতাল মানে নায়ক। সে ছিল একজন সাহসী মানুষ। সে কোনো কিছুকে ভয় পেত না। কোনো সংকোচবোধ তার ছিল না। মার্কিন জেলজুলুম নির্যাতনের প্রতি তার মনোভাব অবজ্ঞা করার মতো; জুলুমবাজদের কাছে আত্মসমর্পণ না করার মতো। তাদের এত এত খরচের, কড়া পাহারার আয়োজনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শনের মতো।

"হামজা সম্পূর্ণরূপে একজন সাধারণ মানুষ। সে অন্যদের শ্রদ্ধা করে এবং নিজের ধর্ম পালন করে। অন্যদের মতোই জীবনযাপন করে। তার কোনো কর্তৃত্ব নেই, বিশেষ কোন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নেই।"

কিছুক্ষণ সবাই চুপ। নীরবতা ভেঙে একজন জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা বলুন তো আপনাদের তাঁবুতে কে কে পালানোর চেষ্টা করেছে? অথবা ক্যাম্পের জন্য ক্ষতিকর সহিংস কর্মকাণ্ড করার পরিকল্পনা করছে?

"আমরা কোথায় পালিয়ে যাব?" আমি বললাম। "আমরা কান্দাহারে ছিলাম। বিমানবন্দরে ছিলাম। মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে ছিলাম। সবসময় সর্বত্র আমরা সৈন্যদের প্রহরায় ছিলাম। কিভাবে আমরা পালানোর চিন্তা করতে পারি? আর যদি আমাদের এখানকার কেউ একজন সকল মার্কিন সৈন্যের চোখে ধুলা দিয়ে পালাতে সক্ষম হয়ও স্থানীয় আফগানিরা (দালালরা) আমাদের ঠিকই ধরে ফেলবে। তাহলে কেন আমাদের কেউ পালানোর চিন্তা করবে?"

"তুমি হয়তো পালানোর চেষ্টা করছো না কিন্তু অন্যরা করছে।"

"আমি এমন কিছু শুনিনি," তাদেরকে বললাম। আরো বললাম, "সবাই আমাকে চেনে। আমার (সাংবাদিক হবার) ব্যাপারে সৈন্যরা সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছে। তাই সবাই আমাকে এড়িয়ে চলে। এরকম কোনো গোপন খবর আমার কাছে আসেনি।"

এরপর তারা আসল কথাটি বলল। "আমরা চাই তুমি একটা বিষয়ে আমাদের সাহায্য করো। সেটা হলো, যদি তুমি শোনো কেউ পালানোর পরিকল্পনা করছে, অথবা খারাপ কিছু ঘটানোর ফন্দি আটছে, অথবা যদি দেখো কেউ অতি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাচ্ছে তবে আমাদেরকে বা প্রহরীদের জানাবে। যদি তুমি রাজি হও তবে আমরা তোমার খাবার বাড়িয়ে দিব। আরো কম্বল দিব। আরো কিছু সুবিধা তুমি চাইলে পাবে।"

আবারো বললাম যে, এরকম কেউ করতে চেয়েছে বলে আমার জানা নেই। আর আমার তেমন কিছু প্রয়োজন নেই। আমি যা চাই তা হলো, এখান থেকে পরিত্রাণ। আমার পরিবার, আমার পুত্র, আমার কর্মস্থলে ফিরে যেতে।

তারা বলল, আমরা শীঘ্রই তোমাকে মুক্তি দিব। তার আগ পর্যন্ত আমরা তোমার যত্ন নিব। তোমার যা চাহিদা তার সব দিব। তুমি শুধু আমাদের চাহিদা মতো কিছু কাজ করো।"

আমি আবারো ক্ষমা চাইলাম। এ ব্যাপারে আমার অক্ষমতা তাদের সামনে প্রকাশ করলাম, "আমি সেসব মানুষকে চিনি না। আমি সাহায্য করতে পারব না। তারা জানে আমি কে কিন্তু তারা আমাকে বিশ্বাস করে না। আমি শুধু জানি তারা সাধারণ মানুষ। পালিয়ে যাওয়া কিংবা কোন অঘটন ঘটানোর ফন্দি থেকে তারা অনেক দূরে আছে।"

জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হলে আমরা তাঁবুতে ফিরে আসতাম। যখনি আমাদের কেউ তাঁবুতে ফিরে আসত তিনজন (যেহেতু তিনজনের বেশি একত্রিত হওয়া নিষেধ) তাকে ঘিরে ধরত কী জিজ্ঞাসা করা হয়েছে জানার জন্য। অন্যরা আশেপাশে কান খাড়া করে শুনত। সেও উচ্চস্বরে বলত যাতে সবাই শুনতে পায়।

আমি যখন জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাবুতে ফিরে আসি তখন তিউনিশিয়ান নাগরিক হামাজা সেখানে ছিলেন। তাকে বললাম, আমাকে তো আপনার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছে। বললাম, আপনি সবার শ্রদ্ধেয়। কিন্তু তাদেরকে বলেছি যে, "আপনি একজন সাধারণ মানুষ। নিয়মিত নামাজ পড়েন।"

হামজা বললেন, "আমি তাদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যে আমি ইতালির একজন সবজি ব্যবসায়ী। ধর্মকর্মের সাথে আমর তেমন সম্পর্ক নেই। পরের বার জিজ্ঞাসাবাদে ব্যাপারটা তাদেরকে স্পষ্ট করে দেব।"

আরেক জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয় এই প্রশ্ন দিয়ে, "তুমি কি বলতে পারবে আহমাদ শাহ মাসুদকে কে হত্যা করেছে?

উত্তরে বললাম, "আমি জানি না। তারা বারবার প্রশ্নটি করেছে আর আমিও বারবার একই উত্তর দিয়েছি।"

তারা বলল: "না (আপনি জানেন না এটা হতে পারে না), আপনি একজন সাংবাদিক, খবরের ভেতরের খবর খুঁজে বেড়ান। আপনার মতে, কে তাকে হত্যা করেছে?"

"যদি আমার ব্যক্তিগত মত দিতে বলা হয় তবে বলব, আহমদ শাহ মাসুদ এমন একজন নেতার হাতে নিহত হয়েছে যার এতে স্বার্থ ছিল। মার্কিনিরাই এটি করে থাকবে। কারণ এতে তাদের স্বার্থ আছে। এটা জানা কথা যে, তার সাথে ফ্রান্সের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। আর আমেরিকা এই সম্পর্ক ভালোভাবে নেয়নি।"

জিজ্ঞাসাবাদকারী অন্যান্য প্রতিটি তথ্যই তার নোট বইতে টুকে নিচ্ছিল।

"তার মৃত্যুতে তালেবানেরও স্বার্থ ছিল" আমি বললাম, যেহেতু সে তাদেরকে (আফগানিস্তানের) উত্তরাঞ্চলে নির্যাতন নিপীড়ন চালিয়েছে।"

"এ ছাড়া আর কাদের স্বার্থ থাকতে পারে?"

"আল কায়েদা, যেহেতু তারা তালেবানের সাথে জোট বেঁধেছে এবং তালেবানের স্বার্থকে নিজেদের স্বার্থ মনে করে।"

"এ ছাড়া আর কাদের স্বার্থ থাকতে পারে?"

"পাকিস্তান, কারণ জনাব মাসুদ তাদের দেশে পাকিস্তানি প্রভাবের বিরোধিতা করত। তাই পাকিস্তানের জন্য এটা স্বাভাবিক যে তারা তাদের প্রতি এবং তাদের পশতুন জোটের প্রতি বিরূপ একজনকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবে। আমি গৃহযুদ্ধের আশঙ্কার কথাও উড়িয়ে দেব না। বিভিন্ন দল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকত। প্রায়ই তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যেত। প্রতিশোধপরায়ণতাকেও গুরুত্বহীন মনে করছি না। জাতিগত দাঙ্গাপ্রবণ এলাকায় এই প্রতিশোধমূলক অপরাধ প্রচুর সংঘটিত হয়। আবার রাশিয়ার ব্যাপারটাও ভুলে যেতে পারি না কারণ সোভিয়েত আমলে দুই দলের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে।"

আমি আরো বলি, "প্রতিটি সম্ভাবনাই যুক্তিসম্মত। কিন্তু হত্যার কাজটি কারা করেছে? কেন করেছে? এই প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নাই।"

জিজ্ঞাসাবাদকারী লিখে নিলেন। এরপর আবারো প্রশ্ন করা শুরু করলেন, "আরো কোন সম্ভাবনা?"

"যতদূর বিশ্লেষণ করেছি এগুলোই আমার কাছে যথেষ্ঠ মনে হয়েছে", বললাম। তারা অবশেষে একটি অনর্থক সাক্ষাৎকারপর্ব ইতি টেনে আমাকে আমার তাঁবুতে ফিরে যেতে দিলেন। যেটাকে আমরা 'আহমদ শাহ মাসুদ হত্যা জিজ্ঞাসাবাদ' নাম দিয়েছিলাম।

জিজ্ঞাসাবাদকারীরা সাধারণত সাধারণ মানুষের ব্যাপারে জিজ্ঞসাবাদ করত আর তাদের সাথে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করতে বলত। প্রতিবারই তাদেরকে বলতাম, "আমি সবটুকু জানা তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করতে চেষ্টা করব।" বারবার বলতাম, "আমি আমার পরিবারে ফেরত যেতে চাই।"

প্রতিবারই তারা বলত, "এইতো আর কিছু দিন (পরেই তুমি মুক্তি পেতে যাচ্ছ)!" কিন্তু সাক্ষাতকার শেষে জানাত, আমার সহযোগিতা এখনো অপর্যাপ্ত। শেষে তারা এমন কিছু ব্যক্তি ও স্থান সম্পর্কে জানতে চাইত যে সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান নেই।

ছয় মাসেরও বেশি সময় কাটে কান্দাহারে। অধিকাংশ কয়েদীই এখান থেকে গুয়ান্তানামো কারাগারে স্থনান্তারিত হয়। এখান থেকে কয়েদীদের নিয়ে সেই কুখ্যাত কারাগারের উদ্দেশ্যে প্রথম বিমানযাত্রা করে ২০০২ সালের ১১ জানুয়ারি। ২০০১ সালে ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার ঠিক চার মাস পর একই তারিখে তারা সে যাত্রা করেছিল। একই তারিখে হবার ব্যাপারটি কি কাকতালীয় ছিল? নাকি তারা নিজেরা ইচ্ছে করে এদিনটি ঠিক করেছিল, এদিনে হামলার সন্দেহভাজনদের গুয়ান্তানামোতে নিয়ে যেতে?

প্রতিটি যাত্রা বা পরিবহণ দলে প্রায় বিশজন কয়েদী ছিল। আর প্রতি তিন-চার দিন পরপরই একটি দল যাত্রা করত। কিছু দিনের মধ্যেই আমরা জানতে পারলাম গুয়ান্তানামোতে কয়েদীদের গিজগিজ অবস্থা। ফলে তারা নতুন বন্দিশালা ডেল্টা নির্মাণে হাত দেয়। যখনই তারা একটি নতুন বন্দিশালা চালু করত তখনই তারা কান্দাহার থেকে আমাদের এক দল কয়েদীদের নিয়ে সেখানে রাখত। আশি শতাংশ কয়েদীই কান্দাহার থেকে নেয়া। যা তারা পাঁচ মাসের মধ্যে নেয়।

নতুন কয়েদীরা আসছেই। আমরা তাদের গল্প শুনি। আমি একদল আফগানির সাথে কথা বলি যাদের তালেবানে যোগ দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় এবং সামরিক হামলার প্রস্তুতি নেওয়ার অভিযোগও আনা হয়। বাস্তবতা হলো তদন্তে যেটা বেরিয়ে এসেছে-তারা একটি মসজিদে জড়ো হয়েছিল সামাজিক একটি সমস্যার সমাধানে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর তারা দেখে মসজিদের চারপাশ মার্কিন বাহিনী ঘিরে ফেলেছে। এরপর তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। কঠোর জিজ্ঞাসাবাদ, নির্যাতন আর শাস্তির পর তাদের মুক্তি দেয়া হয়। আফগানিস্তান থেকে দলে দলে লোক আনা হচ্ছিল। তাদের মুক্তি দেয়া হচ্ছিল দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ, নির্যাতন আর শাস্তির পর। কিন্তু আরব বা অ-আফগানিরা কিছুটা ভাগ্যবান। তাদের তেমন একটা ভুলবশত বা সন্দেহের বসে আনা হতো না।

একবার তারা আফগান উজবেক যুদ্ধবাজ জেনারেল আব্দুর রশিদ দোস্তাম ও তার দলকে সামরিক পোশাক পরিহিত অবস্থায় নিয়ে আসে। আমাদেরকে তার সাথে কথা বলতে নিষেধ করা হয়। পরে দেখা গেল তারা সে ব্যক্তি নয় তারা হলো আরেক যুদ্ধবাজ নেতা জেনারেল ফাহিম ও তার দল, যারা উত্তরের একটি সিমেন্ট ফ্যাক্টরির দখল নিতে লড়াই করছিল। মার্কিন বাহিনী সেখানে হামলা করে তাদের কয়েদ করে।

মে মাসের শেষের দিকে কান্দাহারে দশ থেকে বিশ ভাগ কয়েদী অবশিষ্ট রইল। জুনের ১৩ তারিখে সম্ভবত একটি আদেশ আসে যে, সকল কয়েদীকে গুয়ান্তানামোতে স্থানান্তর করা হবে এবং কান্দাহার চিরতরে বন্ধ ঘোষণা করা হবে। আর আমার নতুন পথের যাত্রা শুরু হবে।

ঠিক জোহরের নামাজের সময় তারা নাম ধরে ডাকত। আরেকটি ভিন্ন সেলে আটক রাখত আসর পর্যন্ত। এরপর তারা বিমানে তুলত। নিয়ে যেত গুয়ান্তানামোতে।

আমার ডাক পড়ল ঠিক মধ্য-অপরাহ্নে। চারদিকে প্রচণ্ড তাপদাহ। তাপ এতই তীব্র যে মনে হচ্ছিল সূর্য বোধহয় আমাকেই শুধু আলো দিচ্ছে। আমি আরো কিছু কয়েদীর সাথে ছিলাম। আমাদের দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছে। মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে। এরপর তারা আমাদের মাথা-মুখ কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়। তখন আমরা সে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে অবশিষ্ট কয়েদীদের নিয়ে আসা অবধি অপেক্ষা করতে থাকলাম। আমাদের

হাত পাগুলো তখনো বাঁধা ছিল এবং সারির একজন আরেকজনের সাথে শক্ত করে বাঁধা।

সূর্য ডোবার পর তারা আমাদের আরেক নতুন কয়েদখানায় নিয়ে যেত। শুরু হতো অপমান অপদস্থের এক নতুন অধ্যায়। কাপড়-চোপড় খুলে ফেলা হতো। একেবারে জন্মদিনের মতো উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম। আমাদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গ নিয়ে হাসি তামাশা আর চরম লাঞ্ছনাকর অবস্থার সৃষ্টি করত। তারা তামাশা করত প্রতিটি অঙ্গ নিয়ে!

কয়েদীদের সবাইকে কমলা রঙের জাম্পসুট পোশাক পরানো হতো। নতুন ও পুরাতন সব কয়েদীর ছবি তোলা হতো। আমি এখন ৩৪৫ নম্বার কয়েদী; ৪৪৮ নাম্বার আর নই। তারা আমাদের ডিএনএ টেস্টের জন্য রক্ত নেয়, চুল ও লালা নেয়। আমাদের চোখ স্ক্যান করে, ফিংগার প্রিন্ট নেয়। এরপর বিমানে তোলে। একটি ছোট শেকল দিয়ে বাঁধে। মাথা নিচু করে রাখে। হাত-পা এত শক্ত করে বাঁধে যেন রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে। কালো কাপড় দিয়ে মাথা ঢাকে। মুখে বাঁধে মুখোশ।

আমাদেরকে একটি লাইনে দাঁড় করানো হয়। যেন শিকারী কুকুর ঘেউঘেউ করছে এমনভাবে সৈন্যরা গালিগালাজ, চিৎকার চেঁচামেচি করত। বিমানের ভিতর তারা আমাদের কাঠের লম্বা বেঞ্চে বসায়। মেঝেতে ঝুলে থাকা পাগুলো ভারী শেকলে বাধা। বিমান অবতরণের আগপর্যন্ত এভাবেই ছিলাম।

গুয়ান্তানামোতে প্রথম দিন

রাত আনুমানিক ৯টার দিকে আমাদের বিমান থেকে নামানো হয়। বিমান থেকে নেমেই প্রথম ধাপেই টানা চার পাঁচ ঘণ্টা চলে নির্যাতন। সেই ফ্লাইটেই প্রথম কিছু খাওয়া, টয়লেট করা নিষিদ্ধ ছিল। প্রহরী সৈন্যরা আমাদের ঘুমাতেও দিত না। গালিগালাজ করত। একজন আরেকজনের উপর ঘুমে টলে পড়লে লাঠি দিয়ে পেটাত।

পানি চাইলে সৈন্য এসে মুখের মুখোশ খুলে এক ঢোক পানি ঢেলে দিয়ে চলে যেত। তখন আমার শিশুদের দোলনায় বসে খাওয়ানোর কথা মনে পড়েছিল। প্রয়োজন হলে মাথা ঢাকা অবস্থায়ই মাথা নেড়ে ইশারা করতে হতো। টয়লেট ব্যবহার নিষেধ জেনে আমার পাশের জন পানি পান থেকে বিরত ছিল। আসলে আমারও টয়লেট প্রয়োজন ছিল না। প্রয়োজন ছিল একটু পা নাড়ানো। পা নাড়াতে না পেরে হাঁটুতে ব্যথা জমে গেছে। শেকলের ব্যথাতো আছেই!

আমরা একটি এয়ারপোর্টে অবতরণ করি। এরপর আমাদের আরেকটি বিমানে ওঠানো হয়। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। আগের মতোই বিমানে ওঠানো হয়। কাঠের আসনে বসতে দেয়। মেঝেতে ঝুলে থাকা পাগুলো ভারি শেকলে বাধা। দ্বিতীয় সে ভ্রমণ হয়েছিল বার-তেরো ঘণ্টার।

ক্লান্তিকর সফর। সারা শরীর বরফ হীম অবস্থা, না ঘুমানোয় বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত। তারা এক ইঞ্চি নড়তেও দেয়নি। জীবন বড় অদ্ভুত। সুন্দর পরিপাটি সালাত শেষে কতকিছু চাই আল্লাহর কাছে! অথচ এখন! কোন চাওয়া নেই। চাওয়া শুধু যেন পাটা একটু নাড়াতে পারি। হাতটা যেন একটু সরাতে পারি! চোখের পাতা যেন একটু নড়াতে পারি!

বিমান অবশেষে গন্তব্যে এসে অবতরণ করে। যথারীতি একটা হুলুস্থুল, দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়। সৈন্যরা চেঁচাচ্ছে, "তোমরা এখন মার্কিন নৌবাহিনীর হাতে আটক। কোনো কথা বলবে না। নড়াচড়া করবে না।"

আমি খুব দুর্বল, বিধ্বস্ত। কিন্তু এ অবস্থা মুখ খুলে বলতেও পারছিলাম না। তারা আমাদের নিচে নামায়। হাঁটতে বলে। কিন্তু পাগুলো সরতে চাইছে না। একজন এদিক সেদিক হলে বাকিরাও হবে তাই সৈন্যরা কাউকে লাইনচ্যুত হতে দিচ্ছে না। আমাদের পাগুলোর কোনো বোধ নেই। নড়াচড়ার শক্তি নেই।

তারা আমাদের সবাইকে পেটাতে থাকে। আমরা যে নড়তে পারছি না সেদিকে তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। লাথি মারছিল। ধাক্কা দিচ্ছিল। টেনে-হিচঁড়ে বাসের সামনে নিয়ে আসে। বাসে কোনো সিট নেই। তারা আমাদেরকে বাসের মেঝেতে সারিবদ্ধভাবে বসায়। আমি খুব কষ্ট পাচ্ছিলাম। পা-টা একটু সোজা করার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু তখনই এক সৈন্য আমাকে মারতে শুরু করে। এত বর্বর সে পিটুনি, যা সামরিক ক্যাম্পগুলোতেও আমাকে খেতে হয়নি। সেখানে মানবতার স্পষ্ট লজ্ঘন হতে দেখেছিলাম।

গুয়ান্তানামো... একটি অবিচার ও জঘন্য কর্মকান্ডে পরিপূর্ণ কারাগার। এখানে বিশ্বাসীদের প্রতিটি বিশ্বাসের গোড়ায় আঘাত করা হয়। গুয়ান্তানামোর কুৎসিত দিক হলো এখানে মানবতাকে পায়ের তলায় পিষ্ট করা হয়, যা ছিল জঙ্গলের চেয়েও গহীন। মধ্য যুগের বর্বরতার চেয়ে নির্মম। গুয়ান্তানামো... জালিমের প্রাণবায়ু। কিন্তু ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন।

যে দ্বীপে বিমান নেমেছিল সেটি আসলে কারগার নয়। মূল কারাগার আরেকটি দ্বীপে যেখানে যেতে হয় ফেরি পার হয়ে। ১০ মিনিটে ফেরি ওপারে গিয়ে হাজির হলো। নতুন বাসে ওঠানো হলো আমাদের। এক ঘণ্টার মতো বাসে ঠায় বসে ছিলাম। এসময় আমরা বিমান, হেলিকাপ্টার ও গাড়ির আওয়াজ পাই। এরপর বাস কোথাও গিয়ে থামল। আমাদের পায়ের শেকল আলগা করে দেওয়া হলো। আমাদের পা নাড়ানোর সুযোগ দেয়া হলো। দীর্ঘ এক কষ্টকর ও বিধ্বংসী পথ পরিভ্রমণ সেই কান্দাহার থেকে এখানে শেষ। আমাদের হাতে তখনো হ্যান্ডকাফ পরানো। কিন্তু বিমানের ভেতরের চেয়ে অনেক শিথিল পরিস্থিতি।

প্রায় দুপুরের দিকে বুকে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করছি। সৈন্যদের সাহায্য চাইলাম। তাদেরকে ব্যথার কথা বললাম। জবাবে তারা আমাকে পিটুনি দিল। বলল, "তুই অনেক শক্ত আছিস। তোর কোন ব্যথা হচ্ছে না। মিথ্যা বলছিস।"

যখন আমি বারবার ব্যথা ব্যথা বলে চিৎকার করছিলাম। এক সৈন্য এসে আমার বুকে ব্যথার স্থানে হাত দেয়। আমার দুর্বল হৃদস্পন্দন বুঝতে পারে। সে এবং আরেকজন সৈন্য মিলে আমাকে সোজা ভবনের ভেতরে নিয়ে যায়। জিজ্ঞেস করে, "কিসের ব্যথা?"

যতটা সম্ভব ব্যাখ্যা দিলাম। হার্টে ব্যথা অনুভব করছি। হৃদস্পন্দন দুর্বল হয়ে পড়েছে। দুজন সৈন্য আমার সব পোশাক কেটে ফেলে। তারা আমাকে এমন একটি কক্ষে নিয়ে যায় যেখানে রয়েছে দরজা ছাড়া গোসলখানা। এরপর আমাকে বলে এক্ষুনি গোসল করতে এবং একজন প্রহরীর সামনেই। তারা পানি ছেড়ে দেয়। আমার দিকে মুখ করে দেয় পানির। কিছু সময় পর আমি তাদের বলি, "আমি গোসল শেষ করেছি। টয়লেটে যেতে চাই।"

"এখানে কোনো টয়লেট নেই", তারা বলল।

এরপর তারা আমাকে আরেক সৈন্যের কাছে নিয়ে গেল। যে আমাকে তাচ্ছিল্য করছিল আর ইনসুলিন পরীক্ষা করছিল। এই পরীক্ষা এর আগে করেনি কেউ। আবার কিছু অরেঞ্জ কালার জামা পরতে দেয়। হাতে পায়ে আবার শেকল পরায়।

এরপর আমাকে একটি অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে জিজ্ঞাসাবাদকারী আমাকে আমার নাম, বয়স, দেশ, জন্মতারিখ জিজ্ঞেস করে। তারা আমার ছবি নেয়, একটা কার্ড করে দেয়। এরপর তারা একটা অবাক করা কাজ করে। তারা একটা কাগজ দিয়ে বলে, "এখানে যা যা ঘটেছে তা জানিয়ে তোমার পরিবারের কাছে একটি চিঠি লেখ।" আমি পাঁচ লাইন লিখি। যা মোটামুটি এরকম।

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

প্রিয় সহধর্মিনী উম্মে মুহাম্মদ, তোমাকে লিখছি।

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ্।

আমি এখন কিউবার গুয়ান্তানামো কারাগারে বন্দি আছি। আমাকে এখানে আনা হয়েছে। আমি আশা করছি তারা আমার বৃত্তান্ত যাচাই করে দেখবে এবং বুঝতে পারবে যে তারা আমাকে ভুল করে এখানে নিয়ে এসেছে। শীঘ্রই তারা আমাকে বাড়িতে অথবা কাতারে ফিরিয়ে দিবে।

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ্।"

মনে পড়ে, আমি পুত্র মোহাম্মাদের প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়েছিলাম। বুঝিয়েছিলাম আমার কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তারা। এরপর তারা আমাকে একটি ক্লিনিকে নিয়ে যায়। তখনো আমার হাতে-পায়ে শেকল পরানো। ডাক্তার আমাকে জিজ্ঞেস করল কোনো অসুখের কথা আমি সৈন্যদের বলেছিলাম। আমি আমার অসুখের কথা খুলে বললাম। আমার দুর্বল হৃদস্পন্দন, বুকের ব্যথার কথা বললাম।

তিনি আমার তাতক্ষনাৎ কিছু পরীক্ষা করায়। আমার কোনো বিশেষ রোগ আছে কিনা জানতে চায়। গ্ল্যান্ডের অসুখের কথা বললাম, যার জন্য আমাকে সারা বছর ডাক্তার দেখিয়ে ঔষধ খেতে হয়। তাকে আরো বললাম আমার ঘাড়ের ব্যথার কথা, বাতজ্বরের কথা। তিনি এসব ব্যাপারে তেমন আগ্রহ দেখালো না। বলল, "আমরা তোমার এ জাতীয় অসুখের কথা বলছি না। আমরা জানতে চাচ্ছি তোমার কোনো প্রাণঘাতী অসুখ আছে কিনা।"

"আপনি কী বোঝাতে চাইছেন?" জিজ্ঞেস করলাম।

"তোমার কি এইডস আছে?" সে জিজ্ঞেস করল।

"আল্লাহ মাফ করো। এরকম কোন অসুখ আমার নাই", বললাম।

"তোমার কি ম্যালেরিয়া আছে?"

"সেটা আমার জীবনে খুব কমই হয়েছে", বললাম।

"সেজন্য আমরা তোমাকে কিছু বড়ি দেব"

তিনি এক সৈন্যকে বললেন, আমাকে নিয়ে যেত। তারা আমাকে সরাসরি জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষে নিয়ে যায়। শুরু হয় আমার গুয়ান্তানামো কারাগারের জীবন।

আমরা এখানে এমন এক জগতে আছি যা পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন, পৃথিবীর জঘন্যতম স্থান। কারণ এখানে যা করা হয় তা যদি তুলে ধরা হয় তাতে এর পরিচিতি আরো তলানীতে যাবে। গত শতকের শেষ দিকে মনে

করা হতো যে, আগামী শতকে সভ্য পৃথিবী একটি আদর্শ পৃথিবী হতে যাচ্ছে যেখানে মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা থাকবে। কিন্তু এ বিশ্বাসের প্রতি চলছে ভয়ানক দমনপীড়ন, তথাকথিত "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" অভিযানের নামে।

এর ফলে চিরাচরিত মানবাধিকার সংরক্ষণবোধ ব্যাহত হয়েছে। মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে। এটা শুধু স্বৈরাচারী সরকারগুলোর হাতে নয় বরং এমন সরকার ও জাতি কর্তৃক ঘটছে যারা অনবরত মানবাধিকার সংরক্ষণ, স্বাধীনতা ও উদারনীতির কথা বলে। "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" নতুন ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের পথ খুলেছে। সকল ধরনের আন্তর্জাতিক চুক্তিনামা, কনভেনশনস লঙ্ঘন করে চলেছে। নির্যাতন, গোপন কারাগারে কয়েদী করে রাখা, সন্দেহভাজনদের নির্যাতনকারী দেশের হাতে তুলে দেয়া। এ সবকিছুই করে সামান্য সন্দেহের বশে।

"সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ"র নামে যারা কয়েদী হয় তারা আইনি সহায়তা পাবার অধিকার থেকে বঞ্চিত, কারাগারে নির্যাতিত না হবার অধিকার থেকে বঞ্চিত, আইনজীবী নিয়োগের অধিকার থেকে বঞ্চিত। কেউ কল্পনাও করতে পারবে না যে আমেরিকা (যারা কিনা গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ, মুক্তচিন্তার ধারক ও বাহক বলে দাবি করে) এ ধরনের কাজ করে থাকে। গোপন কারাগার পরিচালনা করে। বেআইনিভাবে সীমান্ত পারাপার করে। অপহরণ করে। জিজ্ঞাসাবাদের নামে জঘন্য শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে। প্রেসিডেন্ট বুশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধঃপতন ডেকে এনেছেন। যুদ্ধের পথে নিয়ে গেছেন। বিজয়ের চিহ্ন দেখিয়ে তিনি বলেছেন, "পরিচিত সন্ত্রাসীদের থেকে অথবা সন্ত্রাসবাদে সন্দেহভাজনদের থেকে তথ্য লাভ করা মৌলিকভাবে প্রয়োজন।"

ঐ বক্তব্যের চার দিন আগে তার সহকারী ডিক চেনি এনবিসিতে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে সাংবাদিকদের বলেন যে, "আমেরিকার নতুন শত্রুদের সম্পর্কে জানতে হলে কিছুটা অন্ধকার পথে কাজ করতে হবে। আমরা একাজে গোয়েন্দাবৃত্তির ছায়ায় দীর্ঘ সময় ধরে খরচ করে আসছি। আরো অনেক কিছু করতে হবে। যা করতে হবে সন্তর্পণে। কোনো আলোচনা ছাড়াই, আমাদের গোয়েন্দাবাহিনীর প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে। যদি আমরা সফল হতে চাই (তবে তা করতেই হবে)।"

সুদানি ভাইয়েরা

গুয়ান্তানামোতে কিছু সুদানি কয়েদীর সাক্ষাৎ আমাকে দু'দণ্ড শান্তি দিয়েছিল। যদিও আমার মতো দুর্ভাগ্যতাড়িত হওয়ায় বেদনাহত ছিলাম। মোট বারজন সুদানির সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে সেখানে। প্রত্যেকের কাছে গিয়েই আমার ছটফট প্রাণ পাখিটার একটু আশ্রয় মিলেছিল। কিছুনা কিছু শিখেছিলাম।

একপর্যায়ে আমি চার্লি ব্লকে স্থানান্তরিত হলাম। কিছুটা আনন্দিত হলাম যখন জানলাম সেখানে দু'জন সুদানি ভাই আছেন। সুদানি দুজন হলেন হাম্মাদ আমানোহ ও মুহাম্মদ রশিদ। তারা উভয়েই পাকিস্তানের পেশোয়ারে কুয়েতের একটি এনজিওর হয়ে কাজ করতেন। হাম্মাদ একজন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা আর মুহাম্মদ একজন প্রশাসক। স্থানীয় প্রশাসন তাদের অফিসে তল্লাশী চালায়, তাদের গ্রেপ্তার করে। এরপর তাদের আমেরিকার হাতে তুলে দেয়। একই ধরনের তল্লাশী অভিযানে সুদানি আরো তিন ভাইকে এনজিওর অফিস থেকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং পরে আমেরিকার হাতে তুলে দেয়া হয়। আদিল হাসান আবু দিয়ানা, মুহাম্মদ আল গাজালী, সালেম আবু আহমেদ তারা সবাই সুদানি। সবার ভাগ্য এখন গুয়ান্তানামো।

হাম্মাদ ও মুহাম্মদদের কাছে স্থানান্তরিত হয়ে আমার প্রচণ্ড মানসিক চাপ কিছুটা কমে। তাদের পেয়ে বন্যার স্রোতের মতো কথার জোয়ার নামে আমার। বলতে শুরু করি। শুধু বলেই চলি। এতটাই কথা বলাতাম যে,

তারা একজন আরেকজনের কাছে বলাবলি করত আমি এত কথা কিভাবে বলি!

আমরা একে অপরের কাছে জানতে চাইতাম সুদানের খবরাখবর। আর হাম্মাদ যেহেতু আমার পরে গ্রেপ্তার হয়েছে তাই সে দেশের সর্বশেষ কী অবস্থা তা ভালো জানত।

একজন ভাইয়ের দুর্ভাগ্যের কথা আজও আমার মনে হলে হৃদয়টা হু হু করে কেঁদে ওঠে। যিনি আমাদের কাছে ইবরাহীম আল সুদানি নামে পরিচিত। আমার মনে হয় তার ঘটনা সবার হৃদয়ে দাগ কাটবে। সে পাগল হয়ে যায়। আমরা আশা করতাম সে শীঘ্রই সুস্থ হয়ে আমাদের মাঝে ফিরে আসবে।

ইবরাহীমের মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে গুয়ান্তানামোর শারীরিক ও মানসিক শাস্তির কারণে। আমরা তো এসব লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করেই প্রতিনিয়ত টিকে আছি। কত দিন ভেবে আকুল হয়েছি এই অন্ধকার ভেদ করে আলোর রেখা ফুটবে! কতবার প্রায় পাগলের মতো আশায় বুক বেঁধেছি গুয়ান্তানামোর এই দিনরাত লাঞ্ছনার জীবন থেকে মুক্তি পাব! কতবার ভেবেছি? কতবার যে ভেবেছি তার ইয়াত্তা নেই।

সেল নম্বর ৪০

গুয়ান্তানামোতে আমার প্রথম ঠিকানা সেল নাম্বার ৪০। আমাকে রাখা হয়েছিল দু'জন আফগানির সাথে। যাদের অপরাধ ছিল আফগান জাতির বিরুদ্ধে মার্কিন বাহিনীর ধ্বংসলীলাকে সমর্থন করতে না পারা। তাদের গ্রেপ্তার করা হয় মার্কিন চর আব্দুর রশিদ দোস্তামের মাধ্যমে। উপরে মার্কিন বিমান টহল, নিচে দালাল জেনারেল দোস্তম বাহিনীর অভিযান একই সময়ে চলে। গ্রেপ্তার করে তাদের প্রথমে রাখা হয় শেবারগান কারাগারে। দোস্তম বাহিনী এই কারাগার দেখভাল করত।

তারা আমাকে সে কারাগারের ভয়ংকর অবস্থার কথা বলে। কারাগার ভবনটি তীব্র শীতের আবহাওয়া মোকাবেলার জন্য যথেষ্ট ছিল না। যখন তুষারপাত হতো বরফ তাদের গায়ে পড়ত। ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত কয়েদীদের পর্যাপ্ত খাবার ও পানি ছিল না। প্রতিটি কয়েদীকে আফগানি রুটির চারভাগের একভাগ দেয়া হতো। সাথে ছোট দুই কাপ পানি।

তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত কয়েদীও ছিল। কারো কারো অঙ্গহানি অথবা খোলা জখম রয়েছে। কিন্তু কোন চিকিৎসা সেখানে করানো হয়নি। তারা যন্ত্রণায় কাতরাত। চিকিৎসাহীন অবস্থায় পরে থাকত। অনেকে মারাও গেছে বিনাচিকিৎসায়। সেসব হাজার হাজার লোককে গণকবর দেয়া হয়েছে। আফগানিস্তানের বিভিন্ন শহরে এরকম লোকগুলো

মার্কিন বোমা হামলায় নিহত হয়েছে। অথবা তাদের দালাল দোস্তম বাহিনীর মর্টার শেল নিক্ষেপে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। আবার শিবারঘান কারাগারে নির্যাতনেও অনেকে মারা গেছে।

জাতিসংঘের এক ফরেনসিক কর্মকর্তা উইলিয়াম হ্যাগলাণ্ড এটা নিশ্চিত করেছেন। জনাব হ্যাগলাণ্ড অনেকগুলো গণকবরের সন্ধান পান আফগানিস্তানে। তিনি মাটি খুড়ে তিনটি লাশ কবর থেকে তুলে ময়নাতদন্ত করেন। তদন্ত শেষে মন্তব্য করেন, তাদেরকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে। তিনি বলেন, "সেসব গণকবরের অবস্থা এতটাই নাজুক যে সেখানকার লাশগুলো গণনা করা অসম্ভব। তবে তার সংখ্যা হাজারেরও বেশি হবে।"

তিনি বলেন যে, দোস্তম বাহিনী কয়েদীদের হস্তান্তরের চেয়ে বরং বিক্রি করে দিত। মার্কিন বাহিনীর হাতে তুলে দিলে কয়েদী প্রতি পাঁচশত ডলার পেত তারা। মার্কিন বাহিনীকে বোঝাতো যে, সেসব কয়েদী তালেবান বা আল কায়েদার যোদ্ধা। কিনে নিয়ে তাদের কান্দাহার কারাগারে পাঠিয়ে দিত মার্কিনিরা। হাঁটু গেড়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো। মাথায় রাইফেল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত সৈন্যরা। কিল-ঘুষি, লাথি চলত ক্ষণে ক্ষণে।

জিজ্ঞাসাবাদের পর কয়েদীদের বাগরাম কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়। এরপর নির্যাতন নিয়মিত রাখতে গুয়ান্তানামোতে। গুয়ান্তানামোর ক্যাম্প এক্সরেতে (পরবর্তীতে ডেল্টা এক্স নাম রাখা হয়) এমন নির্যাতন, অপমান অপদস্থ করা হয়, যা আন্তর্জাতিক সকল আইন ও রীতিনীতি বিরোধী।

সেল নাম্বার ৪০ এ আমি আফগানি কয়েদীর সাথে প্রায় চার মাস থাকি। জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত। জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালীন সময় ছাড়া আমরা বিচ্ছিন্ন হইনি। সে সময়ে এক বিকেলে এক দল চিকিৎসক আসে। তাদের একজন বলে, "আমরা এসেছি তোমাদের টিকা দিতে, ইনফেকশন বিরোধী ঔষধ দিতে, বিভিন্ন রোগের ভ্যাকসিন দিতে।"

তাদের একজন একটি ইনজেকশন নিয়ে এল আমার দিকে। আমি জিজ্ঞেস করলাম "এটা কীসের জন্য?"

"টিটেনাস"।

"দোহা ছেড়ে আসার আগেই আমি এ টিকা নিয়েছিলাম। ডাক্তার আমাকে বলেছিল এটা আগামী পাচ থেকে দশ বছরের জন্য যথেষ্ট। তাই আমার আর এ টিকা নেবার প্রয়োজন নেই।"

"তোমাকে অবশ্যই এ টিকা নিতে হবে।"

তাদের টিকা গ্রহণের ব্যাপারে আমি ভয় পাচ্ছি। আশঙ্কা করছি যে তারা আমাদের শরীরে রোগ ঢুকিয়ে দিচ্ছে, ভ্যাকসিন নয়। তাদের আমি বিশ্বাস করতাম না। মুখে তারা যতই বলুক-তারা আমাদের সুরক্ষা চায়। তারা ইতোমধ্যে আমাদের কঠিন কিছু ঔষধ যেমন, ম্যালেরিয়া ও টিউবারকলিস রোগের বড়ি খাইয়ে দিয়েছে।

আমার আশঙ্কা আরো বেড়ে যায় তাদের চাপাচাপি দেখে। তারা বলে, "যদি তুমি স্বেচ্ছায় এই ইনজেকশন ও ঔষধ নিতে না চাও তবে আমরা জোর করে এসব তোমার শরীরে পুশ করব।

"তোমরা জোর করে এটা আমার শরীরে দিতে পার। কিন্তু স্বেচ্ছায় এটা নিতে আমার হাত তোমার দিকে বাড়িয়ে দিব না। আমি আবারো বলছি এই ভ্যাকসিন আমার নেয়া আছে।"

"তারা নিজেরা আলাপ করল এবং প্রশাসনের সাথে কথা বলল। এরপর তারা তিন দিনের জন্য আমার সবকিছু বন্ধ করে দিল। আমাকে একটি একক প্রকোষ্ঠে বন্দি করে রাখল। ছোট একটি প্লাস্টিকের মাদুর ছিল সেটিও দিল না, যেটা দিয়ে টয়লেট করার সময় আড়াল করে নিতাম।

আমি এক কর্মকর্তার সাথে কথা বলার অনুমতি চাইলাম। সে কিছুক্ষণ পরে এল। বললাম: "তোমরা আমাকে সালাত আদায় করতে দিচ্ছ না। এখানেও কি নামাজ নিষিদ্ধ?"

"না, এটা নিষিদ্ধ নয়", সে বলল।

"আপনি কী বোঝালেন এই 'নয়' বলে? আপনারা আমার মাদুরটি কেড়ে নিয়েছেন। আমি টয়লেটে যেতে পারি না। ধাতব মেঝেতে সালাত আদায় করতে পারি না। আমার মাদুরটি আমার দরকার। অন্ততপক্ষে মাদুরটি আমাকে দিন।"

সে বলল তাকে আরো ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কিন্তু সে ফিরে এসে জানাল তারা আমার কোনো জিনিসই

ফেরত দেবে না যদি না আমি ভ্যাকসিন নিই। আমি আবারো প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করি। সেটাই ছিল আমার প্রথম কথা না শোনার শাস্তি।

আফগান যুদ্ধে অনেক অনভিজ্ঞ মার্কিন সেনা (অনেক সদস্য এমন ছিল যাদের ষোল সপ্তাহের সামরিক প্রশিক্ষণ আছে শুধু, কোন অভিজ্ঞতা নেই) নিয়োজিত হয় যারা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দোভাষীর উপর নির্ভর করত, প্রাইভেট কোম্পানি নিয়োগ করত। যাদের ভুল কথায় হাজারো নিরীহ আফগানির মৃত্যু ঘটেছে। এই সব হতভাগা লোকগুলোকে উত্তরাঞ্চলীয় মার্কিন জোট (জেনারেল দোস্তমের নেতৃত্বে) স্থানীয় দালালরা আটক করে মার্কিন বাহিনীর কাছে বিক্রি করে দেয়। যাদেরকে পর্যায়ক্রমে নির্যাতন করতে করতে এই গুয়ান্তানামো নরকে নিয়ে আসা হয়েছে।

সেল নাম্বার ৪০ এ প্রথম চার মাস যে খাবার দেয়া হয়েছিল তা নব্বই'র দশকের খাবার বলে মনে হবে। পঁচা কেক, যার লেয়ারে ব্যাকটেরিয়া লেগে থাকত। আমরা নিশ্চিত ছিলাম না এর উপাদানগুলো কী কী। তাই একটু মাছ বা সবজি পেলে আমরা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করতাম। প্রতিটি আইটেম থাকত ঠাণ্ডা। যার কোনো স্বাদ বা অনুভূতি ছিল না।

সপ্তাহে আমরা দুবার সূর্যে হাঁটার সুযোগ পেতাম। একবার পেতাম গোসল করার সুযোগ। প্রতিটি মুহূর্ত তাদের নজরদারিতে থাকতে হতো। সময় বেশি চাইলে শাস্তি পেতে হতো। তাই সময়সীমা আমরা অতিক্রম করতাম না। এমনকি এক সেকেণ্ডও না।

যত দ্রুত সম্ভব আমরা গোসল করে নিতাম। যেমন আমরা দশ মিনিটের মধ্যেই বাইরে থেকে ভিতরে চলে আসতাম। আমাদেরকে একজন সৈন্যের সামনে গোসল করতে হতো। পুরুষ বা নারী যে কোনো সৈন্য হতে পারে, ঐদিনের ভাগ্য অনুযায়ী। যদি তুমি নারী সৈন্যের সামনে উলঙ্গ হতে লজ্জা পাও তবে ট্রাউজার ভিজে যাবে আর ভেজা ট্রাউজার পরেই থাকতে হবে। দাঁড়ি সেভ করা আরেক ফ্যাসাদ। সপ্তাহে একবার করা যাবে। ভোঁতা ব্লেড দিয়ে এবং কোন ক্রিম বা সাবান থাকবে না।

প্রতিটি ক্যাম্পে একটি বিশেষ ব্লক থাকত বিশেষ ধরনের শাস্তি দেওয়ার জন্য। কিন্তু আমাদের সেকশনে দু'টি ব্লক ছিল। নভেম্বর ও অস্কার নামের। স্টিলের কনটেইনার সদৃশ প্রকোষ্ঠগুলো পুরোপুরি বন্ধ থাকত। তাই তুমি পাশের জন কে আছে তা দেখতে পাবে না। অত্যন্ত ঠাণ্ডা, প্রখর লাইট

জ্বালানো, কালো চার দেয়াল ঘেরা সে প্রকোষ্ঠ। নীরব, নিস্তব্ধ প্রকোষ্ঠ...ওহ আল্লাহ!

এই প্রকোষ্ঠগুলো হতাশা, উৎকণ্ঠা এবং আতঙ্কের। সবকিছু তোমার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হবে। তোমাকে হিমশীতল একটি কক্ষে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে রাখা হবে। খাবার কমিয়ে দেবে। এমনিতেই তো খাবার কম দেয় শাস্তি হিসেবে এরপর আরো খাবার কমিয়ে দেবে। তোমাকে মাত্র পাঁচ মিনিট সময় দেবে খাবার শেষ করতে। যদি তুমি শেষ করতে না পারো তবে তারা খাবার ছিনিয়ে নেবে। প্রতি রাতেই ঝটিকা পর্যবেক্ষণ-তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদ চলে। ঘুম থেকে জাগানোর পর কোন কারণ ছাড়াই পেটাতে থাকে।

সে সময়টাতে আল জাজিরা বা পরিবারের পক্ষ হতে কোন চিঠি পাইনি। ক্ষণে ক্ষণে চলতো শুধু জিজ্ঞাসাবাদ। অধিকাংশ প্রশ্নই হতো আল জাজিরাকে ঘিরে। সে অন্ধকার সময়টাতে পূর্ব দিক হতে আমি একদিন একটু উষ্ণতার পরশ পাই। গুয়ান্তানামোতে সেবার আমি প্রথম এই পুলক অনুভব করি। সে দিনের কথা আমার স্মৃতিপটে চিরদিন আঁকা থাকবে।

সেপ্টেম্বরের ২০ তারিখ। আমার স্ত্রী উম্মে মুহাম্মদের পক্ষ হতে একটি চিঠি আসে। কাতার রেড ক্রিসেন্ট কর্মকর্তাদের মাধ্যমে। এটা আসে সামরিক পোস্ট নিয়ম মেনে। চিঠিতে পুত্র মুহাম্মদের একটি ছবি সংযুক্ত ছিল। ছিল পরিবারের অবস্থা, বিশ্বের অবস্থা জানিয়ে অনেক কথা। গোপন করব না যে, সে চিঠি পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলাম। অভিভূত হয়েছিলাম। চোখের কোণে ভিড় করেছিল আনন্দাশ্রু।

চিঠিটি হাতে আসার আগে আমি ঠিক এরকম একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম, একজন সৈন্য এসে আমার নাম্বার জানতে চাইল। নাম্বার বললে সে আমাকে আমার পরিবার থেকে আসা একটি চিঠি দেয়। স্বপ্ন দেখে খুব আনন্দিত হয়েছিলাম আর অপেক্ষা করছিলাম কখন সেই পরম মুহূর্তটি আসবে। অবশেষে কাঙ্ক্ষিত দিনটি আসে। ২০ সেপ্টেম্বর।

স্বপ্নে আমি যে সৈন্যকে দেখেছিলাম ঠিক সে সৈন্যটিই আমার কাছে চিঠি নিয়ে আসে। আমি তখন ঘুমোচ্ছিলাম। সে আমাকে ডেকে তোলে। আমি আড়মোড় ভেঙে উঠি। উঠে তাকে দেখি। তার হাতের দিকে তাকাই সে চিঠি নিয়ে এসেছে কি না।

সে আমার নাম্বার জানতে চায়। নাম্বার বলি। এরপর সে কক্ষের দরজা খুলে আমার হাতে চিঠিটি দেয়। আমি খুবই আনন্দিত হই। যখন চিঠির মুখ খুললাম দেখলাম আমার স্ত্রী পাঠিয়েছে। আমার পুত্রের ছবি সংযুক্ত। চোখের পানি আর ধরে রাখতে পারলাম না। অনেকক্ষণ কাঁদলাম। আমার পাশের কয়েদীরাও কাঁদলেন আমার সাথে। যদিও তারা ঘটনা কিছুই বুঝতে পারেননি। তারা আমাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। বললাম, আমার পরিবার আমার কাছে চিঠি পাঠিয়েছে। চিঠির সাথে আমার পুত্রের ছবিও রয়েছে। পরিবারের সাথে একবছর হলো কোনো যোগাযোগ নেই আমার।

স্ত্রীর চিঠি থেকে আমি জানতে পারি যে তারা এখন দোহায় আছে। আমার সাথে কী ঘটেছে তা সে পুরোপুরি জেনেছে। তারা এখন দিনরাত আল্লাহর কাছে আমার মুক্তির জন্য দু'আ করছে। তারা আমাকে এই প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে যে আমি শীঘ্রই মুক্তি পাব। তারা এটা নিশ্চিত যে আমি এমন কিছু করিনি যার জন্য আমরা বন্দিজীবন দীর্ঘতর হতে পারে।
উম্মে মুহাম্মদ আমাকে আরো জানায়, আল জাজিরা তাদের নিয়মিত অর্থ সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। আল জাজিরা আমার পরিবারের সাথে আজারবাইজানে যোগাযোগ করে। আমার এক কলিগের মাধ্যমে তারা নিয়মিত খোঁজ খবর রাখেন।

কিছুদিন পর একজন আইসিআরসি (ইন্টারন্যাশনাল কমিটি ফর রেড ক্রস/ক্রিসেন্ট) প্রতিনিধি কারাগারে আসে এবং আমার কাছে আগের চিঠিটির মতোই হুবহু একটি চিঠি দেয়। তাতে আমার পুত্র মুহাম্মাদের ছবিও সংযুক্ত ছিল।

চিঠি নিয়ে রেডক্রস কর্তৃপক্ষের সাথে একটা সন্দেহ ছিল। যখন আমি কান্দাহারে ছিলাম তখন আল জাজিরার দোহা হেড কোয়ার্টার বরাবর একটি চিঠি লিখেছিলাম। আমার অবস্থা জানিয়েছিলাম। মুক্তির অপেক্ষায় আমার দিনগুজরানের কথা বলেছিলাম। কিন্তু কোনো উত্তর পাইনি।

যখন আমি গুয়ান্তানামো কারাগারে স্থানান্তরিত হই তখন এক আইসিআরসি প্রতিনিধি আমার আগমনের কয়েকদিন পরই সাক্ষাৎ করেছিল। কিন্তু তখনও কোনো উত্তর পাইনি। দুই মাস পর অবশেষে একজন প্রতিনিধি দেখা করতে আসে। আমি তখন তাকে জিজ্ঞেস করি কেন আমি আমার প্রশ্নের উত্তর পেলাম না।

"কেউ কি আপনার সাথে সাক্ষাৎ করেনি?" তিনি বললেন।

"না", বললাম আমি।

"আমি তোমার জন্য একটি সভা আহবান করব", তিনি বললেন।

এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে আমি আইসিআরসির এক প্রতিনিধির সাথে গুয়ান্তানামোর ভেতরে এক অফিসে সাক্ষাৎ করি। তারা আমার মামলার জন্য একটি সিরিয়াল নাম্বার দেয়। আমি তাদেরকে আমার চিঠি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তাদের উত্তর ছিল মজাদার। তারা বলল, তারা আমার কোনো চিঠি পৌঁছায়নি কারণ তারা ভেবেছে সুদানের কেউ আমার গ্রেপ্তারের কথা জানুক আমি তা পছন্দ করব না।

আমি বললাম, "এ কথা আপনাদের কে বলল? আমি তো কাউকে কোন কিছু গোপন রাখতে বলিনি। আসলে আমি এর বিপরীত চেয়েছি। আমি চাই আমার দেশ আমার গ্রেপ্তার বিষয়ে জানুক। আর তাই যদি না হয় তবে আমি চিঠি লিখলাম কেন? আপনারা আমাকে নিয়ে গেম খেলছেন। আমি আপনাদের সাথে আর কোন কথা বলব না।"

তারা ক্ষমা প্রার্থনা করলো। বলল, এখন অবস্থা অনেকটা পরিষ্কার। তারা জেনেভা অফিসে আমার চিঠিটি পৌঁছে দেয়ার জন্য তাগাদা দেবে।

"তুমি আমাদের হয়ে কাজ করো"

আমাকে দ্রুত চার্লি ব্লকে স্থানান্তরিত করা হয়। বিশেষ করে আমার পরিবার থেকে চিঠি আসার পর। এক মাসের মত সেখানে কাটানোর পর জিজ্ঞাসাবাদকারীদের একটি দল সাদা পোশাকে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের কথাবার্তা অনেক কোমল। তারা জানালো যে তারা ব্রিটিশ গোয়েন্দা বাহিনী থেকে এসেছে।

তারা আমাকে এমন কিছু ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে যাদের সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই। তারা জিজ্ঞেস করে কিছু মানুষের সাথে ব্রিটেনে আমার দেখা হয়েছিল কিনা যখন আমি সেখানে ছিলাম।

"আমি কখনো ব্রিটেন যাইনি", বললাম।

এরপর তারা আমাকে কান্দাহার থাকা অবস্থায় সেখানে কাদের সাথে সাক্ষাত করেছি তাদের নাম জানতে চাইল। জানতে চাইল সেখানে কোনো ব্রিটিশ নাগরিক ছিল কি না। প্রশ্নবাণে জর্জরিত করল আমাকে। তারা আজারবাইজানে আমার শশুরবাড়ির লোকজন সম্পর্কেও জানতে চাইল।

তাদের একজন নিজেকে আরব-আমেরিকান নাগরিক বলে পরিচয় দিলেন। তিনি লণ্ডনে থাকেন। তার নাম ছিল ডা. ফাদি। তিনি মিডিয়া বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়েছেন। আমার সাথে সাক্ষাৎ করতেই তিনি এসেছেন। বললেন, তার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসাবাদ নয়; আল জাজিরা সম্পর্কে কথা বলা। অনেক প্রশ্ন করলেন। তার মধ্যে কয়েকটা ছিল এরকম, "কিভাবে আল জাজিরা সফল হলো? তারা আজকের অবস্থানে কিভাবে এল?"

আমি তাকে বললাম, "আল জাজিরা সফল হয়েছে তিন কারণে। প্রথমত এটা শুরু হয়েছে একঝাঁক প্রশিক্ষিত সাংবাদিক নিয়ে। যাদের অধিকাংশই কাজ করেছে বিবিসি এরাবিক সার্ভিসে। মিডিয়ায় কাজ করার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ছিল তাদের। দ্বিতীয়ত তারা সংবাদ প্রস্তুত করতে সবরকম

সহযোগিতাই মালিক পক্ষ থেকে পেয়েছে। তৃতীয়ত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, এর মজবুত নৈতিক ভিত্তি এবং মতপ্রকাশের উন্মুক্ত মঞ্চ তৈরিকরণ। এসব কারণেই চ্যানেলটি দ্রুত শক্তিশালীরূপে গড়ে ওঠে এবং জনপ্রিয়তা পায়।"

"আপনি জানেন যে, প্রতিটি চ্যানেলই একটি চূড়ান্ত সীমা মেনে চলে। যে চূড়ান্ত সীমা তারা অতিক্রম করতে পারে না। আল জাজিরার তেমন কোনো চূড়ান্ত সীমা ছিল না। এটি সম্পূর্ণ সাংবাদিকতার পেশাদারিত্বমূলক পরিবেশ পেত। সংবাদ সংগ্রহে এর প্রয়োগও ঘটাত। ফলে এটি পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের কাছে বিশ্বস্ত সংবাদের একমাত্র উৎসে পরিণত হয়। এটি মধ্যপ্রাচ্যে সংবাদ উপস্থাপনের এক নতুন ধারা চালু করে। মানুষকে সরকার নিয়ন্ত্রিত চ্যানেলের বাইরে সংবাদ জানার সুযোগ করে দিয়েছে। দর্শকদের আগ্রহের দিকে মনোযোগ দেয় আল জাজিরা। আর এমন সংবাদ সংগ্রহ করে যা সাধারণত অন্যান্য চ্যানেল যথেষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না।"

আমি আরো বললাম, "আল জাজিরা এমন এক চ্যানেল যেটি প্রথম 'দ্বিতীয় উপসাগরীয় যুদ্ধ' এবং 'আফগান যুদ্ধ' কভার করেছে। দর্শকরা এর স্বতন্ত্র উপস্থিতি লক্ষ্য করেছে। আল জাজিরা এভাবে পশ্চিমা মিডিয়াকে ছাপিয়ে একটি অবিচ্ছেদ্য সংবাদ উৎসে পরিণত হয়েছে।"

আমরা বেশ কিছুক্ষণ কথা বললাম। তিনি শেষ করলেন এই বলে, "আমরা বলতে পারি আল জাজিরা কাতারকে তাদের ভিত্তি ধরে এগিয়েছে। একটা জিনিস তোমাকে আমি বলতে পারি। তুমি যখন মুক্তি পাবে দেখবে আল জাজিরার অনেক শাখা প্রশাখা হয়ে লেজে গোবরে অবস্থা হবে।" এরপর তিনি চলে গেলেন।

এই সাক্ষাতের পর তারা আমাকে আবারো জিজ্ঞাসাবাদ করে। একটু উন্নত জায়গায় স্থানান্তরিত করে। গুয়ান্তানামো কারাগারের ভিতর। এটা এমন এক কক্ষ যাতে একাধিক আসন ছিল। ছিল একটি টেলিভিশন, পত্রপত্রিকায় ঠাসা একটি টেবিল। দেয়ালে মক্কা ও মদিনার ছবি আঁকা। নামাজের জায়নামাজ ও কুরআনের একটি বৃহৎ কপি। এটা এমন একটি কক্ষ ছিল, যা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নয় বরং অন্য কাজের জন্য তৈরি করা হয়েছে।

আমি বসেছিলাম। পঞ্চাশোর্ধ্ব এক লোক কক্ষে প্রবেশ করল। তিনি ছিলেন মাঝারি গড়নের। ধূসর চুল। কিছুটা তামাটে রঙের দেহ। ক্লিন

শেভড। চালচলন ভদ্রগোছের। শান্ত স্বরে কথা বলেন। কোমল স্বভাবের। সব মিলিয়ে তাকে বেশ মার্জিত মনে হচ্ছিল। মিশরীয় অভিনেতা ওমর আল হারিরির মতো দেখতে কিছুটা।

তিনি ছিলেন স্টিফেন রডরিগেজ। একজন কিউবান-আমেরিকান গোয়েন্দা এজেন্ট। ১৯৮০-র দশকে তিনি পশ্চিম জার্মানিতে কাজ করেন। শীতল যুদ্ধের সময়ে পূর্ব জার্মানীতে গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে ধরা পড়েন। ফিরে আসেন স্বদেশে। তাকে আবার পাঠানো হয় পূর্ব জার্মানী ও সোভিয়েতভুক্ত রাষ্ট্রগুলোতে।

সার্বিকভাবে এটা ছিল একটি সুন্দর সাক্ষাৎ। সে তোষামোদি ঢঙে কথা বলা শুরু করল, "আমি ড. ফাদির সাথে দেখা করেছি। সে বলেছে কয়েদী ৩৪৫ একজন উদার মনের মানুষ। আমি এখানে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য আসিনি। এসেছি একটি অফার নিয়ে। কিন্তু তার আগে একটু ভাবুন। মানুষের জীবনে কখনো কখনো সুযোগ আসে। সুযোগ আসে সম্পদ আর সৌভাগ্য অর্জনের। আপনার জীবনেও সে সুযোগ এসেছে। যদি সুযোগ অবহেলা করেন জীবন আরো দুঃসহ, আরো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ উত্তাল সাগরে আমরা পথহারা নাবিক। যদি আমরা সে সুযোগ না নিই তবে অচিরেই হরিয়ে যাব। সবকিছু শেষ হয়ে যাবে।"

"আপনার সামনে এক মহা সুযোগ অপেক্ষা করছে। কিছু কাজের সুযোগ। যে সুযোগ পরিবর্তন করে দিতে পারে আপনার জীবনের হিসাব নিকাশ। জীবনে আনতে পারে নতুন গতি। আপনার পরিবারেরও। ভাবতে থাকুন। আবার কথা হবে আগামী সপ্তাহে।"

সে আমাকে কিছু ম্যাগাজিন পড়তে দিল। তন্মধ্যে 'আল শারক আল আওসাত' পত্রিকাটিও ছিল। মিশরের কিছু ম্যাগাজিনও সেখানে ছিল। পত্রিকাগুলো ছিল গত দুই সপ্তাহের। দীর্ঘদিন আমি কোনো পত্রিকা পড়ি না, সংবাদ দেখি না। তাই পত্রিকা দেখে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। দ্রুত পৃষ্ঠা ওল্টাতে লাগলাম। শিরোনামগুলো দেখছিলাম। আমি বিভোর হয়ে গেলাম। সংবাদ ক্ষুধা নিবারণে নেমে গেলাম। পরে যাতে অন্য কয়েদীদেরও সেসব খবরাখবর দিতে পারি।

এরপর আমার সেলে ফিরে আসলাম। যেখানে কিছু আরব লোকের সাথে আমি থাকি। আবু আব্দুল্লাহ আল কুয়েতি ও অন্যরা থাকত সেখানে।

ভাইয়েরা আমাকে জিজ্ঞেস করল, "কী ঘটেছিল"? বললাম, এখনো ঘোরের মধ্যে আছি কিছুটা। কিছু সময় চাইলাম দম নেওয়ার জন্য। কী ঘটেছিল যাতে স্মরণে আনতে পারি। তাদেরকে পত্রিকা ম্যাগাজিনে পড়া সর্বশেষ ঘটে যাওয়া নিউজগুলো শোনালাম।

এক সপ্তাহ পর আবার সাক্ষাত হয় রডরিগেজের সাথে। সে এবার আরো খোলাখুলি বলতে থাকে, "সামি, আমরা চাই আপনি আমাদের সাথে কাজ করেন।"

'আমরা' কারা?, জিজ্ঞেস করলাম।

"আমরা হলাম আমেরিকান গোয়েন্দা বাহিনী।"

"আমি কোনো গোয়েন্দা সংস্থায় কাজ করব না", বললাম।

"গোয়েন্দা সংস্থার কাজ যেমনটা চলচ্চিত্রে আপনি দেখেন তেমন নয়। আমরা আপনাকে আমাদের সাথে কাজের বিনিময়ে আপনার পরিবার ও পুত্রকে আমেরিকার নাগরিকত্ব দেব। আপনার আলিশান বাড়ি থাকবে। গাড়ি থাকবে। আমেরিকার ব্যাংকে ডলার জমা হতে থাকবে। আমরা এক দুই মিলিয়ন ডলারের কথা বলছি না। কোটি ডলার জমা থাকবে। নির্ভর করছে আপনার পরিশ্রমের উপর। যদি মূল্যবান গোয়েন্দা তথ্য দিতে পারেন তবে ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়তেই থাকবে। আমরা আপনাকে প্রশিক্ষণ দেব। যখন আপনি এখান থেকে মুক্তি পাবেন আপনি হয়ে যাবেন (আমাদের পশ্চিমা দুনিয়ার কোনো এক) সেলিব্রেটি সাংবাদিক। আমরা আপনার বর্ণাঢ্য জীবন নিয়ে বই প্রকাশ করব। আপনাকে এমন একজন খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বে পরিণত করব যিনি অসংখ্য আন্তর্জাতিক পুরস্কার জিতবে। অতি দ্রুত আমরা আপনার কাঙ্ক্ষিত পদমর্যাদা লাভ আর স্বপ্নগুলোর বাস্তবায়ন করে দেব।

"কিভাবে কি করতে হবে?" জিজ্ঞেস করলাম।

"খুবই সহজ কাজ। এখান থেকে বের হবার পর আপনি আবার আল জাজিরায় যোগ দেবেন। এরপর যখন কোন সাক্ষাৎকার নিতে যাবেন যেমন ধরুন, মোয়াম্মার গাদ্দাফির সাক্ষাৎকার নিলেন; আপনি তখন আমাদের জানিয়ে দেবেন সাক্ষাৎকার নেয়ার স্থান, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, তার গতিবিধি, ভাবভঙ্গি এবং আপনার পর্যবেক্ষণ। যদি আল কায়েদা সাক্ষাৎকার দিতে আপনার সাথে যোগাযোগ করে খেয়াল রাখবেন সাক্ষাৎকার কোথায় হচ্ছে, কাদের সাথে আপনার সাক্ষাৎ হচ্ছে। তাদের বর্ণনা আমাদের দেবেন।

আমাদেরকে আপনার বিস্তারিত কর্মের বিবরণ দিতে হবে না। আপনার শরীরে আমরা ইলেকট্রনিক ডিভাইস সেট করে দেব। আপনার গতিবিধি, কথপোকথন আমরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুনতে পাব। আমরা চাই কাগজে কলমের রিপোর্ট যা ডিভাইস দিতে পারবে না। আমরা আপনাকে নাম্বার মনে রাখার কৌশল শিখিয়ে দেব। শিখিয়ে দেব মানুষের বর্ণনা কিভাবে দেবেন। আরো শেখাব কিভাবে মানুষের বিশ্বাস অর্জন করবেন। এ জাতীয় বিভিন্ন বিষয় শেখাতে প্রশিক্ষণের আয়োজন করব। যখন ফিরে যাবেন দেখবেন কাতারে, আল জাজিরায় আপনাকে সহযোগিতা করতে আমাদের লোক রয়েছে। আপনি একা নন। মোটা অংকের টাকা আপনার অপেক্ষায়। আপনি সুখি হবেন। আপনি অল্প সময়ে এতকিছু পাবেন যা অনেকে দীর্ঘদিন কঠোর পরিশ্রম করেও তা অর্জন করতে পারবেন না।"

"খুব ভালো" আমি বললাম, "আপনি চান আমি আল কায়েদা এবং অন্যান্য সংগঠনের বিরুদ্ধে কাজ করি।"

"হ্যাঁ, সে বলল, একটু কৌশল খাঁটিয়ে করবেন আর কি!"

"আমি আল্লাহকে ভয় করি। তিনি আমাকে দেখছেন। কোনো মুসলিম অপর মুসলিমের অপরাধ খুঁজে বেড়াতে পারে না। আমি নিশ্চিত যারা একাজ করে তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। দুনিয়া হারায়। পরকালও হারায়", বললাম।

গুয়ান্তানামোতে, মার্কিনিদের সাথে যতটা আমার পরিচিতি তাতে আমি অনেক কিছু শিখে নিয়েছি। শিখে নিয়েছি যে মানুষের সাথে তাদের মানসিকতা অনুযায়ী কথা বলতে হয়। আমেরিকানরা বাস্তববাদী। সবক্ষেত্রে। তাদের বাস্তব জীবনের মতো। যদি আমি বলি, "এটা আমার ধর্মে অনুমোদিত নয়" তারা কর্ণপাত করবে না। কারণ তারা ধর্মের ধার ধারে না। এর কোনো অর্থ তাদের কাছে নেই। একই কথা তাদের সব সৈন্য ও জিজ্ঞাসাবাদকারীর জন্য প্রযোজ্য। তাদের দেখেশুনে আমার তাই মনে হয়েছে। বস্তুবাদী লোকেরা তাদের বস্তুবাদী যুক্তি দিয়েই কয়েদীদের সাথে কথা বলে।

আমি এবার কিছু কথা বলা জরুরি মনে করলাম। "আমি আফগানিস্তানে গিয়েছিলাম যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহ করতে। কিন্তু আপনি যা বললেন তা খুবই ভয়ংকর। আমি হয়তো কিছু অর্থ উপার্জন করব; কিন্তু অন্তরটাকে মেরে

ফেলব। আমার অন্তর একটাই। যদি আমি এটা হারাই অর্থের কোন মূল্য হয় না। আমি আমার নিরাপত্তা নিয়ে ভীত। আমার পরিবারের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত।"

সে সান্তনা দিয়ে বলল, "ভীত হবেন না। আমরা আমেরিকায় আপনার নিরাপত্তা দেব।"

"মাফ করবেন আমেরিকা যদি এতই শক্তিশালী হয় তবে আমার মত দুর্বল মানুষের কাছে সাহায্য চাইতে আসে কেন? আপনারা কিভাবে আমাকে নিরাপত্তা দেবেন যখন আমাকে ছাড়া আপনাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে না?"

সে এক মিনিট নীরব হয়ে রইল। এরপর বলতে শুরু করল, "সেটা ঠিক। আমরা এখনই সবকিছু করে দিতে পারব না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমরা অসহায়। আমাদের অনেক ক্ষমতা। তদুপরি আমরা এখন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছি। ব্যাপক বিস্তৃত এক যুদ্ধে। আমরা মানুষ নয় ভূতের সঙ্গে যুদ্ধ করছি। এই যুদ্ধে আমাদের মানুষের মোকাবিলায় মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন। সেজন্য আমরা আপনার সাহায্য চাইছি।"

"আমার মন সায় দিচ্ছে না", বললাম। "আমি চাই এখান থেকে বেরিয়ে আমার পরিবারের সাথে থাকতে। চাই নিরিবিলি জীবন। হুমকি, অস্থিরতা না।"

"আমাদের সাথে কাজ করতে তাহলে রাজি হচ্ছেন? হয়ে গেলে দ্রুত মুক্তি পাবেন। আসলে আপনি তেমন কিছু করেননি যাতে আমরা আপনাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারি। আপনাকে এখানে রাখার ব্যাপারে আমাদের কোন আইনি ভিত্তি নেই। কিন্তু আবার এমন কোনো আইন নেই যা আপনাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যেতে পারে। এই খাঁচায় বন্দিজীবন থেকে মুক্তি দিতে পারে। মুক্তি পেতে পারেন যদি আমাদের সাথে হাত মেলান। হাত মেলালে আমরা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে আপনাকে আপনার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিতে পারি।"

বললাম, "ভালো। আমাকে ভাবতে দিন।"

সে আমাকে নতুন কিছু ম্যাগাজিন দিয়ে বলে: "যদি আপনার কোন কিছু প্রয়োজন হয় আমরা ব্যবস্থা করব। যে কোন ব্লকে আপনি স্থানান্তরিত হতে চান অথবা যে কোন কিছু..."

"আমাকে এখনি এখান থেকে, নিয়ে যাবেন না। এখানকার এই ম্যাগাজিনগুলো অন্তত আমি পড়ার মতো সময় এখানে থাকতে চাই," বললাম।

সে বলল, "আমি আপনাকে এক ঘণ্টা সময় দেব পড়ার জন্য। পরের সপ্তাহে আপনার জন্য আরো ম্যাগাজিন, পত্রপত্রিকা নিয়ে আসবো। কিন্তু আপনি প্রস্তাবটি নিয়ে গভীরভাবে ভাববেন।"

আমি আমার সেলে ফিরে আসি। বসে চিন্তাভাবনা করতে চাইছিলাম। কিন্তু আমার প্রতিবেশী কয়েদীরা আমার জিজ্ঞাসাবাদ সম্পর্কে জানতে চাইল। আমি তাদের বললাম সবকিছু ঠিক আছে। এখন আর কথা বলতে চাইবেন না। কারণ আমাদের সবকিছু পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। পরে আমি আমার সুদানি প্রতিবেশি হাম্মাদকে ফিসফিস করে কিছু কথা বলেছি। তাতে সে বুঝে যাওয়ার কথা যে সেদিন কী কথা হয়েছিল তাদের সাথে আমার। সে বুঝতে পারার কথা যে, আমি তাদের সাথে কাজ করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি। বোঝার কথা যে আমার মন আমি পরিবর্তন করিনি। অবশ্য যে ভঙ্গিতে আমি তখন কথা বলেছিলাম তাতে তারা আমাকে কিছুটা আগ্রহী মনে করেছে। বিনিময়ে কিছুটা শিথিলতা দিয়েছে। নমনীয়তা দেখিয়েছে।

হাম্মাদ বললেন, মার্কিন গোয়েন্দাকে গোঁজামিল দেওয়ার চেষ্টা ভাল ফল বয়ে আনবে না। হাম্মাদের সাথে কথা বলে আমার দ্বীনের প্রতি অটল থাকার দু'আ চাইলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম ক্লিয়ার কাট কথা বলব। এক সপ্তাহ পর তারা এল। আমাকে একই কক্ষে ডেকে নিল। রডরিগেজ হাসিমুখে কতগুলো ম্যাগাজিন, পত্রিকা নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করলেন।

"ইনশাআল্লাহ্, তুমি নিশ্চয়ই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছো", তিনি বললেন।

"হ্যা, আমি সিদ্ধান্তে এসেছি।"

"সেটা কী?" সে জানতে চাইল।

"আমি আপনাদের সাথে কাজ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি", বললাম, "প্রথমত, আমি আমার পরিবার এবং আমাকে নিয়ে ভয় করি। দ্বিতীয়ত, সত্যি যদি বলি তা হলো, আপনারা যা করতে বলেন তা আমার নীতির সাথে যায় না।"

"তোমার ভয় প্রসঙ্গে বলি, আমি তোমাকে আগেও বলেছি, আমরা তোমাকে সুরক্ষা দেব। নিরাপত্তার ব্যাপারটা তুমি একাই দেখছো না, আমরাও দেখছি। তুমি পুরো মার্কিন কমিউনিটির সাথে কাজ করবে এবং দেখবে তারা কতটা শক্তিশালী। তারা সেখানে সবাই তোমার পরিবারকে, তোমাকে নিরাপত্তা দিতে প্রস্তুত। যদি তুমি বসবাস করার জন্য আমেরিকায় আসো, তুমি ফিরে যেতে চাইবে না। আবশ্য আমরা সেটা চাইও না। সেটা তোমার মনের ব্যাপার। তুমি দোহাতেও থাকতে পার। আমরা সেখানেও তোমাকে নিরাপত্তা দেব। সেখানেও তুমি অনেক সহকর্মী পাবে আমাদের। আপাতত নামগুলো গোপনই থাক।"

সে এক নাগাড়ে বলে চলল। "তোমার নীতির প্রসঙ্গে আসি। এ কাজকে তুমি জেমস বন্ডের কাজের মতো মনে করো না; যে কাউকে হত্যা করতে হবে অথবা দুর্গম অভিযানে বের হতে হবে। আমরা কূটনৈতিকদের মতো। হত্যা, খুন, দুর্নীতি বন্ধের পথ খোঁজাই আমাদের কাজ। হত্যা এড়িয়ে যেতে কাজ করি। একান্ত বাধ্য হলে ভিন্ন কথা। তবুও সে কাজটা আমরা করি না অন্য কেউ করে। আমরা দুর্ঘটনা ঘটার আগেই থামিয়ে দেই।"

"আপনার কি মার্টিনের কথা স্মরণ আছে?" তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

"হ্যাঁ, একজন ব্রিটিশ গোয়েন্দা অফিসার যার সাথে তুমি সাক্ষাৎ করেছ।"

আমি হেসে দিয়ে বললাম, "না, আমি কোনো জিজ্ঞাসাবাদকারী গোয়েন্দার কথা বলছি না। আমি বলছি মার্টিন লুথার কিং-এর কথা। আপনারা তাকে হত্যা করেছেন। যদিও সে ছিল একজন গণতন্ত্রমনা, আপনাদের মতোই। সাম্য ও ন্যায়বিচারের কথা বলত। কিন্তু তার রাজনীতি আপনাদের পছন্দ নয় বলে তাকে মেরে ফেলেছেন। তাই আমি এরকম কিছুর সাথে জড়িত হব না।"

সে বলল, "আমরা কিং-কে হত্যা করিনি। আমরা তার হত্যাকারীকে আটক করেছি। তার বিচার করেছি। জেলে ভরেছি। কাজটা করেছে সিআইএ। খারাপ লোকদের তারা আটক করেছে। আমাদের দুটো লক্ষ্য ছিল; প্রথমটি হলো, অপরাধ ঘটার আগেই থামানো। দ্বিতীয়টি, অপরাধীদের ধাওয়া করা এবং গ্রেপ্তার করে বিচারের আওতায় আনা। মার্টিন লুথার কিং

এক বর্ণবাদীর হাতে নিহত হয়। গোয়েন্দা কর্মকর্তারা তাকে আটক করে। এটা আমাদের পক্ষে থেকেই হয়েছে।

"ঘটনা সেরকম, হতেও পারে, কিন্তু আমি আপনাদের সাথে কাজ করতে চাই না। আমি আপনার সাথে একজন বন্ধু হিসেবে কথা বলব জিজ্ঞাসাবাদকারী হিসেবে নয়। আমরা কি বন্ধু হিসেবে কথা বলতে পারি না?"

"অবশ্যই", সে বলল।

"তাই, আমার বন্ধু, আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। আপনার কি পরিবার আছে-একজন স্ত্রী, সন্তান যারা আপনাকে ভালোবাসে। আর আপনাকে আমার মতো এরকম কাজের অফার দেয়া হলো। এমন কাজ যা আপনি আগে কখনো করেননি। আর আপনি জানেনও যে এই কাজ করতে গেলে আপনার এবং পরিবারের লোকদের বিপদ ঘটবেই। আপনি কি সে কাজ করবেন? সত্যি করে বলুন তো?"

"সত্যি করে বললে, আমি সে কাজের অফার ফিরিয়ে দেব", তিনি বলেন।

"আপনার সততার জন্য ধন্যবাদ। দেখুন। আমিও আপনার অফার ফিরিয়ে দেব।"

তিনি মাথা নেড়ে বললেন, "ব্যাপারটা অন্যভাবে দেখুন। আপনি গুয়ান্তানামোতে বন্দি। নির্দোষ। কিন্তু মার্কিনিরা মনে করছে এখানে যারা বন্দি তারা সবাই বদমাশ। শীঘ্রই এখান থেকে বের হতে পারবেন না যদি না আমাদের সাথে কাজ করতে সম্মত হন। আর যদি সম্মত হন তবে কয়েক দিনের মধ্যে আপনি পরিবারের কাছে ফিরে যেতে পারবেন। তবে কেন আপনি সম্মত হচ্ছেন না? কেন দ্রুত পরিবারে ফিরছেন না? ফিরে গিয়ে বলে দেবেন যে আপনার মন পরিবর্তন হয়ে গেছে। কেন সেটা করছেন না?

আমি হাসলাম। বললাম, "আমি এখান থেকে বের হয়ে যেতে চাই। সেজন্য আমি প্রতিদিন আল্লাহর কাছে চাই। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমি যদি আপনার অফার গ্রহণ করি। মুক্তি পাই। এরপর বলি 'আমার মন পরিবর্তন হয়ে গেছে। আমি আর সাংবাদিকতা করতে চাই না। আমি চাই, সুদানের এক প্রত্যন্ত গ্রামে চলে যাব। যে কাজে আপনাদের কোন স্বার্থ নেই।' তখন আপনারা কি করবেন?"

তিনি বলেন, "সত্যিকরে বলতে, আমরা আপনাকে আবার ধরে নিয়ে আসবো। এই কারাগারে বন্দি করে রাখব।"

"কেন?"

"কারণ আপনি কারাগার ত্যাগ করে যেতে পারেন না যতক্ষণ না আমাদের সাথে কাজের চুক্তি করেন। চুক্তি মতে কাজ করলে পুরস্কৃত হবেন আর কাজ না করলে শাস্তি পাবেন। সর্বশেষ শাস্তি হলো আবার এই কারাগারে নিয়ে আসা। আর সেটা তখন হবে আইনসম্মত। চুক্তি অনুযায়ী।"

"তার মানে, আমি আসলে কিছুই পাব না। অবৈধ বন্দিত্ব থেকে বৈধ বন্দি হওয়া শুধু। এখানে আমি কিছু সহমর্মী বন্ধু পাচ্ছি কিন্তু বৈধ বন্দিত্বে কেউ থাকবে না আমার পাশে। আমার জীবন হবে তখন দুঃখ দুর্দশাগ্রস্ত, অপমানজনক। আমার নিজের দেশেও ফিরে যেতে পারব না আমি। এমনকি মার্কিন সেনারা আমাকে মুক্তি দিলেও না। আমি আগুন নিয়ে খেলতে চাই না। এখান থেকে মুক্তি পাবার পর আমি মুক্ত স্বাধীন হয়ে বাঁচব। আপনাদের প্রশাসনের অথবা অন্য কারো অধীনে থাকব না। এটাই আমার সিদ্ধান্ত। এর জন্য যে কোনো পরিণতি বরণ করে নিতে প্রস্তুত আছি।"

তিনি নেতিবাচক মাথা নাড়লেন এবং বললেন, "আপনার তথ্যাদি ঘেঁটে, জিজ্ঞাসাবাদ শুনে বাধ্য হয়ে আপনাকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেই। আপনার মতকেও আমি শ্রদ্ধা জানাই। আশাকরি আপনি আবার ভাববেন। যদি সিদ্ধান্তে আসেন আমার সাথে সাক্ষাৎ করবেন। প্রহরীকে বললেই হবে। আমি আপনাকে আমার নাম বলতে পারব না। শুধু বলবেন বিশেষ সাক্ষাৎ করা লোকটির সাথে দেখা করতে চান। যদি আমি এখানে থাকি সাক্ষাৎ হয়ে যাবে। আর যদি না থাকি তবে কোন একজনকে পাঠাব যার সাথে সাক্ষাৎ করবেন। যার কাছে বললেই হবে যে আপনি আমাদের সাথে কাজ করতে চান।"

এর পরপরই সে বেরিয়ে গেল। তার হাতের ম্যাগাজিনগুলো চাইলাম। তিনি দিলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও দিলেন। কয়েক মিনিট পর একজন সৈন্য এল। আমাকে আমার সেলে নিয়ে গেল। তার আগে কিছু ম্যাগাজিন পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেলে গেলাম আনন্দচিত্তে। কাঁধ থেকে বিশাল বোঝার ভার নেমে গেল বলে।

আবু শায়মা এবং আবু শিফা

এবার চল্লিশ বছরের এক আলজেরিয়ার বংশোদ্ভূত বসনিয়ান নাগরিকের গল্প বলব। মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। তাকে আমরা বসনিয়ার আলহাজ বলে ডাকতাম। কয়েদখানায় সে আমার প্রতিবেশী। প্রাজ্ঞ, শান্ত ও কোমল স্বভাবের মানুষ। তার চোখে এক গভীর দুঃখের ছাপ। কিন্তু সে থাকত চুপচাপ, দূরত্ব বজায় রেখে। তার কষ্টের কথা কিছুই ভাগাভাগি করত না। কাউকে বলত না। তার ব্যাপারে জানতে পারি তার কাছে আসা একটি চিঠি থেকে। চিঠিটি পাঠিয়েছে তার স্ত্রী।

"আমার অনুপস্থিত স্বামী আবু শায়মার প্রতি, আল্লাহ তাকে সমস্ত খারাবি থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।

আল্লাহর রহম ও ফজল আপনার প্রতি।

লেখার পূর্বেই একটি বিষয়ে সংকোচ করছি। আমি আগুনে কেরোসিন ঢালতে চাই না। কিংবা চাই না আপনার বয়ে চলা যন্ত্রণার উপর আরো যন্ত্রণা চাপাতে। কিন্তু কিছু কথা আপনাকে খোলাখুলি ভাবে বলতে চাই। যদিও সেটা কঠিন ও নিষ্ঠুর। আমাদেরকে বাস্তবতা স্বীকার করতেই হবে তা যত তিক্তই হোক।

আমার অনুপস্থিত স্বামী,

কলম হাতে নিয়েছি আপনাকে লিখব বলে। শব্দেরা এলোমেলো। সন্ত্রস্ত আমি কিভাবে যে বলি! তবুও লিখছি। আপনাকেই লিখছি। চোখে অশ্রুর বন্যা। প্লাবন নেমেছে। একটু যদি হালকা হই। এই আশায় লিখছি।

আমার ফুল, শায়মা... আমাদের সাত বছরের কন্যাকে ডেকে তুলি। সকালে। নাস্তা খাবে তাই। বালিকা মেয়ে আমার বলে: "মা, সন্তানদের সামনে বাবা-মার মরে যাওয়া অনেক স্বাভাবিক ঘটনা, তাই না?

"হ্যাঁ, আমি বললাম, কিন্তু তুমি এসব জিজ্ঞেস করছো কেন?"

"আমার মনে হয় আমি মরে যাব। তোমার সামনেই," সে বলল।

আমি তার মুখ চেপে ধরি। যাতে সে আর কথা বাড়াতে না পারে।

"নাস্তা প্রস্তুত, ছোট্ট মামনি আমার। এখানে আসো। স্কুলে যেতে দেরি করো না যেন।"

একটু আড়ালে চলে যাই যাতে সে আমার চোখের অশ্রু দেখতে না পারে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে এনে আবার সামনে চলে আসি। এসে দেখি সে বিছানায় শুয়ে আছে। বললাম: "কেন তুমি এতো আলসেমি করছো আমার লক্ষ্মীসোনা?"

ক্ষীণকণ্ঠে সে বলল, "আমার খুব ক্লান্ত লাগছে মা! আজ স্কুলে যাব না।"

তার চোখের দিকে তাকালাম। দেখলাম সে সত্য বলছে। হাসপাতালে ফোন করলাম। সময়ের ব্যবধান খুব বেশি হবে না। স্কুল বাসের পরিবর্তে সে উঠল অ্যাম্বুলেন্সে। সাইরেন বাজছে অ্যাম্বুলেন্সের। সকালের ট্রাফিক জ্যাম ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছে গাড়ি। হাসপাতালের দিকে। অবশেষে সারাজেভোর বিশেষায়িত হাসপাতালে এসে পড়ি শায়মাকে নিয়ে। আলহামদুলিল্লাহ। শায়মার একজন কার্ডিওলজি ডাক্তার সেসময় হাসপাতালে ছিলেন। তৎক্ষণাৎ কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে শায়মাকে আইসিইউতে বদলি করা হলো।

আমাদের প্রিয় সন্তানটি তখন সম্পূর্ণ কোমায়। জানালার বাইরে থেকে তাকে দেখলাম পুরো দু'টি রাত। জানতে চাইবেন না সে রাত কত দীর্ঘ ছিল।

তৃতীয় দিন। সকালে সূর্য ওঠে। খুকুমণির দেহে তখনো প্রাণ ছিল। রাত নামে। চাঁদটা চলে যায় বাসা থেকে। শায়মার আত্মাটা নিয়ে যায় ফেরেশতারা। দেহটা পড়ে থাকে।

এরপর কি হচ্ছে খেয়াল নেই। শুধু এতটুকু মনে আছে-সারাজেভো গোরস্থানে অনেক মানুষের সমাগম। কাউকে চিনি, কাউকে চিনি না। শায়মার স্কুলের সহপাঠীরা তার লাশ নিয়ে কবরে যায়। অশ্রুভেজা নয়নে তারা তাকে শেষ বিদায় জানায়।

আমি বাসায় ফিরে আসি কিন্তু ঘরে ঢুকতে পারছিলাম না। দৈত্যের মতো লাগছিল আমাকে। বাড়ির চৌকাঠেই বসে পড়ি। যে ঘরে খুকুমণি থাকত সে ঘরে আমি কিভাবে প্রবেশ করি ওকে ছাড়া! এটা আপনি চলে যাওয়ার চার বছরের কষ্টের চেয়েও বেশি। আমাদের বেডরুমে আমি ঘুমাতে

পারি না। শায়মার রুমে গিয়ে শুই। কিন্তু ঘরের এমন কোন জায়গা নেই যেখানে গিয়ে আমি একটু ঘুমাতে পারি!

আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। আমার বাবার বাড়িতে। যতদিন না আপনি আসছেন। আমরা আপনার জন্য হৃদয়ে দীপশিখা জ্বালিয়ে রাখি। শীঘ্রই এসে আপনি ঘরে আলো জ্বালবেন বলে। উপরওয়ালার ইচ্ছায়। যিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

আপনার স্ত্রী
উম্মে শায়মা।

তার আইনজীবী হাজার হাজার কিলোমিটার পার হয়ে। বহু চড়াই উৎড়াই পেরিয়ে। শায়মার বাবার প্রতি মায়ের এই হৃদয়বিদারক চিঠি পৌঁছায়।

আবু শায়মা তার আইনজীবীর সাথে স্টিলের চেয়ারে মুখোমুখি হয়ে বসে। তার হাতে হাতকড়া পরা। পা দুটো মেঝের শক্ত লোহার সাথে বাঁধা।

আবু শায়মার সাথে আইনজীবীর এটাই প্রথম সাক্ষাৎ নয়। কিন্তু সে মুহূর্তটি ছিল আবেগঘন। আইনজীবী তাকে স্বাগত জানালেন। স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞেস করলেন কেমন চলছে সবকিছু। আবু শায়মা তাকে চলমান নির্যাতন ও অবিচার সম্পর্কে বললেন।

আবু শায়মা তাকে এখনকার দৈনিক জিজ্ঞাসাবাদের ধরন সম্পর্কে বললেন। ১০ ঘণ্টারও বেশি সময় ঠাণ্ডা কক্ষে সোজা দাঁড় করিয়ে বা বসিয়ে রাখে। তারা তাকে ২০০১ সালে প্রতিরক্ষা সক্ষমতাহীন রাষ্ট্র আফগানিস্তানের উপর মার্কিনিদের বর্বর হামলার দিনগুলোতে তোরাবোরা পাহাড়ে থাকার মিথ্যা কথা স্বীকার করতে বলে।

আইনজীবী আবু শায়মার কাঁধে হাত বুলিয়ে বলেন: "ঠিক আছে। আগামীকাল আমি এটা তুলে ধরব। আমরা পুরো পৃথিবীর সামনে সত্যটা তুলে ধরব।

মার্কিন প্রশাসন তাদের পক্ষে জনমত গঠনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। তাদের সে শর্টটার্ম কৌশল আদতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু সেসব বিষয় আপাতত ভুলে যান। বসনিয়া থেকে আপনার পরিবার চিঠি পাঠিয়েছে।

চিঠির কথা শুনে সবকিছু ভুলে যান আবু শায়মা। পরিবারের খবর জানতে চিঠিটি হাতে নিয়েই পড়তে শুরু করেন। কিন্তু সে চিঠির শুরুতেই

দুঃসংবাদের কথা আঁচ করতে পারেন। তার চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। বিড়বিড় করে বলতে থাকেন, "আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। আমরা তার কাছেই ফিরে যাব।"

আইনজীবী চুপ করে থাকলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি সৈন্যদের বললেন তাকে তার সেলে নিয়ে যেতে। তিনি টলতে টলতে ফিরলেন। তার চোখে তখনো অশ্রুর বন্যা। জিহ্বা নেড়ে নেড়ে বলছেন, "আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। আমরা তার কাছেই ফিরে যাব-ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন।"

তৎক্ষণাৎ আমার বুঝে নিলাম গুরুতর কিছু ঘটেছে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম কী ঘটেছে। উত্তর দেবার মতো শক্তি তার ছিল না।

"নিষ্ঠুর কিছু করেছে কি তারা তোমার সাথে?" আমরা জিজ্ঞেস করলাম।

সে নিচের দিকে চেয়ে থাকল। এক ভয়ংকর নীরবতা নেমে এল। প্রত্যেকেই তার দিকে বেদনাহত হৃদয়ে, উদ্বেগ উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে আছে।

"কি হয়েছে? আবু শায়মা, দয়া করে আমাদেরকে বলুন। বলুন কী হয়েছে?"

সে আমাদের দিকে তাকাল। তখনো তার চোখেমুখে অশ্রু মাখামাখি। কিছুটা কান্না থামিয়ে সে বলল, "আমার প্রিয় শায়মা মারা গেছে।"

আমাদের চক্ষু চরকগাছ। মুখ হা। আসলে সে শোক প্রকাশে কোনো শব্দ চয়নই যথেষ্ট নয়। সে রাতে আমাদের হৃদয় ভেঙে দুটুকরো হয়ে গিয়েছিল।

পর দিন সকালে আবু শায়মা আমাদের জানান, তার কন্যা শায়মার জন্মের সময়ে হার্টে ছিদ্র ছিল। ডাক্তারকে অপারেশন করতে বললে ডাক্তার বলেছিল আরেকটু বড় হলে করাতে। তিনি তখন থেকেই টাকা জমাতে থাকেন অপারেশনের জন্য। যখন তার এক-তৃতীয়াংশ টাকা জমা হয় তখনই মার্কিন সেনারা তাকে গ্রেপ্তার করে। আমাদের বলা উচিৎ তাকে অপহরণ করে।

"আমার সব চেষ্টা বৃথা গেল। সব পরিশ্রম পণ্ড হয়ে গেল। গ্রেপ্তারের পর শুধু মেয়ের কথাই ভাবছিলাম। কিন্তু আমি তো এই লজ্জাজনক পরিবেশে বন্দি।"

দু'সপ্তাহ পর। একটি চিঠি আসে। তিন মাস আগের লেখা। চিঠির সাথে একটি ছবিও সংযুক্ত। ছবিতে ছোট্ট এক বালিকা শিশুর নির্মল হাসিমাখা মুখ। চিঠিটিও তার হাতের লেখা। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। চিঠিটি শায়মার লেখা।

আমার প্রিয় বাবা,

আসসালামু আলাইকুম।

আমি আপনাকে খুব মিস করি বাবা! খুব, খুব বাবা!

আমি ভালো আছি, চিন্তা করবেন না। আমি এখনো আপনার জন্য অপেক্ষা করছি। আমি পথ চেয়ে বসে আছি কখন আপনি আসবেন আর আমাকে আলজেরিয়ায় দাদুবাড়িতে নিয়ে যাবেন। বাবা, সম্প্রতি আমরা স্কুলে শান্তি দিবস পালন করেছি। ডেটন শান্তি চুক্তির দশ বছর পূর্তি উপলক্ষে। আমার শিক্ষক আমেরিকাকে শান্তির অভিভাবক বলেন, ধন্যবাদ দেন।

পার্টি শেষ হবার আগে আমি আমার শিক্ষককে জিজ্ঞেস করলাম, "আমেরিকা যদি শান্তির রক্ষকই হবে, তবে কেন তারা মানুষকে বন্দি করে? কেন পরিবার থেকে দূরে রাখে?"

তিনি জবাব দেন, "প্রিয় ছোট্ট মনি, আমেরিকা শুধু যুদ্ধ অপরাধীদেরকেই গ্রেপ্তার করে। শান্তি রক্ষার জন্য।"

আমি বলি, "কিন্তু আমার বাবা কোন যুদ্ধাপরাধী নন। বাবা ইয়াতিমদের নিয়ে কাজ করা একটি এনজিওতে চাকরি করতেন। অসুস্থদের সেবা করতেন। বাবা খাবার বিলাতেন। ঔষধ, কাপড়চোপড় বিতরণ করতেন। কেন তারা আমার বাবাকে চার বছর ধরে আমার থেকে দূরে রেখেছে?"

শিক্ষক এক মুহূর্তের জন্য নীরব হয়ে গেলেন। এরপর বললেন, "তোমার বাবা শীঘ্রই তোমার কাছে ফিরে আসবে শায়মা।"

বাবা তুমি অনেক সময় নিয়ে নিচ্ছ। অনেক দিন ধরে তুমি দূরে থাকছো! আমরা তোমাকে ছাড়া বাঁচতে পারি না, বাবা!

আমি প্রতিদিন তোমার প্রতীক্ষায় থাকি। সকাল-সন্ধ্যায় তোমার কথা মনে করি।

বাবা...
বিদায়, আমার চুমো নিও!
শায়মা, যে তোমাকে খুব মিস করে!

আমি শায়মার চিঠিটি পড়েছি (আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করুন)। দুঃখভরা মন নিয়ে পড়েছি। এরপর অন্য বন্দিদেরও পড়তে দিয়েছি। আবু শায়মার দুঃখে আমরা সবাই দুঃখিত, বেদনাহত।

কয়েদীদের একজন, আমার সুদানি ভাই আদিল হাসান আবু দিয়ানা (আবু শিফা) শায়মার চিঠি পড়ে দীর্ঘক্ষণ কেঁদেছেন। চিঠিটি যেন তার নিজের দুঃখগাথা তুলে ধরেছে। পুরনো ক্ষত আবার দগদগে করে তুলেছে।

এর এক বছর আগে আদিলের পরিবার থেকে একটি চিঠি আসে। চিঠিতে জানানো হয় তার কন্যা শিফা আর নেই। সে তার কারাগারে আসার পর জন্মগ্রহণ করে। এরকম ১০ জনেরও বেশি বন্দি হবে যারা তাদের সন্তানদের মুখ দেখেননি। শিফা তার অসুস্থতা নিয়ে দেড় বছর বেঁচে ছিল। এরপর মারা যায়। তার পরিবার শিশুটির চিকিৎসা ব্যয় মেটানোর সামর্থ্য রাখত না।

আবু শিফা বলেন, আমি প্রায় পনের বছর ধরে মানবিক সংগঠনের সাথে কাজ করছি। কখনো আফগানিস্তানে, কখনো পাকিস্তানে। আমার পাকিস্তান সরকার ও ইউনেসকো অনুমোদিত কাগজপত্র রয়েছে। ইয়াতিমদের নিয়ে কাজ করতাম। কখনো ভাবিনি এমন দিন আসবে যে নিজের পরিবারকে অভাবে পড়তে হবে।

তিনি কিছুক্ষণ থামলেন। ব্যথায় কঁকিয়ে উঠে আবার বলতে শুরু করেন, "সর্বশেষ, আমি একটি হাসপাতালের কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেছি। উদ্বাস্তুদের ফ্রি চিকিৎসা সেবা দিয়েছি। কখনো ভাবিনি আমার মেয়ে সেসব দরিদ্র মেয়েদের মতো হয়ে যাবে। বাবার আদর ছাড়া বেড়ে উঠবে। কখনো ভাবিনি আমার মেয়ে অসুখের কষ্টে ভুগবে। অসহ্য যন্ত্রণায় বিছানায় কাতরাবে। আরেকটু চেষ্টা হলেই হয়তো চিকিৎসা পাওয়া যেত! সে বেঁচে যেত! কেন আমাকে মার্কিনিরা আটকে রেখেছে? আমার শিফার মৃত্যুর জন্য কি তারা দায়ী নয়?

প্রথম রমাদান

গুয়ান্তানামোতে আমরা কখনো চোখ জুড়ানো পাল তোলা নাও দেখিনি। শুনিনি নাওয়ের কুলকুল শব্দ কিংবা ঝিরিঝিরি বায়ুপ্রবাহ। সেখানে চোখ জুড়ানো প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়, দেখেছি নির্মমতা। দেখেছি শুধু মৃতদেহগুলো আমাদের কারাগার ত্যাগ করছে। আর নিস্তেজ নিরুপায় দেহগুলো কারাগারে প্রবেশ করছে। নির্যাতন আর কষ্টের মধ্যেই চলে রমাদান। সেটা শুধু ক্ষুধা সহ্য করা নয় বরং অপমান-অপদস্থ, লাঞ্ছনা-যন্ত্রণা সহ্য করাও। তার সাথে যোগ হতো মানসিক চাপ, প্রলোভন প্ররোচনা এবং অন্তহীন জবাবদিহিতা।

মনে হতো আকাশটা ভেঙে নিচে পড়ে গেছে। তার নিচে চাপা পড়েছি আমি। দম আমার যায় যায়। আমাদের এখানে, গুয়ান্তানামোর নির্যাতকরা বেহুঁশ, উন্মাতাল। নির্যাতন করেই যেত। যতক্ষণ না নির্যাতিতরা নির্যাতন সইতে না পেরে তাদের পায়ে লুটিয়ে পড়ে। যতক্ষণ না তাদের সকল প্রতিবাদশক্তি নিঃশেষ হয়। যতক্ষণ না দেহগুলো নিথর হয়।

আমরা প্রথম রমাদানের প্রস্তুতি নিই। প্রহরীদের বলে দেই সন্ধ্যা নামার পূর্ব পর্যন্ত আমরা কিছুই খাব না। ইচ্ছে করেই তারা আমাদের খাবার সবসময় একটু দেরিতে দিত। মাগরিবের আযান শোনার চার ঘণ্টা পর আমরা খাবার পেতাম। রমাদানের খাবার প্যাকেট করে দিত না। তারপরও দুঃখজনকভাবে সেটার পরিমাণ তখন অনেক কমে যেত। রমাদানের প্রথম ও শেষ দিনগুলো অনেক কষ্টে যায়। পবিত্র মাসের শুরুতে ও শেষে চাঁদ দেখার

প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমাদের সবগুলো ব্লক তা দেখতে পেত না। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ক্যাম্পের লোকেরা দেখতে পেত। কিছু ক্যাম্পের লোকেরা সূর্য-চন্দ্র দুটোই দেখতে পেত। আমি তাদের মধ্যে নেই। এই দ্বিধাদ্বন্দ্বে আমরা ৩০টি দিন রোজা রাখি। বছরের শ্রেষ্ঠ দিনগুলো পার করি।

প্রথম রমাদান হতেই প্রশাসন শাস্তির নতুন বিন্যাস প্রকাশ করে। যার বিবরণ আমি আগেও দিয়েছি। সেই বিন্যাসের মূল কথা হলো কোন কয়েদীকে অসদাচারণের (!) কারণে, মৌলিক অধিকার চাওয়ার কারণে, অথবা জিজ্ঞাসাবাদকারীকে সহায়তা না করার কারণে নির্যাতন করা। তারা আমাদের উপর বিভিন্ন মাত্রার শাস্তি প্রয়োগের প্রতিযোগিতা করত। এসব দেখে আমরা আর শাস্তির মাত্রা নিয়ে প্রশ্ন তুলতাম না।

এই প্রশ্ন না তোলার সুযোগে তারা বন্দিদেরকে ভিন্নভিন্ন মাত্রায় শাস্তি দিত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। তারা ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়তার মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন শাস্তি দিত। লেভেল-১ শাস্তি দেয়া হতো প্রথম ক্যাম্পের কারাবন্দিদের। আমাকে দ্বিতীয় ক্যাম্পে স্থানান্তরিত করা হয়। হাম্মাদ রশিদ ও মুহাম্মাদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে যাই।

দ্বিতীয় ক্যাম্পের কিলো ব্লকে আমি মাত্র দুইদিন ছিলাম। তৃতীয় দিন যখন আমাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন একজন আমার নাম ধরে ডাকল। তিনি ছিলেন জামাল আবু ওয়াফা। একজন ইয়ামেনী নাগরিক। তিনি আজারবাইজানে হারামাইন ফাউন্ডেশনের পরিচালক ছিলেন। যাই হোক, আমি তখন তাকে চিনতে পারিনি। দুদফা তার সাথে কথা হয়। প্রশ্ন করি, "কেন তারা আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছে?"

আমি তার উত্তর শুনতে পাইনি। কারণ সৈন্যরা আমাকে নিয়ে দ্রুত ছুটছিল। বুঝতে পারলাম যে আমাকে লেভেল-৪ এর ট্যাঙ্গো ব্লকের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। প্রশ্ন করলাম, "কেন আমাকে লেভেল-২ থেকে লেভেল-৪ এ নেয়া হচ্ছে?

সৈন্যরা উত্তরে বলল তারা এর কারণ জানে না। তাদেরকে শুধু কাজের আদেশ করা হয়েছে। বাস্তবায়ন নীতি নিয়ে ভাবতে নয়। ট্যাঙ্গোতে আমি একদিন ছিলাম। এরপর আমাকে সিয়েরা ব্লকে নিয়ে যাওয়া হয়। বন্দিরা একইভাবে বিভিন্ন দেশের। আমার প্রতিবেশী সৌদি আরবের আব্দুর রহমান আল ওমারি। আলজেরিয়ান একজনও সেখানে ছিল। তার নাম শায়খ আল

মাতি। তিনি একজন ধর্মীয় পণ্ডিত। পড়াশোনা করেছেন সিরিয়ায়, অন্যান্য অনেক দেশে।

শীঘ্রই আমি বুঝতে পারলাম কেন আমাকে লেভেল-৪ এ নিয়ে আসা হয়েছে। আমাকে এখানে আনার কারণ আমার জিজ্ঞাসাবাদকারীর সাথে বিবাদে জড়ানো। বিবাদে জড়ানো মানে তাদের মনমতো কাজ না করা। গুপ্তচরের চাকরি না করা। কিন্তু তারা পুরোপুরি হতাশও নয়। একদিন আমাকে নিয়ে গেল জিজ্ঞাসাবাদে। জিজ্ঞাসাবাদকারী একজন আরব। কুয়েতি টানে কথা বলেন। নিজের পরিচয় দিলেন আদিল নামে। বললেন, "আমি ইরাক থেকে এসেছি। কিন্তু থাকি কুয়েতে।"

আমরা কথা বললাম। বললেন এক সময় তার সাথে মার্কিনিদের একটা ঝামেলা হয়। তাকে সতেরো মাস আটক করে রাখা হয়। এরপর তাদের সাথে একজন দোভাষীর কাজ করতে অফার করা হয়। এর বিনিময়ে তিনি মুক্তি, মুক্তির স্বাদ দুটোই পাচ্ছেন।

জিজ্ঞাসাবাদের সে কক্ষে একজন নারী সেনা অফিসারও ছিল। রাগে সে কটমট করছিল। চোখমুখ আগুন। নিষ্ঠুর আর প্রতিশোধের অভিব্যক্তি। সে বলল, "তুমি কয়েদী নম্বর ৩৪৫। আমি তোমার কাগজপত্র ঘেটে দেখেছি। তোমার সাথে আমাদের আসলে তেমন ঝামেলা নেই। তুমি এখানে ভুল করে চলে এসেছো। আমরা সে ভুলের যবনিকা টানতে চাই। তোমাকে মুক্তি দিতে চাই।"

আমি চুপচাপ শুনছিলাম। সে বলে চলল: "আমাদের সামান্য কিছু কাজ করতে হবে। আমরা সেটা করব তোমার কাগজপত্র নিয়ে, আরো কিছু কাজ করার পর।"

জিজ্ঞেস করলাম, "সামান্য কিছু জিনিস বলতে কী বোঝাতে চাচ্ছেন?"

"তুমি কি আমাদের সাথে কাজ করতে সম্মত নও?" নারী সেনা অফিসারটি জিজ্ঞেস করল।

"আপনি কোন কাজের কথা বলছেন?"

"আমাদের সাথে কাজ করা মানে আমাদের সাথে কথা বলা। এখন যেভাবে বলছেন।"

"না, আমি বলিনি আমি আপনাদের সাথে কাজ করব। আমি এখন আপনাদের সাথে কোনো কাজ করছি না। কিভাবে ধরে নিলেন আমি আপনাদের সাথে কাজ করব?

"তুমি কি বল নি তুমি আমাদের সাথে সহযোগিতা করবে?"

"সহযোগিতার অর্থ ভিন্ন। আমি আপনাদের জিজ্ঞেস করা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সহযোগিতা করব। কিন্তু আপনাদের সাথে কোনো প্রকারেই কাজ করব না।"

"তুমি কি বুঝে শুনে বলছো?"

"হ্যাঁ"।

"আশ্চর্য"। নারী অফিসারটি বলে চললেন, তারা (কারা কর্মকর্তারা) আমাকে বলেছে তুমি কাজ করবে। তোমার সাথে যেন একটা মিটিং করি। তুমি নাকি আমাদের সাথে কাজে নেমে পড়তে প্রস্তুত হয়ে আছো।

"না, আমি এরকম বলিনি। আমি শুধু আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য প্রস্তুত আছি। সে প্রশ্ন আমাকে নিয়ে, আমার অন্যান্য কাগজপত্র নিয়ে।"

"আচ্ছা ঠিক আছে। সম্ভবত কোনো ভুল হয়েছে। আমাকে বলা হয়েছে তুমি নাকি আমাদের সাথে কাজ করতে প্রস্তুত আছো। আর প্রস্তুতি নিতে গেলে কি কি জিনিস জানতে হবে সেসব জানাতেই মূলত আমার আসা।"

"মনে হয় কোনো ভুল তথ্য পেয়েছেন আপনি। অথবা কোন ভুল কেস ফাইল আপনার হাতে পড়েছে", বললাম।

"না, তারা আমাকে বলেছে কয়েদী ৩৪৫ আমাদের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছে", নারী সেনাটি বলল।

"আপনার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে আবারো যোগাযোগ করে যাচাই করে নিন। আমি আপনাদের সাথে কাজ করতে প্রস্তুত নই।"

তারা আমাকে আমার সেলে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। পরে তারা আবার আমাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকে। এবার আসে আরেকজন নারী অফিসার।

বলে, "আমি তোমাকে একটি বিষয় জিজ্ঞেস করতে এসেছি। তোমার কেনো সমস্যা আছে? (থাকলে বলো) আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই।"

বললাম, "আমার একমাত্র সমস্যা আমি এখানে বন্দি। এই গুয়ান্তানামোতে।"

"হ্যাঁ, আমি জানি এটা একটা সমস্যা। আমরা সেটা সমাধানের চেষ্টা করছি। তুমি শীঘ্রই তোমার পরিবারের কাছে ফিরে যাবে। আমরা তোমার সাথে আগামী সপ্তাহে আবার সাক্ষাত করব। বিশেষ কোনো খাবার আছে যেটা তুমি খুব পছন্দ করো?"

আহ্! এ এক দুর্বলতা আমাদের। জিজ্ঞোসাবাদকারীরা এই দুর্বল জায়গায় আঘাত করে। ক্যাম্পে যে খাবার আমাদের দেয়া হয় তা খুবই সামান্য, মানহীন, অপর্যাপ্ত। আর আমরা সব সময় জানতেও পারতাম না এ খাবার কিসের তৈরি! জিজ্ঞসাবাদকারীরা আমাদের ভালো খাবারের প্রলোভন দেখায়। ক্ষুধার্ত, অসহায় কয়েদীদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে।

"না, আমার কিছু প্রয়োজন নেই," বললাম।

"কিছু একটা বলতেই হবে", সে জোর দিয়ে বলল।

"তাহলে দিন একটা কিছু। আপনাদের যা মনে চায়।" বললাম।

"যা দেব তাই খাবেন?" সে বলল।

আমি কোনো গোস্ত খেতে চাই না। কারণ, জানি না এই গোস্ত হালাল কিনা। শরিয়তসম্মত উপায়ে জবাই করা কিনা!

বললাম, "কিছু মাছ ও সবজি দিতে পারেন।"

"আমরা আপনার জন্য সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করব," সে বলল।

"দু'সপ্তাহ পর, তারা আমাকে আবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠায়। বলে, আমার জন্য কিছু মাছ নিয়ে এসেছে। কক্ষে প্রবেশ করলাম। তারা আমার সামনে রান্না করা মাছ নিয়ে এলো।

"আপনারা কী করছেন?" তাদের বললাম।

তারা বলল, "আমরা আপনাকে রেখে যাচ্ছি যাতে আপনি পছন্দমতো খেতে পারেন।"

"আমি রোজা রেখেছি", বললাম।

"কোনো সমস্যা নেই, আমরা খাবার রেখে দিচ্ছি। কখন রোজা ভাঙবেন?"

"রোজা ভাঙবো সূর্যাস্তের পরপর। কিন্তু এ খাবার আমার দরকার নেই। আমরা যে খাবার পাই তাই যথেষ্ট।"

"না, আমরা আপনাকে খাওয়াব। আপনার রোজা ভাঙার সময় খাবার তৈরি করে দেব।"

সূর্য ডোবার আধাঘণ্টা আগে তারা আবার আমাকে আমার সেল থেকে বের করে নিয়ে যায়। শায়খ মাতিকে আমার সাথে ঘটা সব কিছু বিস্তারিত বললাম। সব শুনে তিনি বললেন, "সামি, এসব আল্লাহর পক্ষ হতে রহমত। আল্লাহর নাম নাও আর খাও। আর তোমার উপর জুলুমকারীদের বিচার চেয়ে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাও।"

আমি গেলাম। খাবার প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। মাছ ও সবজির পাশাপাশি রাখা হয়েছে মিষ্টি, চকোলেট, জুস এবং ফল। গ্রেপ্তারের পর এটাই ছিল আমার প্রথম তৃপ্তি সহকারে খাবার গ্রহণ। আমি সংকোচ বোধ করলাম না। ক্ষুধায় কাতর। দুর্বল শরীর। তাই পেটপুরে খেলাম। আমার উপর জুলুমকারীদের মুখ কখনো ভুলতে পারব না। তাদের ফায়সালা আল্লাহর কাছে সমর্পণ করলাম।

খাওয়া শেষে যখন আমি আমার সেলে চলে আসলাম দেখলাম তখন মাত্র আমার সহকয়েদীদের খাবার দেয়া হচ্ছে। সৈন্যরা জানত আমি সবেমাত্র খেয়ে এসেছি। আমাকে নিয়ে আসার সময় তারা আমার খাওয়া নিয়ে বলাবলি করছিল। তারা আমাকে ফিসফিস করে খেয়ে আসার ব্যাপারটা গোপন রাখতে বলল। যাতে বন্দিরা আমার ব্যাপারে কোনো ধারনা করতে না পারে।

বললাম, "ঠিক আছে, আমি আবার খাব।"

একাকী কয়েদী

আমার স্ত্রীর পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। সে আমার দিকেই আসছে। "তুমি এখনো জেগে আছো সামি!" হাঁক ছাড়ল। রাতের পাখিটি জানালার পাশে সুর তুলেছে।

"হ্যাঁ, আজ রাতে স্মৃতির ঝাঁপি খুলে গেছে আমার।"

"তাই! কাগজ কলম আমার হাতে দাও। স্মৃতির ঝাঁপিটা আমাকে দাও। আমাকে বলো সব। তোমার হাত দিয়ে লিখতে হবে না।"

"না, বিছানায় চলে যাও প্লিজ! আমি ভালো আছি। এখনো অনেক কিছু লেখার বাকি।"

আমাদের কথপোকথন রাতের পাখিকে বাগড়া দিয়েছে। সে ডানা ঝাপটিয়ে উড়াল দিল। আমার স্ত্রী বলল, "না, আমাকে তোমায় সাহায্য করতে সুযোগ দাও। আমাকে বলো। আমি লিখি। আমি আরবি জানি। লিখতেও জানি ভালো।

সে জোর করল। কিন্তু আমি তাকে সারারাত জেগে থাকতে দিতে চাই না। আবার তার সাহচর্যও আমি চাচ্ছিলাম। তাই বললাম, "ভালো। কলম নাও। লেখা শুরু করো..."

গুয়ান্তানামো থেকে মুক্তি পাওয়া প্রথম দলটির কথা চাউড় হলো। অধিকাংশই আফগানি। আল্লাহর ফজলে সে দলের একজন হাজি ফয়জুল্লাহ।

বয়স আশির উপরে। লিমা ব্লকে সে আমার প্রতিবেশী ছিল। একজন ক্ষীণকায় দুর্বল মানুষ। অশীতিপর বৃদ্ধ। শুরু থেকেই সে আমার সাথে আছে। সে তার খাবারের প্যাকেটটাও খুলতে পারত না। নিজে নিজে ঠিকমতো চলতে পারত না। এমনকি সৈন্যরাও অবাক হয়ে যেত, "যে মানুষ নিজের কাজ নিজে করতে পারে না সে কিভাবে আমাদের শত্রু হয়? কিভাবে আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ (নির্যাতন) সহ্য করবে?"

হাজি নিজের বিছানা নিজে পরিষ্কার করতে পারত না। যখন সে তার প্রকোষ্ঠ থেকে বাথরুমে যেত তখন আমাদের কোনো কোনো ভাই নিজেরা সৈন্যদের কাছে তার বিছানা পরিষ্কার করে দেয়ার জন্য অনুমতি চাইত। আল্লাহ তাদেরকে উত্তম জাঝা দিন।

সে দলটি গুয়ান্তানামো ত্যাগ করার পর আমি জিজ্ঞাসাবাদকারীদের প্রশ্নের উত্তর দেয়া বন্ধ করে দিলাম। তারা জিজ্ঞেস করে, "কেন তুমি আমাদের প্রশ্নের উত্তর দাও না?"

বললাম, তোমরা বলেছিলে, "গুয়ান্তানামো ত্যাগকারী প্রথম দলের একজন হব আমি। কিন্তু প্রথম দল তো চলে গেল। আমি তাদের মধ্যে নেই কেন?"

তারা বলল সে দলটি শুধু আফগানিদের। আরবদের জন্য একটি দল হবে সে দলে আমি থাকব। আমি তাদের কথা বিশ্বাস করলাম না। সেদিনই সব বিশ্বাস ভেঙে গিয়েছে ওদের প্রতি।

কিছু দিন পর কয়েকজন সৈন্য মিলে একজন কয়েদীকে অত্যাচার করা শুরু করল। গভীর ঘুম থেকে তারা তাকে জাগিয়ে তুলত। অতি তুচ্ছ কাজ করাত। সাবানের টুকরা চারিদিকে ছড়িয়ে রাখা কিংবা এ জাতীয় হাবিজাবি কাজের আদেশ দিত। চিৎকার করে হাঁক ছাড়ত তার দিকে মুখ করে। তারা তার সবকিছু তল্লাশী করত। এসময় একজন সৈন্য তাকে নির্দয়ভাবে পেটাতে থাকত। অথচ তার শারীরিক অবস্থা এমন যে তাকে পেটানো উচিত না। আমি এ নির্মমতা সহ্য করতে না পেরে প্রতিবাদ করলাম। ফলে আমাকে টেনে হিঁচড়ে একটি একক প্রকোষ্ঠে নিয়ে রাখা হয়।

অস্কার নামের একক কয়েদখানাটি বেশ জনবিচ্ছিন্ন। সেসময় প্রথমবার এখানকার অভিজ্ঞতা লাভ করি। তারা আমার মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলে। দাড়ি, গোঁফও শেভ করে দেয়। দু'সপ্তাহের মতো সেখানে বন্দি রাখে। সেখানে

আমি যাদের সাথে কথা বলতাম সেলের দরজায় এসে বলতাম। আমরা একে অপরকে দেখতাম না। কানাডা থেকে কেউ একজন সেখানে ছিল। কেউ ছিল অস্ট্রেলিয়ার। কেউ সৌদি আরবের। আবু যিয়াদ আল ঘামাদি এবং সুলতান আল মাদানি ছিল সৌদির।

একে অপরের সাথে পরিচিত হই। তাদের দরজা খোলার সময় একবার এক ঝলক দেখেছিলাম। তারা সেখানে সন্ধ্যায় আমাদের খাবার দিত। জানালা দিয়ে। তখন একটু কথা বলা যেত। ছোট জানালা; তিন বাই পাঁচ ইঞ্চি। সেখান দিয়ে শুধু ছোট একটি প্লেট ঢুকতো।

দু'সপ্তাহ পর তারা আমাদের অন্য আরেকটি একক প্রকোষ্ঠে স্থানান্তরিত করে। সেখানে আরেকজন বন্দিকে পাই। মদিনার শাকেরকে। আমি মনে করতাম শাকের কান্দাহার ও বাগরাম থেকে এসেছে। সে আসলে একজন মানবাধিকার কর্মী যে কিনা ইংল্যান্ডে সপরিবারে বসবাস করত। পাকিস্তানি এক নারীকে বিয়ে করেছে। সে ভালো ইংরেজি জানে। আমেরিকানদের ভাবভঙ্গি ভালই বোঝে। অন্য আরেকটি ব্লক পরিচ্ছন্ন করে তাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে। টানাহেঁচড়া করে সৈন্যরা তাকে সেখানে নিয়ে যাবার সময় তার কথা শুনেই আমরা বুঝেছি সে কে!

যখন আমরা বুঝতে পারলাম যে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, আমরা অবাধ্য হয়ে উঠলাম। ধাতব দরজায় আঘাত করা শুরু করলাম। ফলে একজন অফিসার আসে পরিস্থিতি দেখার জন্য। আমরা তাকে তখন বললাম আমরা শাকেরের স্থানান্তর মানি না। আমরা আন্দোলন করতেই থাকলাম যতক্ষণ না শাকেরকে আমাদের সাথে রাখা হয়। এরপর আমরা শাকেরসহ সেখানে বেশ কিছুদিন ছিলাম।

দুই দিন পর শাকের আমাদেরকে বলে যে সে সৈন্যদের একটি শব্দ শুনে ফেলে। যে শব্দ তারা শুধু বিপজ্জনক অবস্থা বোঝাতে ব্যবহার করে। এরপর কী ঘটেছে বোঝার চেষ্টা করে শাকের। রাতের খাবার শেষে সে বলে, "ভাইয়েরা, মনে হয় একজন কয়েদী মারা গেছে। সৈন্যরা বলেছে সে সৌদির। ইন্ডিয়া ব্লকের একক সেলে বন্দি ছিল। মার্কিন সেনারা বলছে সে আত্মহত্যা করেছে।"

সেদিন জানালাগুলো খোলা রাখে তারা। সৈন্যরা তাদের টহল বাড়িয়ে দেয়। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। জানালা দিয়ে উঁকি দেয়। সম্ভবত

আমরা কি বলি তা আড়ি পেতে শোনার চেষ্টা করে। একজন অফিসার আসে। বলে, "তোমাদের এক কলিগ বাইরের হাসপাতালে আছে। দোভাষী বিস্তারিত বলবে। সে পুরো খবর নিয়ে এসেছে।"

দোভাষী কিছুক্ষণ পরে এল, "তোমাদের একজন সৌদিয়ান কলিগ আত্মহত্যা করেছে। সৈন্যরা তাকে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন। কিন্তু ডাক্তাররা তাকে ক্লিনিক্যালি মৃত ঘোষণা করেছেন। বর্তমানে সে লাইফ সাপোর্টে রয়েছে। তার অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক।"

ঘটনাটি নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম। সবাই একমত হলাম যে, কী ঘটেছিল তা আমাদের নিশ্চিত জানতে হবে। আমরা জানি না সৈন্যরা আমাদের কথপোকথন শুনছে কিনা! নাকি এটি পরিকল্পিত কোনো ঘটনা। কিন্তু তারা তখন ইন্ডিয়া ব্লকের এক কয়েদীকে নিয়ে আসে যে ঘটনার সময় সেখানে ছিল। তার নাম আহমদ আল মাগরিবি আবু ওমরান। সে আমাদের ঘটনা বিস্তারিত খুলে বলে, "মৃতের নাম মাশাল। সে মদিনার এক যুবক। সে খুব রক্ষণশীল ও ধর্মপরায়ণ। সৌদির হারব গোত্রের। মাশাল যেখানে থাকত সেখানে সৈন্যরা আরেকজন কয়েদীকে নিয়ে আসে। হাম্মাদ আল তুর্কিস্তানি তার নাম। তুর্কিস্তানির সাথে এক কপি 'কুরআন মাজীদ' ছিল। তুর্কেস্তানির প্রকোষ্ঠ মাশালের প্রকোষ্ঠর বিপরীতে। সৈন্যরা তার কাছ থেকে কুরআনটি কেড়ে নেয় এবং মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে। তার মুখে আঘাত করে। সে কাঁদতে থাকে এই বলে, "তারা আল্লাহর কিতাবের অবমাননা করেছে!"

এরপরই আশেপাশের বন্দিরা তাদের দরজায় আঘাত করে এর প্রতিবাদ করতে থাকে। অবস্থা বেগতিক দেখে সৈন্যরা পুরো ব্লকে ছড়িয়ে পরে। বাতি বন্ধ করে দেয়। মাশালের সেলে তাণ্ডব চালায়। সে ছিল সেখানকার প্রত্যক্ষদর্শী। পনের মিনিটের মধ্যে মেডিকেল টিম মাশালকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে যায়। তার দেহ থেকে রক্ত ঝড়ছিল। কিছু বন্দি এ দৃশ্য দেখে ফেলে। পরিস্থিতি ঘোলাটে হতে শুরু করে। প্রতিবাদে দরজা পিটিয়ে শব্দ করা হয়। যাতে অন্য কয়েদীরা বুঝতে পারে গুরুতর কিছু ঘটেছে।

দাঙ্গা পুলিশ মোতায়ন করা হয়। তারা এসে কয়েদীদের নির্দয়ভাবে পেটাতে শুরু করে। তিনজনকে পিটিয়ে হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরদিন একটি তদন্ত দল আসে। সবাই সাদা পোশাকে। তারা ঘটনাস্থলের চিত্র নিয়ে

যায়। কক্ষটি সিল গালা করে দেয়। এরপর পুরো ব্লকটির সব কয়েদীকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়।

এরপর থেকেই কয়েদীরা মাশালের সমর্থনে সম্মিলিত পদক্ষেপ নেবার ব্যাপারে কথা বলতে থাকে। প্রশাসন সত্য ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করে। তারা মিডিয়াকে বলে মাশাল আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল। সৈন্যরা তাকে রক্ষার চেষ্টা করেছে। তারা মনে করছে তারা সত্যকে ধামাচাপা দিতে সক্ষম হয়েছে। যাহোক, আমাদের পদক্ষেপ বাস্তবায়ন হতে শুরু করে। আমাদের অনশন, প্রতিবাদ, সাংবাদিকদের কাছে বলা চলতে থাকে। বন্দিদের সাথে অমানবিক আচরণ, অমানুষিক নির্যাতনের নানা দিক তুলে ধরি। মিডিয়ায় এসব সত্য প্রকাশিত হলে প্রশাসন নড়েচড়ে বসে। কুকর্ম ঢাকতে ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ করতে শুরু করে তারা।

সেনারা বন্দিদশার নিয়মকানুন কিছুটা শিথিল করে। ক্যাম্প-৪ নির্মাণ শুরু করে। সেই ক্যাম্পে তাদেরকেই রাখা হয় যাদেরকে মুক্তি দেয়া হবে। কিছুদিন বিশ্রামের জন্য সেখানে রাখা হয়। বিশ্ব জনমতকে শান্ত করার জন্যও এর নির্মাণ হয়। তারা সে ক্যাম্প শুধু সেসব দুর্বল মানুষদের এনে রাখত যারা তাদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করতে রাজি হতো।

তারা অন্য বন্দিদের প্রলুব্ধ করত। ক্যাম্প-৪ এর সামনে দিয়ে প্যারেড করিয়ে নিয়ে যেত। অল্প কিছু লোককেই তারা তাদের দলে ভিড়াতে পেরেছিল। যারা তাদের শিখিয়ে দেয়া কথা মিডিয়ার সামনে বলত। বলত, তারা মার্কিন প্রশাসনে আরামেই আছে। তাদের মুখ মিডিয়ার সামনে আসত বারবার। তারা সাদা পোশাক পড়ত। খেলাধুলা করত। মৌজমাস্তি করত। অল্প কয়েকজন। তারা কখনোই বন্দিদের প্রতিনিধিত্ব করে না। দীর্ঘ বন্দিত্বের যাতনা তারা ভোগ করেনি।

তারা কয়েকজন মিথ্যা প্রত্যক্ষদর্শীও দাঁড় করায়। যারা জিজ্ঞাসাবাদকারীদের শিখিয়ে দেয়া বুলি আওড়ায়। সন্দেহ দূর করার নানা কসরত তারা করে। কিন্তু ফুসরত মিলে না। পৃথিবীর মানুষকে তারা ধোঁকা দিতে চেষ্টা করে। প্রত্যেককে বলে দিলাম এই কুকর্ম ঢাকার শত চেষ্টা রুখে দিতে হবে। মাশালের সাথে যা ঘটেছে তা আমাদের স্মৃতিতে আজো গেঁথে আছে।

মাশালের সাথে এই পরিস্থিতির মূল কারণ পবিত্র গ্রন্থ কুরআন অবমাননা। তাদের এই অবমাননার ঝুঁকি সত্ত্বেও আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম আমাদের যাদের কুরআন আছে হাতে রাখব। কয়েদীরা সব একমত হলো। কিন্তু প্রশাসন আশংকা করতে লাগল আমাদের এই কুরআন অবমাননার প্রতিবাদ আরো ব্যাপক হবে এবং মিডিয়ায় চলে আসবে। নতুন ইস্যু তৈরি হবে। ফলে পরিচালন নীতিমালায় পরিবর্তন আনতে তারা বাধ্য হবে। সবাইকে এক কপি করে কুরআন দিতেও বাধ্য হবে।

অবিশ্বাস্যভাবে, দাঙ্গা পুলিশবাহিনী বিভিন্ন সেলে যেতে লাগল। সেখানে 'কুরআনের' কপি রেখে আসত। কয়েদীদের পেটাত। মুখে পিপার স্প্রে করত। টেনে হিঁচড়ে সেলের বাইরে নিয়ে আসত কিন্তু সেলের ভিতর 'কুরআন' রেখে আসত। আবার এই প্রশাসনই রমাদানে সেলে কুরআন রাখতে দিত না। অথচ বলত রমাদানে মানসিক নির্যাতন একটু কম করবে। এসব খামখেয়ালির প্রতিবাদস্বরূপ আমরা আরো একটি প্রতিবাদ আন্দোলনের ডাক দিই... সাধ্যের সবটুকু দিয়ে আমরা লড়াই করে যাই। আমাদের আন্দোলন চলতে থাকে।

পাপা, ফক্সটর্ট ও মাইক

আন্দোলন পর্বের পর আমি লেভেল থ্রিতে ছিলাম। তারা আমাকে পাপা ব্লকে বদলি করে দেয়। সেখানে আমি হাম্মাদ, মোস্তফা ও আবু আহমদের সাক্ষাৎ পাই। তারা সবাই সুদানি। এছাড়া অন্যান্য কিছু নতুন ভাইও ছিল। যারা প্রথমবার গুয়ান্তানামোতে এসেছে। সেখানে আমি কিছু দিন ছিলাম। এরপর আমার প্রমোশন (!) হয়। লেভেল টু-এর ফক্সটর্ট হয় আমার ঠিকানা। এরপর অষ্টম দিনে আমাকে মাইক ব্লকে স্থানান্তর করে। মাইক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নির্ধারিত। তার মানে এটা এমন এক ব্লক যেখানে সব লেভেলের কয়েদীদের দেখা মেলে।

এক নারী জিজ্ঞাসাবাদকারী যিনি আমাকে মাইকে নিয়ে এসেছেন, জিজ্ঞেস করেন, "আমি তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি সৈন্যদের হাত হতে রক্ষা করার জন্য। আমি তাদেরকে তোমার গায়ে হাত তোলা, লাঞ্ছিত করা থেকে বিরত রেখেছি। কেউ এখানে তোমাকে কষ্ট দিতে পারবে না।

মদিনার আব্দুল আজিজ মাইক ব্লকে ছিল। যেমন ছিল মাহমুদ আল অস্ট্রালি, আদিল আল জামিল আল কুয়েতি এবং মুহাম্মদ ওয়ালিদ সালাহি। সালাহি মৌরতানিয়ান। মৌরতানিয়ার সরকার তাকে মার্কিনিদের হাতে তুলে দেয়। তাকে জর্দান দিয়ে এখানে আনা হয়। ছয় মাস নির্যাতন করা হয়। মক্কার আবু মাহা, অস্ট্রেলিয়ার ডেভিডও সেখানে ছিল।

মাহমুদ আল অস্ট্রালির গল্প সেবারই আমি প্রথম শোনার সুযোগ পাই। তাকে পাকিস্তানে বন্দি করা হয়। এরপর পাঠানো হয় মিশরে। মিশরে ভয়ংকর নির্যাতনের শিকার হন তিনি। এরপর কান্দাহারে এবং শেষে কান্দাহার থেকে গুয়ান্তানামোতে স্থানান্তর হয় তার। মাহমুদ জানান মিশরে তিনি এক পাকিস্তানির সাথে থাকতেন গুয়ান্তানামোতে যাকে আস সা'দ আল মাদানি আল পাকিস্তানি নামে ডাকা হয়। মাহমুদ তার গল্প বলা শুরু করে। মাহমুদের কণ্ঠ আজো আমি যেন শুনতে পাই। সুন্দর আরবি বলতে পারেন। পবিত্র কালামুল্লাহ্‌র হাফিজ ছিলেন। তার মানে তিনি পবিত্র 'কুরআন' স্মৃতিবদ্ধ করেছিলেন। সুললিত কণ্ঠে 'কুরআন' তেলাওয়াত করতে জানেন। পবিত্র কা'বার ইমামের মতোই।

পাকিস্তানি সা'দ আমাকে তার গল্প বলেছিলেন। আমি সাংবাদিক জেনে। তাকে মালয়েশিয়া হতে বন্দি করা হয়। সেখান হতে পাকিস্তানে নিয়ে আসা হয়। তিনি একজন কর্মচঞ্চল মানুষ। পবিত্র কুরআনের একজন ক্বারী। তাজবীদের সব নিয়ম মেনে সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করেন। তিনি পাকিস্তানি প্রেসিডেন্টের ছেলেমেয়েকেও 'কুরআন' শিখিয়েছেন। সর্বত্র তার অনেক বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী আছে। তিনি মদিনায় 'কুরআন' শিখেছেন। বিশেষ করে যখন তার পিতা সৌদি আরবে রাষ্ট্রদূত ছিলেন।

উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, এই ব্লকটি সুদানিদের একটি মিলনস্থলে পরিণত হয়। সেখানে সাক্ষাৎ পাওয়া আরো কিছু সুদানির মধ্যে আবু আহমদ, যার কথা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি। মুহাম্মদ সালিহ ও আদিল হাসানের সাথে এখানেই প্রথম দেখা হয়। চারজনই আমরা পাশাপাশি একক সেলে বন্দি ছিলাম। নারী জিজ্ঞাসাবাদকারী আমাকে জানান গুয়ান্তানামোতে মোট বারজন সুদানি কয়েদী রয়েছে। ন জনকে ছেড়ে দেবার প্রস্তুতি চলছে। তিনজনের চলছে তদন্ত, জিজ্ঞাসাবাদ। "আমি তোমাকে ফ্রি করে দিচ্ছি। যাতে সবার সাথে তুমি দেখা করতে পারো। মুক্তির আগ পর্যন্ত," নারী সৈন্যটি আমাকে বলল।

নিঃসন্দেহে আমাদের কথা বলতে দেয়ার মাঝে তাদের স্বার্থ ছিল। তারা এর মাধ্যমে আমরা কী বিষয়ে কথা বলি তা জানার চেষ্টা করবে। তারা মনে করে জিজ্ঞাসাবাদকারীদের কাছে আমরা অনেক কিছু গোপন করেছি। আর সে কথাগুলো নিজেরা আলোচনা করব। নিজেদের মধ্যে হয়তো গোপন সম্পর্ক আছে যা তাদেরকে বলিনি। আমরা একসাথে বসে তাদেরকে উপহাস করে অনেক কথা বলতাম। আমরা কল্পনা করতাম ভবিষ্যতে আমাদের কেউ সুদানের প্রেসিডেন্ট হলে কী কী করবে, কে কে মন্ত্রী হবে-এ জাতীয় অনেক কথা আমরা বলতাম। কৌতুক করতাম। সবার মাঝে একবার বললাম, "যোগাযোগ মন্ত্রী আমি হব।"

কিছুটা হাসি-তামাশা হয়েছিল মাইক ব্লকে। এরপর তারা আমাকে ফক্সটর্ট ব্লকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। দু'সপ্তাহ পর তারা আমাকে আবার ক্যাম্প-২ এ নিয়ে যায়। যেখানে আমি প্রথমে সিয়েরা পরে কিলো ব্লকে ছিলাম। সেখানে একের পর এক সমস্যায় পড়ি আমি।

কিলো ব্লকে থাকা অবস্থায় একটা খবর শুনলাম। একজন ভদ্র কয়েদীর সাথে জঘন্য আচরণ করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা এর প্রতিবাদ করলাম। ভদ্রলোকটির নাম আব্দুল হাদি। তিনি ছিলেন এমন একজন নিরীহ মানুষ যাকে অকথ্য নির্যাতন করা হয়েছে। সীমাহীন লাঞ্ছনা আর কষ্ট দেয়া হয়েছে। একদিন এক মার্কিন জিজ্ঞাসাবাদকারী তার সামনে কিতাবুল্লাহ 'কুরআন'কে পা দিয়ে পিষ্ট করে। এরপর আব্দুল হাদীকে ইজরাঈলী পতাকা বহনে বাধ্য করা হয়। সাধারণত তিনি জিজ্ঞাসাবাদে তার সাথে করা দুর্ব্যবহার চেপে যান কিন্তু ওইদিন সংকোচ সত্ত্বেও চেপে যাওয়া গুনাহ হতে পারে মনে করে সত্যটা আমাদের বলেন।

যখন আমরা এই কথা শুনলাম কেউ কেউ অনশনের ডাক দেয়ার আহ্বান জানান। কেউ কেউ আল্লাহর কিতাবের সাথে এই ধরনের ধৃষ্টতা দেখানোর প্রতিবাদে সেল ত্যাগ না করার সিদ্ধান্ত নিতে বলেন। এ ধরনের অবমাননা নতুন কিছু না। সেই কান্দাহার থেকেই দেখে আসছি। কিন্তু এ ঘটনা সহ্য করার মতো না। কোনভাবেই এটা সহ্য করার মতো না যে 'কুরআন' মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে এবং কুরআনের উপর অশ্লীল কথাবার্তা লিখে দেয়া হয়েছে। কুরআনের পৃষ্ঠার উপর তাদের জুতার ছাপ থাকবে-তা কি করে সহ্য করি!

কিলো ব্লকের কয়েদীরা আমাকে প্রতিবাদের নেতৃত্ব দিতে অনুরোধ করে। আমরা পরিকল্পনা নিলাম। পার্শ্ববর্তী ব্লকগুলো আমাদের সাথে একমত পোষণ করে যে সৈন্যরা তাদেরকে আমাদের ব্লকে আসতে বললে আসবে না। যেহেতু বন্দি-সুবিধা (Detention Facility) প্রতিদিন পর্যবেক্ষণ করা হয়। এ সময় সবাইকে সেলের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। আমরা সেলের বাইরে যেতে অস্বীকার করলাম। ছয়জন সৈন্য ধরমর করে সেলের ভিতর প্রবেশ করল। মাথায় হেলমেট পরা। সাথে কয়েকজন অফিসারও আছে।

অফিসাররা কয়েদীদের সাথে কথা বলত। যদি বলা হতো সৈন্যরা কয়েদীদের চোখেমুখে, সারা শরীরে পিপার স্প্রে করার ফলে এখন প্রচণ্ড জ্বালাপোড়া করছে। অফিসাররা এ কথা শুনে আবারো স্প্রে করত। পানির ছিটা দিত। পুরোনো জ্বালাপোড়ার সাথে নতুন জ্বালাপোড়া যোগ হতো। সেসময় তারা কয়েদীদের মারধরও করত। টেনে হিঁচড়ে সেলের বাইরে নিয়ে যেত। ভেতরে আনত। হাসতে হাসতেই তারা এসব করত।

যখন প্রতিবাদ নিয়মিত চলতে থাকল তারাও কিলো ব্লকের দিকে মনোযোগী হলো। তারপরও আমরা কয়েকদিন আন্দোলন চালিয়ে গেলাম। একদিন তারা এসে বলল, তারা আমাকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাবে। ভাইদের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলাম স্থানান্তরের বিরোধিতা আমি করব না। তাই শান্ত হয়ে তাদের সাথে বের হলাম। তারা আমাকে পেটানোর পরিকল্পনা করল। অস্কার ব্লকে নিয়ে গেল। সেখানে তারা আমাকে লোহার সিঁড়ি থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করল। আমি সিঁড়ির কলাম আঁকড়ে ধরে থাকলাম যাতে নিচে পড়ে না যাই। তারা আবার আমাকে মাটিতে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল। সেখানে অনেক ময়লা আবর্জনা, কয়েদীদের কাটা চুল, হাবিজাবি পড়েছিল। কিন্তু আমি পড়লাম না...

এক সৈন্য আমাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল। আমার হাত তখন মাথার উপর। মাটিতে ফেলে দেয়ার কারণ যাতে তারা আমার হাত পা বেঁধে ফেলতে পারে। মেঝেতে আমি উপুর হয়ে পড়ে গেলাম। দু'হাত মাথার উপর বাঁধা থাকায় তেমন কিছু করতে পারিনি। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়লাম, যখন তারা আমার চোখেমুখে একপ্রকার গ্যাস স্প্রে করে। যে সৈন্য আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল সে এবার লাথি ঘুসিও মারল।

তারা আমার মাথার চুল, মুখের দাঁড়ি, গোঁফ চেছে দেয়। একটি নির্জন কক্ষে নিক্ষেপ করে। পায়ের বেড়ি খুলে দেয় কিন্তু পেটাতে শুরু করে। একপর্যায়ে দশজন মিলে আমাকে পেটায়। শরীরে অসংখ্য জখম রেখে যায় তারা। জখম থেকে দরদর করে রক্ত ঝরতে থাকে। সবাই চলে যায়। দরজা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু জানালায় চোখ রাখে।

আমি নিথর বসে থাকি। যখন তারা লক্ষ্য করল যে আমার রক্ত ঝরছে, আল্লাহকে ডাকছি। তখন ডাক্তার ডেকে আনে হাসপাতাল থেকে। জানালার পাশে এক অফিসার এল কি হয়েছে দেখার জন্য। কিন্তু মুখ আর জামাকাপড় রক্তে মাখামাখি হওয়ায় সে ভালো করে দেখতে পায়নি। সে জানালার কাছে যাবার জন্যে বলল। আমি তার কথা অগ্রাহ্য করি। সৈন্যরা সেলের ভিতর আবারো হামলা করতে উদ্যত হলো কিন্তু সে নিষেধ করল।

সেভাবেই বসে থাকলাম। দরজার কাছে যাবার মতো শক্তিও ছিল না। ডাক্তার এল। জানালার পাশে। জানালার ছোট ফাঁক দিয়ে তার হাত

ঢোকাল। মাথার কাটা অংশে সেলাই করল কোনোমতে। কিন্তু রক্ত ঝরা থামছেই না।

সেভাবেই কেটে যায় তিন দিন। চতুর্থ দিন, তারা আমাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যায়। আমি কথা বলতে অস্বীকৃতি জানাই। জিজ্ঞাসাবাদকারীরা আমার শরীরের জখম দেখে হাসপাতালে নিয়ে যাবার পরামর্শ দেয়। সৈন্যরা ক্লিনিকে নিয়ে যায়। জখমগুলোতে ব্যান্ডেজ বেঁধে দেয়। সার্বিক অবস্থা আলাদা ফাইল করে রাখে। কিন্ত একজন সৈন্যকেও প্রশ্ন করা হলো না কেন তারা আমাকে এতটা জখম করেছে।

উল্টো আমাকেই দোষারোপ করা হলো কেন আমি সৈন্যদের সাথে বিবাদে জড়িয়েছি? কিভাবে আমি বিবাদে জড়াতে পারি যেখানে আমার হাত পা বাঁধা ছিল? আমি যা করতে পারি তা হলো তাদের আদেশ মানতে অস্বীকার করা। সৈন্যরা আমাকে মেরেছিল কারণ তাদের ভাষায় আমি আমার ভাইদের ব্লকে অস্থিরতা তৈরি করতে প্ররোচিত করেছিলাম। তার শাস্তি ছিল ওই মারধর।

আমি ব্যথায় কাতরালাম দু'সপ্তাহ। নির্জন কক্ষে। প্রচণ্ড শীত। জখমগুলো ফুলে ওঠে। কোনো কোনোটাতে পুঁজ হয়ে যায়। দু'সপ্তাহ পর তারা আমাকে ট্যাঙ্গো ব্লকে বদলি করে। এরপর সিয়েরা ব্লকে। সিয়েরায় কয়েক মাস থাকা হয়। সেখান থেকে বদলি করা হয় পাপা ব্লকে। পাপার পর আসি ফক্সটর্টে। ফক্সটর্ট লেভেল-২ এর একটি ব্লক। এখানে আমি দীর্ঘদিন ছিলাম।

ফক্সটর্টের পর আবার মাইকে আনা হয় আমাকে। মাইক সেই ব্লক যেখানে আমি উগান্ডার জামালের সাথে মিলিত হই। জামাল ইংল্যান্ডে বসবাস করত। কিছুদিনের জন্য সে আমার প্রতিবেশী ছিল। আমাদের অন্য প্রতিবেশি হলেন মুহাম্মদ আল কারানি। কারানি একজন তরুণ। মদিনায় জন্ম। বেড়ে ওঠে পাকিস্তানে।

আমরা ছিলাম সমমনা ভাই ব্রাদার। এ কারণে নয় যে আমরা একইরকম বন্দি বা একইরকম নির্যাতন ভোগ করছি। এর কারণ, আমাদের একই রকম গায়ের রং। সৈন্যরা আমাদের বর্ণবাদী ডাকে ডাকত। যখন তখন বলে উঠতো "নিগ্রো"।

বসে থাকা

রাত গভীর হয়। স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতি জাগে আমার। হাতে কাগজ কলম নিই তার থেকে। টেবিলে বসে পড়ি। স্ত্রীকে বলি, "যদি চাও বিশ্রামে থাকি তবে তুমি ঘুমোতে যাও।"

দরজা বন্ধ করে দিই। আমার কাজ শুরু করি। ধ্যানমগ্ন আরব্য রজনী। দুর্বল পাখিটি কোথা থেকে যেন চলে আসে। জানালার পাশে এসে চুপটি করে বসে। গান ধরে।

গুয়ান্তানামোর বর্বর নিষ্ঠুরতার কথাই শুধু স্মৃতিতে ভিড় জমায়। যেখানে জেলাররা সহিংসতার জন্য মুখিয়ে থাকে। আমাদেরকে পেটানো হয় যেন আমরা তাদেরকে মৃত্যুর হুমকি দিয়েছি। আমাদের দুর্বল শরীরের জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেলার পর হাতে পায়ে শেকল পরানো তাদের প্রিয় কাজ। চোখের সামনে কয়েদীদের উলঙ্গ করে রাখা যেন পরম আনন্দের বিষয়। একবার জুমাহ আল দুসারি নামের একজনের পোশাক খুলে নিয়ে রেখে দেয় দুই মাস। মনে হচ্ছিল তারা একজনের উপর শাস্তি প্রয়োগ করে বাকিদের শেখাতে চায়। যদি তারা এতে ভালো ফল পায় তাহলে সবার উপরেই তার প্রয়োগ ঘটাবে।

রোমিও ব্লকটি মূলত পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানোর জন্যই প্রস্তুত করা হয়েছে। ৪৮টি সেল এখানকার সম্পূর্ণ নির্জন কক্ষ। ভিতর থেকে আমরা বাইরের কিছুই দেখতে পেতাম না। ঘন লোহার জালি দিয়ে জানালা মোড়ানো। ভিতরে চতুর্দিক হতে বাতি জালানো থাকত। প্রায় উলঙ্গই থাকতে হতো। পরনে থাকত শুধু একটি ছোট জাঙ্গিয়া। টয়লেটে শুধু একটি ছোট পানির নল থাকত। এই লেখা পড়ে কষ্ট পাবেন না যেন, সে পানি দিয়েই টয়লেট সারা এবং খাবার পানি হিসেবে ব্যবহার করতে হতো। এ কথা শুনেও কষ্ট পাবেন না যে, আমাদের খাবার দেয়া হতো টয়লেট পেপারে করে। খাবার মানে একটু ময়দার দলা ভাজা, সাথে সবজি। তাতে না আছে কোনো স্বাদ না আছে গন্ধ।

রোমিও বানানোর পর পার্শ্ববর্তী ব্লক থেকেও বন্দিদের এখানে বদলি করা হতো। যখন রোমিওর অবস্থা অন্য বন্দিদের কাছে জানাজানি হয়ে গেল সবাই এটা নিয়ে কথা বলতে শুরু করল। কিভাবে সেই ভয়ংকর, উলঙ্গ হয়ে থাকা, লাঞ্ছনাকর পরিস্থিতি, সর্বোপরি আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি অবমাননাকর নিয়মকানুনের প্রতিবাদ করা যায় এ নিয়ে সবাই কথা বলতে লাগলাম। একদিনের আলোচনা শেষে কয়েদীরা সবাই একমত হলাম সেখানে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত মেনে নেব না, প্রতিবাদ জানাবো।

এমনকি আমি চিন্তা করলাম, বসে থাকলে কাজ হবে না প্রয়োজনে শক্তি খরচ করব। হয়তো প্রহরীরা আমাদের কিছু মারধর করবে। কিন্তু উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন সহজ হবে। অল্প কয়েকজন এর বিরোধিতা করল। আমরা এগিয়ে গেলাম। আন্দোলনের তীব্রতায় পুরো ক্যাম্প অচল হবার দশা। প্রশাসন দাঙ্গা বাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল। দাঙ্গাবাহিনীর পিটুনি আর হিংস্র আচরণে আমরা ক্ষতবিক্ষত হলাম। আমার হাত পা ভেঙে গেল। মুখচোখ ফুলে দ্বিগুণ আকৃতি ধারণ করল।

তারপরও আন্দোলন চালিয়ে গেলাম। ওরাও নির্যাতন করে গেল। এভাবে একমাস কেটে গেল। নির্যাতনের নিত্যনতুন স্টাইল নিয়ে হাজির হতে লাগল ওরা। আমার দুই হাতে গুলি করে। আশেপাশের সবাইকে এই অবস্থা করে। দিন রাত আমি শুধু ব্যথার গোঙানি শুনতাম। রক্ত ঝরতে দেখতাম। অন্যায়ের কোনো সীমা-পরিসীমা ছিল না। তাদের হাত পা নির্যাতন করতে গিয়ে ক্লান্ত হতো না।

আইসিআরসি কর্মকর্তারা আমাদের দেখতে আসে। কিন্তু তাদের পর্যবেক্ষণ এখানকার সেনা কর্মকর্তাদের নজরদারির বাইরে যেতে পারেনি। তারা স্বাধীনভাবে কয়েদীদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেনি। আইসিআরসির সাথে আমাদের কথাবার্তা সব অরণ্যে রোদনে পরিণত হয়।

২০০৩ সালের শেষের দিকে একটু আশার আলো দেখতে পাই। সুদান থেকে একটি প্রতিনিধি দল আসে আমাদের দেখতে। সৈন্যরা আমাকে জিজ্ঞেস করে আমি তাদের সাথে সাক্ষাত করতে চাই কিনা। চাইলে জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষে নিয়ে যাবে। রাজি হলাম। তারা আমার হাতের হ্যাণ্ডকাফ খুলে দিল কিন্তু পায়ের লোহার শেকল খুললো না।

দুজন সুদানি প্রতিনিধি। পুরুষ। একজন উসমান আরেকজন খালেদ। কথার শুরুতে আমি তাদের বললাম, আপনাদের পরিচিতিমূলক কাগজপত্র দেখান। এই গুয়ান্তানামোতে বিভিন্ন জাতীয়তার লোকজন দেখেছি; তেমনি স্বগোত্রীয় বিভিন্ন চরিত্রের লোক দেখেছি। সুদানি অনেকে আমেরিকার পক্ষ হয়ে কাজ করছে। আমি প্রতিনিধিদলকে ভৎর্সনা করলাম; কেন তারা এতদিন পর দেখা করতে এসেছে! যেখানে অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিরা সেই ২০০২ সাল থেকেই আসছে।

উসমান তাদের পাসপোর্ট আনতে গেল। খালেদ বসে থাকল। আমার সাথে সুদান নিয়ে হালকা কথাবার্তা বলা শুরু করল। তখন ছিল ২০০৩ সাল আর আমি দীর্ঘদিন পর সুদান সম্পর্কে শুনছি। খালেদ আমাকে নিশ্চিত করল যে, সুদানে সবকিছু ভালোই যাচ্ছে। তেল রপ্তানি শুরু হয়েছে। সেখান থেকে ভালো আয় হচ্ছে।

আধঘণ্টা পর উসমান কাগজপত্র নিয়ে এলেন। নিশ্চিত হলাম তারা সুদানি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে এসেছে। সুতরাং কাজের কথা বলা উচিত। "আমরা এসেছি আপনার অবস্থা জানতে। কেন আপনি এখানে-এই সত্য খুঁজতে।"

আমি তাদেরকে পুরো ঘটনা খুলে বললাম। কিভাবে আটক হই, কিভাবে গুয়ান্তানামোতে আসি এসব। তাদেরকে বন্দিজীবনের অবস্থাও বর্ণনা করলাম। জিজ্ঞাসাবাদের ধরন বললাম। বললাম, কিভাবে আমাকে প্রশাসন মুক্তি দেবার কথা বলে সময় পার করছে।

তারা মনোযোগ দিয়ে শুনল। এরপর বলল, "আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়েছে। আমরা যত দ্রুত সম্ভব আপনাকে এখান থেকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করব।"

তারা সেই যাত্রায় কিছুই করতে পারেনি। এ ছিল তাদের শুধু এসে অবস্থা দেখে যাওয়া। এ স্থান ত্যাগ করার সাথেসাথে তারা এ বিষয় বেমালুম ভুলে যায়। অন্য সুদানিদের ব্যাপারেও তাদেরকে বলি। আমাদের সাথে করা অবমাননাকর সব আচরণ, উলঙ্গ করে শুধু জাঙ্গিয়া পরিয়ে রাখা, পবিত্র 'কুরআন' অবমাননার কথা সব বলি। যা বলি সত্য বলি। স্পষ্ট করে বলি। সংক্ষেপে বলি।

তাদেরকে মার্কিনিদের সাথে কাজ করার প্রস্তাবের কথাও বলি। বললাম, সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি। তারা এখনো আমাকে কাজের প্রস্তাব দিয়ে যাচ্ছে। আমিও সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে চলেছি। সাক্ষাৎকারের শেষ পর্যায়ে তারা আমাকে বলে কোনো চিঠিপত্র যদি দিতে চান দিতে পারেন। যখন আমি পরের দিন তাদের সাথে সাক্ষাৎ করলাম তাদের হাতে একটি চিঠি দিলাম। চিঠিটি প্রেসিডেন্ট ওমর আল বশির বরাবর লেখা। তাকে আমার এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানাই।

সে চিঠিতে অন্য সুদানি বন্দিদের কষ্টের কথাও তুলে ধরি। বিশেষ করে তাদের কথা যাদের পরিবারের সাথে দীর্ঘদিন যোগাযোগ নেই। এই কথাও বলি যে আমার পরিবার ভালো আছে। আল জাজিরা তাদেরকে আমার বেতন দিয়ে যাচ্ছে।

বিচার

আমার স্ত্রী এসে বলল, "হয় ঘুমাতে যাও নয়তো তোমার পাশে বসতে দাও।"

ইশারায় তাকে বসতে বললাম। "কাগজ কলম নাও। লেখ, উম্মে মুহাম্মদ।"

"আমি এমন কিছুই আশা করছিলাম আবু মুহাম্মদ"

একটি প্রশ্ন বার বার মিডিয়ায় আসত; "গুয়ান্তানামো কি আমেরিকার মাটিতে যেখানে আমেরিকার আইন চলবে? নাকি এটি কিউবায়, আমেরিকার আইনের বাইরে? বিচার প্রক্রিয়া বলে যে এটা আমেরিকার মাটিতে। কিন্তু এখানকার বন্দিরা আমেরিকান বন্দি আইন অনুযায়ী সুরক্ষিত নয়।

সমালোচনার মুখে পড়ে যুক্তরাষ্ট্র ক্যাঙ্গারু কোর্ট চালু করে। জনগণকে শান্ত করতে। এটা ছিল একটি সামরিক ট্রাইবুনাল আদালত। একজন বিচারপতির অধীনে। একজন পাবলিক প্রসিকিউটর, একজন সামরিক কর্মকর্তা বন্দিদের পক্ষে লড়ত। তাদের উপর কয়েক হাজার বন্দির হয়ে লড়ার চাপ ছিল। কেন তারা কোনো চার্জশিট ছাড়াই আটক রয়েছে তার ব্যাখ্যা দিতে হতো।

প্রসিকিউটর অভিযোগের এমন বর্ণনা তুলে ধরত যার সাথে বাস্তবতার কোনো মিল নেই। বিচারক বন্দিকে বলত তার বিরুদ্ধে দায়ের করা অভিযোগের 'গোপন দলিল' তার দেখার অনুমতি নেই। অভিযুক্ত বন্দির পক্ষে (নামকাওয়াস্তে) দাঁড়াত সামরিক কর্মকর্তা।

সাত শতাধিক বন্দির বিচার এভাবে চলে। এভাবেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তারা সামরিক সেনা নাকি বেসামরিক নাগরিক! আমাদেরকে বলা হলো যে গুয়ান্তানামোর সকল বন্দিকে সামরিক আদালতে হাজির করার আগে একটি প্রাথমিক শ্রেণিবিন্যাস করা হবে। শ্রেণিবিন্যাস দেখে বোঝা যাবে কারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য হুমকি।

আদালত প্রক্রিয়া এগিয়ে চলল। আমাদেরকে বলা হয়েছে দু'জন সামরিক বিচারক থাকবেন। মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের পক্ষ হতে। সৈনিকরা আমাদের প্রতিনিধিত্ব করবে। তারাই আমাদের অভিভাবক হবে। বিচারকদের কাছে তারাই তথ্যের উৎস।

২০০৪ সালের শেষ দিকে আমাকে অভিযুক্ত করা হয়। রাজনৈতিক অভিযোগ। এমন অভিযোগ যেটার সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। ফলে পর্যাপ্ত তথ্য দিয়ে মোকাবিলা করারও সুযোগ পেলাম না। এমনকি আমার আইনজীবী যাকে আমার পক্ষে কাজ করতে বলা হয়েছে সে দেখি অভিযোগের পক্ষে। এই হলো গুয়ান্তানামো। এখানে এমন কিছু ঘটে যা কেউ আগে ভাবেনি।

কিভাবে একজন আমেরিকান (আইনজীবী) মার্কিন মিলিটারি ট্রাইবুনালের এই (গাঁজাখুরি) আইন কার্যকর করতে পারে? কিভাবে এক অদ্ভুত অভিযোগের 'গোপন দলিল' আমলে নিতে পারে? এই গোপন দলিলের মোকাবেলা আমরা কিভাবে করব?

আমরা এসব প্রশ্ন করি কিন্তু কেউ উত্তর দিত না। কারণ তারা জানত এই প্রক্রিয়া যুক্তিসম্মত নয়। আইন ও আদালতের সাথে সাংঘর্ষিক। যখন বিচারের ব্যাপারে নোটিশ পেলাম আমার পক্ষে কে লড়বে জানতে চেয়ে সামরিক কর্মকর্তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে কিভাবে আমার বিচার সামরিক আদালতে হয়? আপনি জানেন আমি সাংবাদিক হিসেবে কর্মরত অবস্থায় গ্রেপ্তার হই। সামরিক কর্মকাণ্ডে আমি

জড়িত নই। তাহলে আপনি আমাকে সামরিক আদালতের মুখোমুখি করার অধিকার রাখেন কিভাবে?"

তার সোজা উত্তর, "আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব না। আমার কাজ শুধু তোমার কাছে এই কাগজপত্রগুলো পৌঁছে দেয়া। তোমাকে বলা যে আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই তোমাকে সামরিক আদালতের মুখোমুখি হতে হবে।"

কয়েক মাস পর, তারা আমাকে সামরিক পোশাক পরা কোনো একজনের সাথে সাক্ষাৎ করাতে নিয়ে যায়। সামরিক লোকটি নিজের পরিচয় দেয়, "আমি ক্লাইভ। আমি তোমাকে সামরিক আদালতে সাহায্য করব। আমি তোমাকে জানাতে চাই আমি বিচারকের কাছে তোমার বলা কোন কথাই গোপন করব না। আইনও সে কথা বলছে। আমাকে অবশ্যই আমার মক্কেলের সব কথা বিচারকের কাছে প্রকাশ করতে হবে।"

বললাম, "আপনি পরিচয় দিলেন আপনি আমার আইনজীবী। আমাকে সাহায্য করতেই এখানে এসেছেন। কিন্তু আপনি আসলে আপনার আইনি যোগ্যতা হারিয়েছেন। আপনি বিচারকের সাথে আমার স্বার্থের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন। কিভাবে আপনি একজন আইনজীবী হিসেবে পরিচয় দেন? আপনি সরকারের আইনজীবী, কয়েদীর নয়।"

সে বলার চেষ্টা করল, "আমি তোমাকে বলতে চাই যে, তুমি বিচারকার্যে প্রত্যক্ষ সাক্ষীও উপস্থিত রাখতে পারবে।"

"গুয়ান্তানামোর বাইরে থেকেও কি সাক্ষী আনতে পারব?"

"হ্যাঁ, কিন্তু কিছু বিধি-নিষেধ আছে। অ-আমেরিকান কেউ বিশেষ পাশ ছাড়া এই দ্বীপে প্রবেশ করতে পারে না।"

"তার মানে, আমি যাকে চাই তাকে এখানে আনতে পারব না। যদি তারা আসেও অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে। তাহলে আপনি কীসের সাহায্য আর কোথাকার প্রত্যক্ষদর্শী সম্পর্কে বলছেন? আর সেই গ্যারান্টিই কি আছে যে তারা নিরাপদে বাড়ি ফিরে যেতে পারবে অথবা তারা আমাদের মতোই এখানে বন্দি হয়ে যাবে না?"

"আমি এর উত্তর দিতে পারব না। তবে এটা সত্যি যে যুক্তরাষ্ট্র যাকেই সন্ত্রাসীদের সমর্থন করার অথবা সন্ত্রাসীদের সাথে যোগাযোগ করার সন্দেহ করবে তাকেই গ্রেপ্তার করবে। এমনকি আপনার সাক্ষীদের বিরুদ্ধেও যদি

গ্রেপ্তার করার মতো কোনো কারণ পাওয়া যায় তবে তাদেরকে গুয়ান্তানামো ত্যাগ করতে দেবে না।"

এরকম তথাকথিত 'পক্ষের আইনজীবী' নিয়ে আমি বিব্রত। 'তোমরা আসলে আমাদের দিয়ে অন্যদের ধরতে চাও' মনে মনে বললাম।

সেনা অফিসারকে বললাম, "আমার পরিবারের সাথে যোগাযোগ করতে চাই। আমি আল জাজিরায় সাংবাদিকতা করি, যাতে এ সংক্রান্ত কাগজপত্র তারা আমাকে দিতে পারে। এখানকার মামলায় আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের মোকাবিলায় সে নথিপত্র প্রয়োজন।"

"যোগাযোগ করার অনুমতি নেই। তবে তুমি যা বলতে চাও আমাকে বলতে পারো। আমি আমার পক্ষ হতে যোগাযোগ করার চেষ্টা করব।"

সেনা অফিসারের সাথে কথা বাড়াতে চাইছিলাম না কিন্তু কথা না বাড়িয়েও উপায় নেই। জিজ্ঞেস করলাম, "যদি আমার পরিবারের সাথে যোগাযোগ করেন তখন কী বলবেন?"

বলব, "আমি কয়েদী ৩৪৫ এর সাহায্যকারী। সে আপনাদের কাছে এই এই নথিপত্র চেয়েছে।"

"তারা না তোমাকে সহযোগিতা করবে, না বিশ্বাস করবে। কারণ তুমি একজন মার্কিন সেনা। যদি না আমি তাদের সাথে কথা বলি তারা তোমাকে সহযোগিতা করবে না।"

তিনি বললেন, "কিন্তু আমরা তোমাকে যোগাযোগ করতে দিতে পারি না। আইন তোমাকে তোমার পরিবারের সাথে যোগাযোগ করার অনুমতি দেয় না।"

"এছাড়া তো আর উপায় দেখছি না", বললাম।

"ব্যাপারটা ভেবে দেখতে হবে। তবে কোন কথা দিতে পারছি না।"

"কেন আমাকে সাহায্য করবেন না অথচ সাহায্য করার জন্যই নাকি আপনি এসেছেন?"

"আমার সাহায্য করার ক্ষমতা সীমিত। শুধু তোমার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ আর কিভাবে আদালতের কার্যসূচি পরিচালিত হবে সে সম্পর্কে ধারণা দিতে এসেছি।"

"তাহলে আপনার মনে করা উচিত আপনি একজন তথ্য সরবরাহকারী। আপনি এখানে এসেছেন আপনার উর্ধ্বতনের আদেশে। অতএব আপনাকে আর আমাকে সাহায্য করার অভিনয় করতে হবে না।"

"তুমি ঠিক বলেছ। তাহলে তোমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো শোন।"

প্রথম অভিযোগ ছিল আমি পাকিস্তান সীমান্ত দিয়ে ২০০১ সালের ১৫ ডিসেম্বর আফগানিস্তানে প্রবেশের চেষ্টা করেছিলাম। পাকিস্তানি সরকারের হাতে ধরা পরি এবং আটক হই। এরপর আমাকে মার্কিন বাহিনীর হাতে তুলে দেয়া হয়।

"এটা কি অভিযোগ?" হাসতে হাসতে আমি জিজ্ঞেস করলাম। এটা একটা অভিযোগ! আর এ অভিযোগ কিনা আমার বিরুদ্ধে আনা হয়েছে। আমি পাকিস্তানে প্রবেশ করেছিলাম ভিসা নিয়ে। আমার সাংবাদিকতার কার্ড ছিল। আইন মেনে ভ্রমণের সব কাগজপত্র প্রস্তুত করা হয়েছিল। কোন দু'নম্বরি কাগজপত্র ছিল না। কাউকে ঘুষ দিতে হয়নি। আমি আফগানিস্তানে যুদ্ধ করতে যাচ্ছিলাম না। মাদক কেনাবেচা বা কোন অবৈধ কাজ করতেও না। সেখানে যাচ্ছিলাম একজন সাংবাদিক হিসেবে। সেদিন সারা বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের প্রায় ৭০ জন সাংবাদিক সেখানে ছিলেন।

আর কী কী তথ্য আপনার কাছে আছে?

তিনি বলেন, "আরেকটি অভিযোগ তোমার বিরুদ্ধে আছে। তা হলো, আফগানিস্তানে প্রবেশ করে তুমি স্ট্রিংগার মিসাইল কেনার চেষ্টা করেছিলে চেচনিয়ার জন্য!"

"কিভাবে আমি ১১ সেপ্টেম্বরের পর চেচনিয়ার জন্য স্ট্রিংগার মিসাইল কিনলাম? ১১ সেপ্টেম্বরের পর আফগানিস্তান এবং সারা বিশ্বের চেহারাইতো পাল্টে যায়। আপনি জানেন আমি একজন সাংবাদিক হিসেবে সেখানে গিয়েছিলাম। মিসাইল কেনার মতো টাকা আমার ছিল না। সে কাজ করার সময়ও ছিল না। কিভাবে তাহলে আমি এসব কিনে আবার চেচনিয়ায় পাঠাই? কার কাছে পাঠাই? সেসবের দাম কত ছিল? কিভাবে আফগানিদের সাথে ব্যবসা করি? আমি তো ওদের ভাষাই বুঝি না। আর আমার প্রথম যাত্রাতেই আমি এসব করি?

আমি তাকে একটু ব্যাখ্যা করে বোঝালাম যে এটা সেই গল্পের বিকৃতি; যেখানে আমি বলেছিলাম যে, 'আমি যখন পাকিস্তান সীমান্ত আটক ছিলাম তখন এক আফগানি আর এক পাক পুলিশের মধ্যে স্ট্রিংগার মিসাইল নিয়ে ঝগড়া করতে শুনেছিলাম'। "যে অফিসারই এই অভিযোগ লিখেছে সে শুধু গল্পটা ঘুরিয়ে দিয়েছে। আমি আফগানে অস্ত্র কিনতে যাইনি। আপনি আমার জিজ্ঞাসাবাদের হিস্ট্রি ঘেঁটে দেখতে পারেন। আমি সেখানে পাকিস্তান গোয়েন্দাবাহিনীর কাছে আটক থাকার সময়ে যা যা ঘটেছে সব খুলে বলেছি।"

"তোমার বিচারকের কাছে এসব বলো।"

"আর কোনো অভিযোগ আছে?", জিজ্ঞস করলাম।

"আছে। সেটা হলো তুমি ১৯৯৬-২০০১ সালে মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো ভ্রমণ করেছ। বলকান অঞ্চলে, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের দেশগুলোতে গিয়েছ। অতঃপর আফগানিস্তানে এসেছ ২০০১ সালে।"

"কিছু মৌলিক বিষয় দেখুন। এসব অতিরঞ্জন ছাড়াও আমি মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ ঘুরেছি। যেমন সৌদি আরব গিয়েছিলাম হজ ও ওমরাহ আদায় করতে। সত্যি গিয়েছিলাম কেনো অতিরঞ্জন নয়। সিরিয়া গিয়েছিলাম পর্যটক হিসেবে। তখন সেটা যুদ্ধক্ষেত্র কিংবা যুদ্ধপ্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল না। পর্যটক হওয়া মানে কি সন্ত্রাসী হওয়া? লেবাননেও গিয়েছিলাম পর্যটক হিসেবে। জর্ডানেও। আরব আমিরাতেও গিয়েছিলাম কাজের প্রয়োজনে। সে ভ্রমণের সময়গুলোতে কোনো সমস্যা হয়নি। সেসব দেশে খবর নিয়ে দেখতে পারেন।

চতুর্থ অভিযোগ ছিল, "আমার সাবেক বস আবদ-আল-লতিফ আল-উমরান এবং আল কায়েদার মধ্যে সম্পর্কের কথা আমি জানতাম।" আসলে আমার এ ব্যাপারে কিছু জানা ছিল না। তাই অভিযোগ অস্বীকার করি। তারপরও আমাকে অভিযুক্ত করা হয়। তারা চাচ্ছিল আমি জনাব লতিফের সাথে আল-কায়েদার সম্পর্কের কথা স্বীকার করি। ফলে তারা আমার কথাকে দলিল হিসেবে ব্যবহার করে তাকে শাস্তি দেবে। অথচ তা সত্যি ছিল না। আমি এখনো বিশ্বাস করি তার সাথে আল কায়েদার কোনো সম্পর্ক ছিল না। এখনো নেই।

জনাব আব্দুল লতিফ সম্পর্কে আমি যা জানি তা হলো, তিনি একজন সফল মানুষ। তিনি তার জীবনকে দাতব্য কাজে উৎসর্গ করেছেন। নির্মাণ করে চলেছেন অসংখ্য মসজিদ, ইয়াতিমখানা। তিনি হলেন একজন আদর্শ মুসলিম। বললাম, "আমি তার সম্পর্কে মিথ্যা কিছু বলতে পারব না। তার সাথে সম্পর্কের কথাও অস্বীকার করব না। তার কর্মযজ্ঞকে আমি অপরাধ মনে করি না। আমি তাকে ভালো করেই জানি। তার মতো আমি হতে চাই। অভাবী মানুষদের সাহায্য করতে চাই। তিনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী।"

সর্বশেষ হাস্যকর অভিযোগ ছিল, 'আমি নাকি কয়েদীদের ইমাম ছিলাম। সবাইকে নিয়ে সালাত আদায় করতাম আর ইংরেজি শেখাতাম।'

আদালতে প্রবেশের পূর্বে আমি ক্লাইভের সাথে কিছুক্ষণ বসলাম। হাতকড়া পায়ের বেড়িসহ বিচারকের এজলাসে প্রবেশ করলাম। আমার পাশেই বসে দোভাষী। মাইক্রোফোন সেট করা হয় আমার সামনে।

বিচারিক কমিটি প্রবেশ করেন। অবাক হলাম ক্লাইভকে দেখে। সেও বিচারিক কমিটির একজন। বাদীপক্ষের একজন। অথচ সে আমার সামরিক উকিল। বিবাদীর উকিল বাদীপক্ষের প্রতিনিধি!

আমার শপথ বাক্য পাঠের সময় হলে উঠে দাঁড়াতে অস্বীকৃতি জানালাম। বললাম, "আমি তোমাদের আদালতে বিশ্বাস করি না। আমরা মুসলিমরা মিথ্যা বলি না। শপথ হোক কিংবা শপথ ছাড়া। মিথ্যা না বলার জন্য আমাদের শপথ নিতে হয় না। আমরা জানি মিথ্যা বলা মহাপাপ। আমি শপথ নেব শুধু এজন্য যে যাতে মনে না করো আমি সত্য এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছি।

আল্লাহর কসম করে বলছি আমি সত্যটাই বলব। এরপর তারা আমার মামলার ব্যাখ্যা দেবার অনুমতি দেয়।

আমাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করা হয়। যেগুলোর উত্তর দিতে পারিনি বলেছি, "আমার আইনজীবীর সাথে কথা বলে নিই।" বিচারকের সহকারীদের চোখেমুখে অসন্তোষ, ঘৃণা। আমার সাথে কথা বলতে তাদের বয়ে যাচ্ছে।

যেমনটা ভেবে ছিলাম তেমনই হলো। রায়ে আমি এখনো মার্কিনিদের জন্য হুমকি হয়ে রইলাম। আমার বন্দিত্বের মেয়াদ বাড়ল আরো একবছর।

ক্লাইভ

ক্লাইভ আমার আইনজীবী। কখনোই তার সাথে বিবাদে জড়াইনি। যুক্তিসঙ্গত কথা বলেছি কারণ আমাকে রক্ষা করা তার দায়িত্ব।

সে তার সর্বোচ্চ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছে। যদিও সে সাহায্য আমার মুক্তির জন্য নয়। বরং আমার পরিবারের সাথে যোগাযোগ, চিঠি আদান-প্রদান করায় কাজে লেগেছে। উম্মে মুহাম্মদের সাথে কথা বলার অনুভূতি ছিল অন্যরকম। সেজন্য তাকে ধন্যবাদ।

বাধাবিপত্তির কথাগুলো সব তাকে খুলে বলি। আমার স্ত্রী পরিজনের সাথে যোগাযোগের সমস্যার কথা বলি। বলি রেড ক্রসের মাধ্যমে অনেক চিঠি পাঠানোর পর দীর্ঘদিন কোনো উত্তর না আসার কথা। রেডক্রসের মাধ্যমে প্রথম চিঠি আসে ২০০২ সালের ২০ সেপ্টেম্বর। গুয়ান্তানামোতে আসার দশ মাস পর কিছু চিঠি আসে কিন্তু সেগুলো ভুল লোকের কাছে চলে যায়। ছিঁড়ে যাওয়া, কাটাকুটি করা। এমনকি সন্তানের ছবিটিও বিকৃত করা থাকত। চিঠির মূল কথাই অনেক সময় বোঝা যেত না।

আমার পুত্রের ছবি পাঠাত তার মা। কিন্তু সে ছবির আকৃতি উদ্ধার করা ছিল অসম্ভব। এই ছবি বিকৃতির কোনো কারণ নেই। মনের খায়েশ, খামখেয়ালিপনা। কেন তারা এমন করত? এটা ছিল তাদের কৌশল। আমাদেরকে কষ্ট দেয়ার কৌশল। তারা আমার দুঃখগাথা, অনুভূতি প্রকাশ থামিয়ে দিতে চাইত। তারা চাইত না আমার নির্মম বাস্তবতা বাইরের দুনিয়ায় প্রকাশ পেয়ে যাক।

কাজের বাইরে একটা সম্পর্ক হয়ে যায় ক্লাইভের সঙ্গে। আমার পরিবারের সাথে যোগাযোগের সূত্রে। সে আমার পরিজনদের সাথে দেখা

করত। তাদের নিশ্চিত করত যে আমি জীবিত আছি। সবকিছু ঠিকঠাক চলছে। আর ফেরার সময় তাদের খবরাখবর নিয়ে আসত।

ক্লাইভ আর আমি সম্মত হলাম। আমার সাথে যা ঘটেছে তাকে সংক্ষেপে সব বলব। আমরা কয়েদীরা জানতাম মার্কিন প্রশাসন মিথ্যাচার করছে। কয়েদীদের সঙ্গে করা আচরণের বিপরীত প্রচার করছে। প্রয়োজন ছিল আমাদের আইনজীবীদের সহযোগিতা। যাতে আমাদের কথাগুলো বাইরের দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিতে পারি। কয়েদীদের দুর্দশার কথা, দুর্ভাগ্যের কথা মানুষের মুখেমুখে রটিয়ে দিতে পারি।

প্রতি তিন মাস অন্তর যখন ক্লাইভ আসত তার কাছে অনেকগুলো চিঠি দিয়ে দিতাম। প্রতিবারই ছয়, সাতটা করে। এরপর সে প্রশাসনের চিঠি নিরীক্ষা বিভাগে জমা দিত। নিরীক্ষা শেষে পাওয়া চিঠিগুলো সে প্রকাশের চেষ্টা করত।

চিঠিতে আমি কয়েদীদের দুঃখগাঁথা তুলে ধরতাম। একবার এক প্রতিবেশী কয়েদীর কথা লিখি। আলজেরিয়ান-বসনিয়ান নাগরিক। নাম হাদ বোদেল্লা। একজন সরলসোজা মানুষ। থাকত বসনিয়ায়। কোনো দলটলের সাথে সম্পর্ক নেই। কিন্তু অপরাধ তদন্ত দলের হাতে আটক হয়ে যান কিভাবে যেন! এরপর তাকে মার্কিন সেনাদের কাছে বিক্রি করে দেয়া হয়। এরপর গুয়ান্তানামোতে নিয়ে আসা হয়। সে কখনোই জানতে পারেনি তার অপরাধ কী ছিল! শেষমেষ সে মুক্তি পেয়েছিল। বসনিয়ায় ফিরে গিয়েছিল ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে।

ক্লাইভের কাছে দেয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিঠিটি ছিল পরিবারের কাছে পাঠানো প্রথম চিঠি। চিঠি,

"আসমা, প্রিয়তমা আমার। জীবনের সুগন্ধি তুমি। তোমাকেই লিখছি...
প্রিয় পুত্র মুহাম্মাদ...

আল্লাহর রহমতের চাদরে ঘিরে থাকো, তাঁর চোখ যেন তোমাকে দেখে রাখে...

জানি-গতরাতে-তোমার জীবনের পঞ্চম বাতিটি তুমি জ্বালিয়েছ। কিন্তু দুঃখের বাতি আমার এখনো জ্বলছে। তোমার সাথে সাক্ষাতের আকাঙ্খা অনল হয়ে জ্বলছে এই বুকে।

জানি এখন তোমায় স্কুলে নেবার সময়। কিন্তু আমার হাত, আমার পা শিকলে বাঁধা।

তোমার কি মনে পড়ে সে দিনটির কথা যখন আমরা তোমার জন্মদিনের প্রথম মোমবাতিটি জ্বালিয়েছিলাম? আমি, তুমি আর তোমার মা একসাথে। এখনো কি তোমার গালে সেই চুমোর দাগগুলো আছে যা আমি পরম মমতায় এঁকে দিয়েছিলাম, তোমার রক্তিম ললাটে? পুরো গাল জুড়ে?

মনে করি না তুমি মনে রাখতে পারবে। কিন্তু আমি মনে করতে পারি। সকরুণ রাখালিয়া সুরের মতো বাজে। এই হৃদয় মাঝে। সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে। কত মরুভূমি কত মাঠঘাট দূরে। শুধু একটি নিউজ হেডলাইন আমি এখন...

এতকিছুর পরও তোমার মুখ, মুখ দেখার সুখ ভুলে যাইনি। চোখ তোমার মায়া ভোলেনি।

বরং স্মৃতিগুলো কাতরায় তোমার একটি ছবি হলেও দেখার জন্য। তোমার সাক্ষাতের কামনা আগুন হয়ে জ্বলে দ্বিগুণ। দুভার্গ্য আমার জখমগুলো এখনো শুকায়নি। রক্তক্ষরণ আরো বেড়ে যায় যখন প্রতি চিঠিতেই তোমার প্রশ্নগুলো পড়ি,

বাবা কোথায়?

কেন বাবা বাড়ি আসোনা?

বাবা তুমি আসো!

আমাকে ক্ষমা করে দিও প্রিয় পুত্র আমার। আমার কলিজা। তুমি তোমার তিক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর আর কোথাও পাবে না তোমার মায়ের কাছে ছাড়া। মা তোমাকে বলে, বাবা তোমার ফিরে আসবে। একদিন তাকে দেখতে পাবে।

যদি তোমার অসহায় মায়ের কাছে এ ছাড়া অন্য কোন উত্তর থাকত তবে সে এক মুহূর্তও দেরি করত না। তোমাকে জানিয়ে দিত!

পুত্র আমার! সত্যটা হলো তোমার বাবা হাজার হাজার মাইল দূরে কারাগারে অতল গহ্বরে বন্দি। অসাম্যের ভারি শেকলে বাঁধা। অন্যায় অবিচারের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। নিঝুম দ্বীপে নির্যাতিত।

দ্বীপটি পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন। কোথাও কোনো সারা নেই। শুধু কয়েদীদের শেকলের টুংটাং শব্দ। অথবা নির্যাতিত বন্দিদের গোঙানি।

এখানে শুধু দেখবে ভ্রুকোঁচকানো জেলারদের নিষ্ঠুরতা আর খাঁচায় বন্দি নির্যাতিত কয়েদীদের।

এই গহীন দ্বীপে...প্রিয় পুত্র, আমি মরে গেছি, মরে গেছি, মরে গেছি!

দ্বীপের বাইরে গেলেই... প্রিয় পুত্র, আমি জন্ম নেব, জন্ম নেব, জন্ম নেব!

তোমার বাবা বিশ্বমোড়লদের হাতে আক্রান্ত। সে মোড়লরা ধমকের সুরে কথা বলে। চিকচিক ইস্পাতের জঙ্গিবিমান আর যুদ্ধজাহাজ হাঁকায়।

কাঁড়ি কাঁড়ি ডলার পেয়ে তারা অর্থের দাস বনে গেছে। ধরাকে সরা জ্ঞান করে।

তারা এমনকি কথাবার্তায় ন্যূনতম শালীনতা রাখে না।

এখানে অসুস্থ কয়েদীরা প্রহর গুনছে! কবে তারা সেই কাঙ্ক্ষিত মুক্তি পাবে! কবে তাদের দুর্ভোগের হবে অবসান!

আমার স্নেহবঞ্চিত একমাত্র পুত্র, আমি তোমাকে বলছি এই জীবনে রয়েছে ন্যায়নীতি, ভ্রাতৃত্ব, ভালোবাসা, বিশ্বস্ততা, শ্রদ্ধা এবং আশা। এগুলো জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করি। কিন্তু ন্যায়নীতির কথা বললে আমাকে পেটানো হতো। পেটাত তারা যারা ন্যায় বিচারের কথা বলে বেড়ায়। যারা স্বাধীনতার সংজ্ঞা শেখায়। যারা গণতন্ত্রের সবক দিয়ে যায়...

তারা আমাকে বারবার বলে, "তুমি এ কারাগার ত্যাগ করতে পারবে না যতক্ষণ না আমরা তোমার উপর সন্তুষ্ট হব। যতক্ষণ না তুমি খুশি মনে আমরা যা চাই তা করো!

তুমি কি বুঝতে পারো, আমার পুত্র, তারা আসলে কী চায়?

তারা চায় আমার আখেরাত বরবাদ করতে। ঠিক যেভাবে তারা আমার এই পার্থিব জীবন ধ্বংস করে দিচ্ছে। কিন্তু পারবে না।

আল্লাহ আমার সাহায্যকারী। তাঁর উপরই ভরসা করি। মনের যত আকুতি তার কাছেই নিবেদন করি। তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনিই সর্বোত্তম সাহায্যকারী। ইহকাল এবং পরকালের ক্ষমতা তার হাতেই।

তোমার পিতা, কয়েদী ৩৪৫, আবু মুহাম্মদ, সামি মুহি আল দীন।

তালাল ও ইয়াসির আল জাহরানি

ক্যাম্পে এক তরুণ কয়েদী ছিল। সৌদি আরবের। নাম ইয়াসির আল জাহরানি। গুয়ান্তানামোতে পাঁচ বছর বন্দি ছিল। এ সময় তাকে নির্দয়ভাবে পেটানো হয়। শারীরিক অবস্থার চরম অবনতি ঘটে। এক পর্যায়ে তার মৃত্যু হয়। মরদেহ পরিবারের কাছে পাঠানো হয়। মদিনায়। মদিনাতেই তার জন্ম হয়েছিল।

এই ইয়াসিরসহ আরো দু'জনের মৃত্যু হয়। একজন সৌদি অন্যজন ইয়ামেনী। তিনজনের মৃত্যু নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় রিয়ার এডমিরাল হ্যারি হ্যারিসকে প্রধান করে। কমান্ডার হ্যারিস তদন্ত শেষে প্রতিবেদন দেন তিন জনের মৃত্যু ছিল আত্মহত্যা। যদিও একথা কেউ বিশ্বাস করেনি।

ইয়াসিরের পিতা আবু তালাল আল জাহরানি সৌদি পুলিশের একজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল। তিনি আমাকে বলেন, তার ছেলেকে একদল আফগানি অপহরণ করে। পরে তারা তাকে আমেরিকার কাছে বিক্রি করে দেয়। কাঁপা কণ্ঠে তিনি বলেন, "তারা ছেলেকে ফেরত দেয় বাক্সে ভরে। খণ্ড-বিখণ্ড।"

আবু তালাল তার ছেলের আত্মহত্যার বর্ণনা বিশ্বাস করেননি। পেন্টাগণের ব্যাখ্যা তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি আমাকে এক উদ্যমী তরুণ, কুরআনের হাফেজ ছেলের কথা শোনান, যে ছেলে তার আফগানিস্তান

গিয়েছিল ইসলামের সুমহান বার্তা পৌছে দিতে। তাকে গ্রেপ্তার করে মার্কিনিদের হাতে তুলে দেয়া হয়। এরপর আর তাকে দেখা যায়নি।

তিনি বলেন, তার ছেলে তাকে একটি জিনিস শিক্ষা দিয়েছেন। "সত্য হলো সবার উপরে।" এই সত্যের পক্ষে লড়তে গেলে মার্কিনিরা তাকে বন্দি করে। নির্যাতন করে। হত্যা করে। আর তারা তার থেকে কোনো তথ্য আদায় করতে পারেনি। আমেরিকার কোনো লাভ হয়নি। নিহত তিন কয়েদীর নথিপত্র এখন স্পষ্ট। তাদের মৃত্যু রহস্যজনক। এই মৃত্যু আত্মহত্যা নয়। এ নিয়ে এখনো প্রশ্ন রয়ে গেছে।

ইয়াসির এবং অন্য সৌদির মরদেহ সৌদি সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ইয়ামেনী লোকটিকেও ইয়ামেনে কবর দেয়ার জন্য পাঠানো হয়। আলকারামা নামে একটি সংস্থা ইয়াসিরের দেহের ময়না তদন্ত করে। তদন্তের রিপোর্টে দেখা যায় সে আত্মহত্যা করেনি। তার দেহের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খোয়া গেছে। আবু তালালকে বললাম এটা নিয়ে ইয়ামেনী সংস্থার সাথে তার কথা বলা উচিত। দোষীদের শাস্তির আওতায় আনার চেষ্টা করা উচিত।

আবু তালাল এটা নিয়ে সরব হন। সৌদির একজন প্যাথলজিস্টের সাথে কথা বলে নিশ্চিত হন তার ছেলের দেহের ময়না তদন্ত হয়নি কারণ কিছু অঙ্গ প্রতঙ্গ পাওয়া যায়নি। সন্তান হারানোর কষ্ট নিয়েই তিনি কাজ করে গেছেন। নরওয়েজিয়ান এক ফিল্ম মেকারের সাথে কথা বলেন তার সন্তানকে নিয়ে একটি শর্টফিল্ম বানানোর জন্য। নিউজ টাইপ শর্টফিল্মটি[১] যা পরে আল জাজিরায় জুন ৩০, ২০১১ সালে আরবি ও ইংরেজিতে প্রচারিত হয়। নিউইয়র্কের সেন্টার ফর কনস্টিটিউশনাল রাইটস নামের একটি সংগঠন "আল জাহরানি বনাম রামসফেল্ড" শিরোনামে আন্দোলন করে। ইয়াসিরের জন্য ন্যায় বিচার চেয়ে ওয়াশিংটন ডিসির আদালতে আপিল করে।

---

১. https://vimeo.com/130015310 (Death in Camp Delta)

সহকয়েদীর মৃত্যু

২০০৬ সালের ১০ জুন। তিনজন কয়েদীকে তাদের কক্ষে মৃত পাওয়া যায়। তারা হলেন, সালাহ আহমেদ আল সালামি, মাআনি বিন শামান আল ওতায়বি এবং ইয়াসির তালাল আল জাহরানি। যার কথা আমি ইতঃপূর্বে বলেছি।

তাদের মৃত্যুর ঘটনা রহস্যজনক। প্রত্যেককেই তাদের নিজ নিজ সেলে দড়িতে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। হাত পা শেকলে বাঁধা। মুখের ভিতর কাপড় গুঁজে দেয়া। তিনজনই ভয়াবহ পরিস্থিতির মোকাবিলায় অনশন পালন করেছিলেন। সালাহ আল সালামি সবচেয়ে দীর্ঘ অনশন পালন করেন। সবার শেষে অনশন ভাঙেন। তাকে আলফা ব্লকে ফিরিয়ে আনা হয়। যেখানে মাআনি আল ওতায়বি এবং ইয়াসির আল জাহরানিও ছিলেন।

জুন ১০, ২০০৬ সালের রাতে। কয়েদীরা নাশীদ গাইছিলেন, কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। প্রত্যেকের খাবার গ্রহণ তখন শেষ। অনেকেই ঘুমিয়ে গেছে। রাত ১টা কি ২টা হবে। এক নারী সৈন্যের চিৎকার, "হেল্প..!! হেল্প..!!"

সৈন্য ও ডাক্তারদের ছোটাছুটি। দুই-তিনটা স্ট্রেচার নিয়ে তারা ছুটছে। প্রথমেই বের করে আনা হলো সালাহকে। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন। পিছনে তার হাত বাঁধা, মুখে কাপড়। এরপর ইয়াসিরকে আনা হয়। তারও একই অবস্থা। এরপর আনা হয় মাআনি'কে।

অপরাধ ঘটে যাওয়া আলফা ব্লকে ৪৮টি সেল ছিল। উন্মুক্ত স্টিলের ভবন। জানালা দিয়ে পৃথক করা। দেড় বাই দুই মিটারের প্রতিটি সেল একটি বেড টয়লেট এবং বেসিন। ক্যাম্পে একের পর এক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। সেলের সামনের অংশ ঢেকে রাখা যাবে না, ভিতরে কোনো কিছু ঝুলিয়ে রাখা যাবে না। শুধু একটি তোয়ালে ও একটি মাদুর রাখা যাবে। সৈন্যরা প্রতি ঘণ্টায় টহল দিত। সার্ভেল্যান্স ক্যামেরা দিয়ে বারান্দা পর্যবেক্ষণ করা হতো।

নিহত তিনজনের একজন থাকত ৯ নম্বর সেলে। দ্বিতীয় জন ১১ নং সেলে আর তৃতীয় জন ২১ নং সেলে। সামরিক দপ্তর থেকে বলা হয় তারা আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু আত্মহত্যা করতে তারা কী ব্যবহার করেছে তা আর বলে না। তারা যখন আত্মহত্যা করছিল তখন সৈন্যরা কোথায় ছিল? ক্যামেরা কোথায় ছিল? তাদের তো হাত পা বাঁধা, কে তাহলে পিছন থেকে গলায় রশি বা কাপড় বেঁধে দিল? কে ঝুলিয়ে দিল? মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পর তাদের খোঁজ হয়। এই কয়েকঘণ্টা সৈন্যরা কোথায় ছিল?

আরো একটা রহস্য আছে যেটা আমার কাছে ধরা পড়েছে। আর আমি সেটা ইতঃপূর্বে ইয়াসিরের গল্প বলার সময় বলেছি। ইয়েমেন এবং সৌদির প্যাথলজিস্টরা বলেছেন যে লাশগুলোর ভিতরটা ছিল ফাঁকা। যকৃত, ফুসফুস ইত্যাদি ছিল না। রোগবিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন মৃত্যুর কারণ উদ্‌ঘাটন যাতে সম্ভব না হয় সেজন্যই ময়না তদন্তের সময় তারা ভিতরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সরিয়ে নিয়েছে। কেন প্রশাসন মৃত্যুর প্রকৃত কারণ প্রকাশের ব্যাপারে ভীত ছিল?

তিনজন পাশাপাশি সেলের কয়েদী ছিল না। বরং একেকজন তিন চার সেল ব্যবধানে ছিল। কিন্তু কী কারণে তাদের একই সময়ে মৃত্যুবরণ করতে হলো? তাও আবার একই পদ্ধতিতে? মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ থেকে এই প্রশ্নগুলোর জবাব দেয়া হয়নি।

অবশ্য কারাগার প্রধান অ্যাডমিরাল হ্যারি হ্যারিস ক্যাম্প ডেল্টায় ঘটে যাওয়া এ হত্যাকাণ্ডের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে একপর্যায়ে বলে ফেলেন তিনি বিশ্বাস করেন না এসব আত্মহত্যা, "আমি বিশ্বাস করি এসব কোন বেপরোয়া কাজ নয়। বরং এগুলো হলো আমাদের বিরুদ্ধে চলমান অসম যুদ্ধের কিছু নিদর্শন।"

মিডিয়া অ্যাডমিরাল হ্যারিসের কথা গুরুত্ব সহকারে নেয় এবং মামলার কথা ভুলে যায়। সে বক্তব্যের পর মামলার নথিপত্র নিক্ষেপ করা হয় দূর অজানায়। কোনো মিডিয়া আর কথা বলেনি সে মামলা নিয়ে। দীর্ঘদিন। কারা কর্তৃপক্ষও কোনো প্রহরীকে শাস্তি দেয়নি সে রাতে কাজে অবহেলার কারণে।

দু'বছর পর। যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনীর অপরাধ তদন্তকারী একদল এ ঘটনার একটি তদন্ত প্রতিবেদন চূড়ান্ত করে। এতে দেখা যায় তদন্তে এটা নিশ্চিত হয়েছে যে সে হত্যাকান্ডে কারা কমান্ডারের হাত ছিল। পেন্টাগন অবশ্য সেই রিপোর্ট প্রকাশের অনুমতি দেয়নি। পরে নিউ জার্সির সেটন হলো ইউনিভার্সিটির আইন বিভাগ 'স্বাধীন তথ্য বিনিময় আইন' প্রক্রিয়ায় অনুরোধ করে সে মামলার নথিপত্র ও তদন্ত প্রতিবেদন হাত করে। দেখা যায় পেন্টাগন প্রতিবেদনের অনেক জায়গায় লাল কালিতে দৃষ্টি আকর্ষণী দিয়ে রেখেছে।

সেখানে ছিল ১৭০০ নথি। তাই সম্পাদনা করে যে দৃষ্টি আকর্ষণী দেয়া হয়েছিল তা পড়ে শেষ করা ছিল প্রায় অসম্ভব। কিন্তু শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীরা সে অসম্ভবকে সম্ভব করে এবং ২০০৯ সালের ডিসেম্বরে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করে। যার শিরোনাম ছিল "ডেল্টা ক্যাম্পে মৃত্যু"। প্রতিবেদনটিতে যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনীর অপরাধ তদন্ত বিভাগের দুর্বলতা তুলে ধরা হয়। অবতারণা করা হয় 'অনেক জবাবহীন প্রশ্নের'।

এতে দেখানো হয় তদন্ত দল ঘটনার যে পরম্পরা বয়ান করেছে তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। 'কয়েদীরা আত্মহত্যা করেছে' এ অভিযোগের খণ্ডনও সেখানে করা হয়েছে। বলা হয়, অভিযোগ গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের মুখে জামাকাপড় গুঁজে দেয়া ছিল। একেবারে পেছন দিক থেকে গলায় দড়ি বাঁধা ছিল। জামাকাপড় পাকানো দড়ি। বেসিনের উপরে বাঁধা। যেন বেসিন থেকে লাফিয়ে পড়ে গলায় ফাঁস লেগেছে। হাত-পা'ও বাঁধা ছিল।

আরেক প্রতিবেদনে দেখা যায়, হ্যারিস নিজেও স্বীকার করে যে প্রহরীরা শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছিল। কিন্তু সে প্রহরীদের বিরুদ্ধে কোনো আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। গোয়েন্দা বাহিনীও চার প্রহরীকে জিজ্ঞাসাবাদ না করার প্রসঙ্গটি তুলে ধরে।

গোয়েন্দা বাহিনীর একজন সার্জেন্ট জোসেফ হিকম্যান। যিনি পরবর্তীতে হার্পার ম্যাগাজিনের স্কট হরটনের সাথে কথা বলেন। ২০১০

সালের মার্চে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন কী দেখেছিলেন তা নিয়ে। হিকম্যানের লেখায় কয়েদীদের জিজ্ঞাসাবাদে 'অস্তিত্বহীন' ক্যাম্পের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। সে এবং তার বন্ধু টনি ডেভিলা এ ক্যাম্পের নাম দিয়েছেন "ক্যাম্প নো"। কাউকে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন হলেই প্রস্তুত হয়ে যায় ক্যাম্প নো।

সে রাতে তিনি একটি গাড়িকে নো ক্যাম্প থেকে বের হয়ে কারাগারের অন্য প্রান্তে যেতে দেখেন। আরো কিছু রহস্যজনক চলাফেরা দেখেন। কারণ তিনি প্রায়ই পর্যবেক্ষণ টাওয়ারে উঠে সবকিছু দেখতেন। হিকম্যান দেখেন বন্দিদের 'ক্যাম্প নো'তে স্থানান্তর করা হচ্ছে। স্যাটেলাইট থেকে গুয়ান্তানামোর যে দৃশ্য দেখা যায় তাতে হিকম্যানের বর্ণনা হুবহু মিলে যায়। তিনি এবং ডেভিলা বলেন যে তারা যেখানে খুশি যেতে পারতেন। একদিন তারা নির্যাতনের চিৎকার-কান্না শুনতে পান। তবে সে কান্নার শব্দ কোথা থেকে আসছে, কতলোকই বা কাঁদছে তা বুঝতে পারছিলেন না।

এটাই ছিল গুয়ান্তানামোর বন্দিদের নির্মম পরিণতি। নির্যাতন নিপীড়ন সবই চলতো মার্কিন আইন এবং মানবাধিকার মেনে। আমরা কয়েদীরা তাই এই পার্থিব নীতিহীন আদালতের উপর আশা ভরসা ত্যাগ করেছি। আল্লাহর আদালতের দিকে তাকিয়ে আছি। যেখানে আসল অপরাধীরা সব ধরা পড়বে। সে আমাদের ভিতরকার হোক বা তাদের। সে দিন শীঘ্রই আসবে ইনশাআল্লাহ্!

এই গল্পগুলো আমি একটি চিঠিতে লিখেছিলাম। যে চিঠিগুলো কারাগারের ভেতরে বসে লিখে বাইরে পাঠাতাম। ক্লাইভকে দিয়েছিলাম। পরে বুঝতে পারি চিঠিগুলো নিরীক্ষা কমিটির হাতে আটকে যায়। নিরীক্ষা কমিটি ক্লাইভকে এসব চিঠি গ্রহণেও নিষেধ করেন।

আমরা কয়েদীরা আমাদের ভাইদের ঠিকই চিনতাম। তারা ছিলেন প্রজ্ঞাবান। ধৈর্যশীল। মজবুত ঈমানদার। আল্লাহর প্রতি আস্থায় অবিচল। আমরা তাই সমস্বরে বলতে চাই, "তারা আত্মহত্যা করেনি।"

শক্তিশালী অস্ত্র

আমার একাকী বন্ধু। রাতের পাখি। হালকা ডানা ঝাপটিয়ে এসে বসে। অনুগত হয়ে। দুর্বল তার ডানা। সে দুর্বলতার মধ্যে শক্তিও আছে। আমার জীবন দিয়েই সেটা আমি বুঝেছি। জীবনের দু'টি দিক। ঠিক মুদ্রার দুই পিঠের মতো। দুদিক মিলেই আপনাকে কাজ করতে সাহায্য করবে। রাতের পর রাত প্রয়োজন হলে। আত্মসমর্পণ করতে, নতজানু হতে দেবে না। হবে হাতের লাঠি।

গুয়ান্তানামোতে অনশন ছিল আমাদের হাতের লাঠি। কার্যকর লাঠি। মোক্ষম অস্ত্র। যে অস্ত্র সবার আছে। যে অস্ত্র কিনতে টাকা লাগে না। লাগে না প্রতিপত্তি। সবাই এটা কিনতে পারে না। আমাদের অনেকেই কিনেছিল। তাদের মধ্যে আহমাদ আল মালিকি, আবদ আল রহমান আল মাদানি। দুই বছর তারা অনশন করেছিল। অন্যরাও করেছিল স্বল্প মেয়াদে। প্রশাসন আমাদের অনশন ভাঙতে বলত। আমরা এর জন্য অনেক কষ্ট সয়েছি। অনেক লাঞ্ছনার মুখোমুখি হয়েছি। কিন্তু আল্লাহর সাহায্যে আমরা অনড় থাকতে পেরেছিলাম।

একবার একটু অন্যরকম অনশন হয়েছিল। সবাই সে ঘটনাকে 'প্রাচীন কয়েদী অনশন' নামে স্মরণ করে। সে বার ক্যাম্পের মান বাড়ানোর দাবিতে অনশন করেছিলেন সবাই। তারপর থেকে আমাদের কথা বলার অনুমতি দেয়া হয়। সালাত আদায় সহজ হয়। খাবারের মানও কিছুটা বাড়ে। সেই আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন আব্দুল আজীজ আল কুয়েতি, শাকের আল মাদানি, রেজা আল তুনিশি এবং মুহাম্মদ রজব আল ইয়ামেনী।

যখন আমি অনশনে গেলাম। আমাকে আমার সেল থেকে অন্য আরেকটা সেলে বদলি করা হয় জোর করে খাওয়ানোর জন্য। একদিন যখন আমি আমার সেলে ফিরে আসলাম শুনতে পেলাম ক্যাম্প ফোরের ভাইয়েরা

অনশনের ডাক দিয়েছেন। ক্যাম্প ফাইভের ভাইদের প্রতি করা অন্যায়ের প্রতিবাদে।

ক্যাম্প ফাইভের বন্দিদের সবচেয়ে ভয়ংকর বলে গণ্য করে ওরা। এই ভবনে দু'টি ফ্লোরের সবগুলো সেলই নির্জন কারা প্রকোষ্ঠ। বৈদ্যুতিক দরজা। সবাই জানে ক্যাম্প ফাইভ তাদের জন্য তৈরি যাদের সারা জীবন এখানেই কাটাতে হবে।

জিজ্ঞাসাবাদকারীরা অসহযোগী বন্দিদের হুমকি দিত তাদের কথা মতো না চললে, মনমতো জবাব না দিলে কিংবা প্রতিবাদ করলে ক্যাম্প ফাইভে স্থানান্তর করে দিত। গুয়ান্তানামোতে এটাই ছিল সর্বোচ্চ শাস্তি। সেখানে বন্দিদের এতই ক্ষুধার্ত রাখা হয় যে তাদের কলা, কমলার খোসা পর্যন্ত খেতে হয়। শীত শুরু হলে অবস্থা আরো ভয়াবহ রূপ নেয়। তাদের এই কষ্টের প্রতিবাদে ক্যাম্প ফোরের ভাইয়েরা অনশনে যায়। এরপর অন্য ক্যাম্পের ভাইয়েরাও অনশনের ডাক দেয়। এভাবে পুরো গুয়ান্তানামোর সকল কয়েদীরা অনশনে যায়। অনশনকারীদের সংখ্যা বাড়তেই থাকে। অসুস্থ হতে থাকে। হাসপাতাল, ক্লিনিকে রোগীর ভিড় উপচে পড়ে। প্রশাসন চরমভাবে বিব্রত হয়। বিশেষ করে যখন সকল ক্যাম্পে অনশন ছড়িয়ে পড়ে। ক্যাম্প ওয়ান হতে ফোর সবগুলোতে। প্রশাসন কিছু কয়েদীর সাথে আলাপ করে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করে। কয়েদীরা সহযোগিতার আশ্বাস দেন। অসন্তোষভরে। প্রশাসনকে জানায় তারা তাদের দাবি বাস্তবায়নে শেষ বারের মতো সুযোগ দিতে চায়।

গুয়ান্তানামোর সবচেয়ে বিখ্যাত অনশন ছিল সম্ভবত 'স্ট্রাইক অব দ্য টিউবস'। অনশনটি হয়েছিল তিউনিশিয়ার ভাই হামযার সমর্থনে। যাকে একজন জিজ্ঞাসাবাদকারী চেয়ার দিয়ে আঘাত করে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল। অনশন শুরু হয় ২০০৫ সালের ১০ আগস্ট। ১০ দিনের মতো চলে। ক্যাম্প ফাইভের কয়েদীরাও তাতে সাড়া দিয়েছিল। সেটা ছিল এক মহানুভব অনশন। কয়েদীরা পুরোপুরি ঐক্যবদ্ধ ছিল। তাদের দাবিও স্পষ্ট ছিল। সমস্যার সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত তারা কোনো ধরনের সমঝোতায় যেতে অস্বীকৃতি জানায়।

প্রতিরক্ষা বিভাগের সাথে বাক্-বিতণ্ডার পর অনশন প্রত্যাহার করা হয়। ছয় মাস ধরে অব্যাহত থাকা কর্মসূচি বন্ধ করা হয়। প্রতিবাদ শেষ হয়ে

যায়। তবে তিনজন ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সকল দুঃখকষ্ট সহ্য করে তারা অনশন পালন করে যান। তারা হলেন, আহমাদ আল মাক্কি, আবদ আল রহমান আল মাদানি এবং সালাহ আল সালামী। সালাহ আল সালামী মারা গেছেন। আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন।

যাদেরকে কেন্দ্র করে এই অনশন তাদের কোমল আচরণে সবাই ছিল মুগ্ধ। অথচ ডাক্তাররা তাদের কষ্ট দেওয়ার এমন কোনো উপায় নেই যা অবলম্বন করেনি। শেষ পর্যন্ত ডাক্তাররা হেরে গিয়েছিল। কারণ তারা অন্যায়ভাবে তাদেরকে মেরে ফেলে। চিকিৎসক জিজ্ঞাসাবাদকারীরা যখন তাদের জোর করে খাওয়ানোর পরিকল্পনা করে তখন তারা অনশনের কথা গোপন রাখে। এভাবে গোপন অনশন পালন করাই তখন অবিচারের প্রতিবাদ করার একমাত্র মাধ্যম ছিল।

অনশনের এক রাতে। পরদিন সৌদির একটি বৃহৎ দলের এখান থেকে মুক্তি উপলক্ষে বিশেষ খাবার দেয়া হয়। আমাদের ভাইদের মুক্তি দেখে আমরা আনন্দিত হয়েছিলাম। সবাই তাদের মুক্তি উদ্যাপন করলাম।

পরদিন সকালে সৈন্যদের চিৎকার শুনে অবাক হয়েছিলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যে প্যারামেডিকস টিম এল। ভাই ইউসুফ আল সাহরিকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। তার অবস্থা গুরুতর। তিনি গোপন অনশন চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

প্রহরীরা কারাগারের ভিতর পর্যবেক্ষণ জোরদার করে। তার সেলে তল্লাশী চালায়। এক কপি কুরআন পায়। কিন্তু অন্য কয়েদীরা এই কুরআন সৈন্যদের হাতে দিতে চাচ্ছিলেন না। কিন্তু দোভাষী জানালেন প্রশাসনের নির্দেশ জনাব সাহারির সবকিছু নিয়ে যেতে। তারা মনে করে তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। তাই প্রশাসন সবকিছুর তদন্ত করে দেখতে চায়।

আমরা জানি তারাও জানে এসব তল্লাশীর, কুরআন অবমাননার হুমকি দেয়ার মূল উদ্দেশ্য শুধু কয়েদীদের হয়রানি করা। কারাগারের ভিতর অস্থিরতা তৈরি করা।

আগেও বলেছি কুরআন অবমাননা তাদের একটি প্রিয় কৌশল। তল্লাশী করার সময় সমস্ত ঘৃণা নিয়ে তারা কুরআন তল্লাশী করে। একবার এক সামরিক কর্মকর্তা সৈন্যদের বহর নিয়ে কারাগারের ভিতর দেখা করতে

আসে। আমাদের সাথে কথা বলে। কয়েদীদের পক্ষে কথা বলার জন্য সবাই আমাকে ঠিক করে। আমি তখন সেই অফিসারকে বললাম, প্রশাসন ও কয়েদীদের মধ্যকার নব্বই ভাগেরও বেশি সমস্যা তৈরি হয় সৈন্যদের কুরআন অবমাননা থেকে।

বললাম, "আমরা এই সমস্যা চাই না। সম্মানের সাথে আমাদের কুরআন হাতে নিন। ভাল করে তল্লাশী করুন। এরপর আবার আমাদের হাতে ফিরিয়ে দিন। ব্যাস, আর কোনো সমস্যা হবে না।"

"এত বড় ব্যাপারে আমি একা সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। আমাকে প্রশাসনের সাথে কথা বলতে হবে।" কর্মকর্তা বললেন।

তখন ছিল মধ্যরাত। তিনি বলে গেলেন সকাল হবার আগেই সিদ্ধান্ত জানাবেন। কিন্তু আমার সহকয়েদীদের সাথে আলাপ করলাম। তারা সবাই বললেন, হয় আমাদের থেকে 'কুরআন' সব নিয়ে নিতে হবে নয়তো আমাদের কাছের 'কুরআন' সৈন্যরা স্পর্শ করতে পারবে না-এই সিদ্ধান্ত নিতে আমি যেন তাকে বলি। আমি তাই বললাম বিনয়ের সাথে।

কর্মকর্তাটি কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এলেন। বললেন, "আমি জেনারেলের সাথে কথা বলেছি। তোমাদের সাথে সৈন্যরা যা করে তা খুলে বলেছি। তিনি 'কুরআন' তল্লাশী করে দেখার আইন সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে দেয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।"

সহকয়েদীদের আশ্বাসের কথা জানালাম। সবাই যার যার সেলে ফিরে গেলেন। স্বস্তি নিয়ে। কিন্তু প্রহরীরা আবার এসে 'কুরআন' তল্লাশী করতে শুরু করে। দিনটি সম্ভবত ২০০৬ সালের ১৮ মে। তারা ক্যাম্প ফোরের সকল সেল তন্ন তন্ন করে তল্লাশী করে। শুনতে পেলাম একজন ভাই বলল। সৈন্যরা যখন ইউনিফর্ম ব্লকে তল্লাশী করে তখন বলে, "তারা 'কুরআন' তল্লাশী করে দেখতে চায়। তারা তাদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকে। পীড়াপীড়ি করতে থাকে। প্রয়োজনে জোর করে হলেও তা করবে।"

বললাম, "যদি তারা তল্লাশী করে 'কুরআন' পায় তবে তারা কুরআন নিয়ে যাবে আর ফেরত দেবে না।" পরে তাই ঘটেছিল। সেলের সবাই এর প্রতিবাদ করি। তারা অগ্রাহ্য করে। তাদের কাজ তারা করেই যায়।

একই ব্যাপার ঘটে হুইস্কি ব্লকে, জুলু ব্লকে। জুলু ব্লকে কয়েদীরা সৈন্যদের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। জরুরি অবস্থা ডাকা হয়। ব্যাপক

সৈন্য সমাগম ঘটানো হয়। সশস্ত্র সৈন্য। তারা রাবার বুলেট ছোঁড়ে কয়েদীদের গায়ে। অনেকেই আহত হয়। আফগানি এক ভাইয়ের অবস্থা গুরুতর। তার পিঠে রাইফেলের আঘাত লাগে। প্রাথমিক চিকিৎসা নিলেও সে ব্যথা তার দীর্ঘদিন রয়ে যায়। আমরাও তাতে সাড়া দিই। সেলের ভিতরকার বিভিন্ন জিনিস ভাংচুর করি। এমনকি ক্যামেরাও ভাংচুর করি। ক্যামেরা প্রতি সেলেই ছিল। মোট কথা ক্যাম্প ফোরে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। পরে আমাদেরকে ক্যাম্প ফোর থেকে বিভিন্ন ক্যাম্পে সরিয়ে দেয়া হয়।

আমাকে বদলি করা হয়েছিল ব্র্যাভো ব্লকে। ভাইদের থেকে শুনলাম আমাদের কিছু কয়েদীকে তারা ক্যাম্প ওয়ানের আলফা, ব্র্যাভো এবং চার্লি ব্লকে বদলি করে আর অধিকাংশকে ক্যাম্প থ্রিতে বদলি করে। স্থান সংকুলান না হওয়ায়। আমরা এখবরও শুনলাম কিছু ভাইকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে তাদের অবস্থা গুরুতর বলে। আমরা উদ্বেগের সাথে অপেক্ষা করছিলাম। না জানি কোনো দুঃসংবাদ আবার আসে।

সেদিনের পর থেকে পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকে। বন্দিদের চারপাশে পাহারা আরো জোরদার করা হয়। সৈন্যদেরেকে আচার আচরণে আরো কঠোর হতে বলা হয়। প্রশাসনের নির্দিষ্ট ছকের বাইরে তারা যেন কোন উদারতা না দেখায় সেজন্যও বলা হয়। এরপর থেকে বেড়ে যায় খাবার সংকট, নির্মম পিটুনি, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, ধর্ম নিয়ে উপহাস।

কষ্টের এ দীর্ঘরাত যেন আর ফুরাবে না। ভোরের আলো যেন আর ফুটবে না। এসময়ই আমি ভাবতে শুরু করি কিছু একটা করার। আমার হাতের সবচেয়ে সেরা অস্ত্রটা ব্যবহারের। যার মাধ্যমে ফিরে পাব আমার আত্মসম্মান। যে আত্মসম্মান তারা নির্যাতনের স্টিমরোলারে পিষে ফেলেছে। আমি আমার সবচেয়ে দামি অস্ত্রটা তাদের দিকে তাক করি। কারা কর্তৃপক্ষের মুখের উপর। আমার যুদ্ধ চলে একবছর ও আরো কয়েকমাস। অনেক কষ্ট সহ্য করি। সত্যিই আমি অনেক যাতনা সয়েছি। কিন্তু হাল ছাড়িনি। মজলুমের শক্তি আমি তখন বুঝতে পারি। সে শক্তি আমাকে এগিয়ে যাওয়ার সাহস যুগিয়েছে। ধৈর্য ধরা শিখিয়েছে। জালিমের মুখের ওপর বাঘের গর্জন দিতে শিখিয়েছে। জঘন্য সে নরক, গুয়ান্তানামোতে।

মুহাম্মদ আল-আমিন আল শিনকিতী

ব্যথায় আমার হাঁটু ফুলে ওঠে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আমি সাক্ষাৎ পাই মৌরতানিয়ার কয়েদী মুহাম্মদ আমিন আল শিনকিতির। তিনি অনশন করছিলেন। অনশন করার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। পরবর্তীতে তার এ ঘটনা ক্লাইভকে বলতে চেয়েছিলাম।

বললেন, "ক্যাম্প ওয়ান, টু, থ্রির অনেক কয়েদী মূত্রনালীর সমস্যায় ভুগছেন। তার প্রধান কারণ স্বাস্থ্যসম্মত পানির অভাব। সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হলো ডাক্তাররা শুধু ঔষধ খেতে বলে পানি বিশুদ্ধকরণের কথা বলে না। ঔষধ আবার জিজ্ঞাসাবাদকারীদের অনুমতি ছাড়া দেয় না।

"একদিন কুইবেক ব্লকে অনশনের আইডিয়া মাথায় আসে। অনশন মানে তখন শুধু পানি পান না করা। যা পরবর্তীতে পূর্ণ অনশনে রূপ নেয়। কারণ এই দূষিত পানি বহু কয়েদীর স্বাস্থ্যের অবস্থা খারাপ করে দিয়েছে।"

আল শিনকিতি তখন আব্দুল্লাহ আল কাহতানি, আবু যিয়াদ আল মাক্কি, আদম আল ইয়ামেনী, বদর আল সুমাইরি এবং আরো দু'জনের সাথে অনশনে যাবার ব্যাপারে একমত হন। দু'দিন পর। আল শিনকিতি মাথা ঘুরে পড়ে যান। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ডাক্তার দেখেন তিনি প্রচণ্ড পানি শূন্যতায় ভুগছেন। তিনি তাকে পর্যাপ্ত পানি পান করতে বলেন। আল

শিনকিতি ডাক্তারকে তখন বলেন তিনি শুধু বিশুদ্ধ পানিই পান করবেন, কোনো ময়লা পানি নয় যা খেলে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে তা তিনি খাবেন না।

ডাক্তার তখন বিশুদ্ধ পানি অর্ডার দিয়ে আনার ব্যবস্থা করেন এবং তাকে খেতে দেন। বলেন, "এ পানি তুমি পান করতে পার। এটা হাসপাতালের বিশুদ্ধ পানি। আবার সেলে ফিরে গেলে সবার মতো একই পানি পান করবে।"

আল শিনকিতি পানি সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত পানি পান করতে অস্বীকৃতি জানান। ডাক্তার তাকে ফ্লুইড আইভি (একটি কষ্টকর থেরাপি) দেয়ার হুমকি দেন। তিনি ক্যাম্পে ফিরে আসেন এবং অনশন চালিয়ে যান।

তিনদিন পর আবার তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তার স্বাস্থ্যের চরম অবনতি ঘটে। একজন ডাক্তার তখন তাকে আইভি ফ্লুইডস দিয়ে হাসপাতালের বাইরে নিয়ে যেতে বলে।

ডাক্তার বলেন, "তুমি কি নিজেকে মেরে ফেলতে চাও?"

"রোগে শোকে মরার চেয়ে এভাবে মরা ভালো। আপনি যখন পানি পান করেন বিশুদ্ধ পানিই পান করেন। কিন্তু আপনি আমাদেরকে ময়লা দূষিত পানি পান করতে বলেন। আপনি এটাও লেখেন যে এ পানি খাবার উপযুক্ত নয়। এ পানি ভয়াবহ রোগের সৃষ্টি করে।"

শানকিতি তারপরও অনশন চালিয়ে যান। যতক্ষণ না প্রশাসন তার দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়।

আমার অনশন

আমি অনশনে যাবার সিদ্ধান্ত নিই। গুয়ান্তানামোতে তখন সম্ভবত ক্যাম্প সিক্স চালু হতে যাচ্ছিল। ২০০৭ সালের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ। সময়টা আমার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সে সময়কার দিন তারিখ মনে রেখে সব বলা এখন কঠিন। বিশেষ করে নির্জন কক্ষের বন্দিজীবন। প্রায় অন্ধকার। দিন রাত সমান। তারপরও আমি চেষ্টা করব স্মৃতির খেরোখাতা মেলে ধরতে।

অনশনের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম। প্রথমে খাবার কমিয়ে দিলাম। এরপর খাবারের সংখ্যা কমালাম। ধীরে ধীরে এক পর্যায়ে কিছুই খেতাম না। বহুল প্রত্যাশিত আমার পূর্ণ অনশনের দিকে আমি এগিয়ে চলেছি। যদিও আমার খাদ্যের অভাবে আমার অর্শ রোগ বেড়ে যাচ্ছিল প্রচণ্ড।

সব ধরনের খাবার ত্যাগ করি। এ খবর শুনে তারা পুরো সেল পরিষ্কার করে ফেলে। কেউ যাতে গোপনে আমাকে কোনো খাবার দিতে না পারে সেটাও নিশ্চিত করে। একজন কর্মকর্তা ও একজন ডাক্তার আমাকে দেখতে আসত। প্রতিদিন ব্লাড প্রেসার মাপত। কখনো দিনে তিনবার মাপত।

২০০৭ সালের ৬ জানুয়ারি। সকাল বেলা আমি জেনারেলের নিকট পাঁচটি দাবি পেশ করি।

প্রথম দাবি: ইসলামের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

দ্বিতীয় দাবি: জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী বন্দি আইনের আওতায় আমাদের নিয়ে আসতে হবে। কেননা বন্দি সুবিধা পাওয়া আমাদের মৌলিক অধিকার।

তৃতীয় দাবি: আমাদের বিচার বেসামরিক আদালতে নিয়ে যেতে হবে এবং আইনজীবী নিয়োগ করার অধিকার দিতে হবে।

চতুর্থ দাবি: ইকো ক্যাম্পে স্থানান্তরিত ভাইদের ফিরিয়ে দিতে হবে।

পঞ্চম দাবি: ২০০৬ সালের ১০ জুন রহস্যজনকভাবে তিন বন্দির মৃত্যু নিয়ে তদন্ত করতে হবে। এই দাবিগুলো জানাই। খাদ্য গ্রহণ বন্ধ রাখি।

প্রথম মাস। প্রশাসনের প্রাথমিক কৌশলের মুখে পড়ি। তারা আমার অনশনকে গুরুত্ব না দিয়ে আমাকে হতাশ করে দিতে চায়। হতাশ হয়ে আমি যেন আমার দাবি ত্যাগ করি। ক্ষুধা আর পিপাসা দিয়ে আরো চাপে

রাখতে চায় যদি আমি এসব ত্যাগ করেছি। মাস শেষে তারা আমাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে। বলে আমাকে শীঘ্রই ছেড়ে দেয়া হবে। আরো বলত: "তুমি একজন যুবক মানুষ। সামনে তোমার দীর্ঘ জীবন পড়ে আছে। নিজেকে শেষ করে দিও না। ইসলামে কি আত্মহত্যা হারাম নয়? তোমার পরিবার তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।"

বরং তারাই হতাশ হতো; আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার অশেষ রহমত যে তাদের সকল ষড়যন্ত্র আমি দুপায়ে দলতে পেরেছি। তাদের সকল প্রলোভন অগ্রাহ্য করতে পেরেছি। আমার অবিচল অনশনের মধ্য দিয়ে সে মাস শেষ হয়। তারা বুঝতে পারে যে পরের মাসেও আমি আমার অনশন চালিয়ে যাব। আমার ওজন তখন কমে গিয়েছিল। নব্বই কেজি থেকে ছাপ্পান্ন কেজিতে নেমে গিয়েছিল। তাই তারা আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

হাসপাতালে তারা আমার সাথে বিগত দিনের বিপরীত আচরণ করে। খাদ্য না দেওয়ার পরিবর্তে এখন তারা আমাকে জোর করে খাওয়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথমে তারা আমাকে পাইপ দিয়ে খাওয়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। দিনে কয়েকবার খাওয়াত। এরপর তারা পাইপ ব্যবহার না করার মনস্তাপ করেন। কারণ স্বাস্থ্যের আরো অবনতি ঘটতে থাকে।

এসময় তারা আমাকে হুমকি দিত, "তোমার সব কৌশলই ব্যর্থ হবে। তুমি নিজেই মারা যাবে খাবার না খেলে।"

ক্ষুধার অতল গহ্বরে আমি নিমজ্জিত হই। ক্ষুধা আমার মাংস থেকে হাড়ে নামে। কিন্তু আমি আল্লাহর প্রতি ছিলাম অবিচল। চুপচাপ থাকতাম। ডাক্তররা আমাকে দেখে নার্ভাস ফিল করত। এরপরই তারা আমাকে প্রথমবারের মতো জোর করে খাওয়ায়।

বিষণ্ণ দিন। ডাক্তার, নার্সরা আমার চারপাশ ঘিরে। শক্ত করে আমাকে ধরে রেখছে। ফোল্ডিং বিছানায়। আমার চার হাত পা ধরে রেখেছে যাতে নড়তে না পারি। মানবতার চরম অবমাননা করে। কষ্ট দিয়ে। তারা আমার নাকের মধ্যে পাইপ প্রবেশ করায় জোর করে। কষ্ট পাই; অবর্ণনীয় কষ্ট। ভীতিকর অবস্থা। শক্ত প্লাস্টিকের পাইপ নাকের নরম মাংসে আঘাত করে। দম যায় যায় অবস্থা। আমি আরো দুর্বল হয়ে পড়ি। সে পাইপ মুখের ভিতর হয়ে গলা দিয়ে নিচে নামে। খাদ্যনালীতে গিয়ে পৌছায়। ভিতরে আমার জ্বালাপোড়া শুরু হয়।

আমি জানি না তাদের সে কাজটি ইচ্ছাকৃত ছিল নাকি অনিচ্ছাকৃত। কিন্তু অসংখ্যবার তারা এ কাজ করেছে। ফোর্স ফিডিংয়ের পাইপ তারা পেটের মধ্যে না দিয়ে ফুসফুসের উপর দিয়ে রাখত। ফলে খাবারের কিছু অংশ ফুসফুসের উপর লেগে থাকত। আবার পেটের মধ্যে পাইপ গেলেও খাবার শেষ হয়ে যাবার পরও পাইপ দিয়ে রাখত। দীর্ঘক্ষণ। পেটে জ্বালাপোড়া হতো। পেট ফেঁপে থাকত। দুর্ভোগ বাড়তেই থাকে।

কষ্ট বাড়াতে একজন নার্স ইচ্ছা করে তরল খাবারের সাথে পানি মিশিয়ে দিত। তিন-চারবার এই কাজ করত। একমাস না খেয়ে শুকিয়ে যাওয়া পেট সে খাবার ধারন করবে কিভাবে? মৃত্যুর মতো অবস্থা হতো আমার। চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেত। শরীরের রং বদলে যেত। দম বন্ধ হবার উপক্রম হতো। সারা শরীর ঘেমে নেয়ে একাকার। এরপর মুখ ভরে শুরু হতো বমি।

যতক্ষণ মন চাইত তারা জোর করে খাওয়াতে থাকত। জোর করে করে খাইয়ে তারা কাগজে লিখে রাখত। প্রশাসনের কাছে হিসাব দিত। বারবার খাওয়াত যাতে বেশি সংখ্যা লিখতে পারে। আমার প্রচণ্ড পেট ব্যথাও তাদেরকে খাওয়ানো থেকে বিরত রাখতে পারেনি। তাদের চোখেমুখে নিষ্ঠুরতা। পাষাণ হৃদয়। সেখানে প্রথম দিনে আমার হাতের বাঁধন খুলে দেয়ার অনুরোধ করলাম। যাতে ইশারায় সালাত আদায় করতে পারি। তারা খুলে দিল না। নিরাপত্তার অজুহাত দেখাল। বলল হাত খুলে দিলে আমি সহিংস আচরণ করতে পারি। আমার কান্না ছাড়া আর কোনো উপায় থাকল না। "আমার মতো এ (হাত পা বাঁধা দুর্বল) অবস্থায় থেকে একজন মানুষ কিইবা আর করতে পারবে? নিরাপত্তার অজুহাত আমাকে দেখাবেন না!"

তারা প্রত্যুত্তর করল, "আমারা তোমাকে সালাত আদায় করতে দেব না।"

কক্ষে পিনপতন নীরবতা। মনে মনে আল্লাহকে স্মরণ করলাম। শুকরিয়া জানালাম, এত এত বিপদ দিয়ে তিনি আমাকে পরীক্ষা করছেন আবার দ্বীনের পথে অটল থাকার হিম্মতও দিয়েছেন।

হাসপাতালে কয়েকদিন থাকি। সময় যেন কাটে না। দিন রাত বুঝি না। রোগেশোকে কাতর। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা আমার হৃদয়ে রহম ঢেলে দিলেন। দিলেন সবরের মতো অমূল্য সম্পদ। ফোর্স ফিডিংয়ের

জন্য তারা আবার আসে। আমি লড়াই করে যাই। তাদের থামাতে পারিনি সত্য কিন্তু সহজেই জিততে দেইনি। এভাবেই চলতে থাকে হাসপাতালের শেষদিন পর্যন্ত।

আমার অনশন চলে চার স্তরে,

১। হাসপাতালে

২। ইকো এবং ইন্ডিয়া ব্লকে

৩। চার্লি ব্লকে

৪। ডেল্টা ব্লকে

সব জায়গায় কষ্ট। সর্বত্র প্রশাসনের ক্রোধাগ্নি। সবাই আমার মনের জোর কত দেখতে চেয়েছে। শেষ পর্যন্ত আমিই বিজয়ী হয়েছি। প্রথম ও শেষ ধাপগুলো ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ।

হাসপাতাল থেকে রিলিজ দিয়ে আমাকে ইকো ব্লক আর ইন্ডিয়া ব্লকে রাখা হতো। ইকো ব্লকে আমি থাকতাম আর ইন্ডিয়া ব্লকে ফোর্স ফিডিং হতো। ইন্ডিয়া ব্লকে অন্য কয়েদীদেরও জোর করে খাওয়ানো হতো। কিছুদিনের মধ্যেই প্রশাসন বুঝতে পারল অবস্থা উদ্বেগজনক পর্যায়ে চলে গেছে। ইকো ব্লকের কয়েদীদের সান্নিধ্য আমাকে অনশন চালিয়ে যাবার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

আনুমানিক প্রায় একমাস সময় সেখানে থাকার পর ইকো ব্লক থেকে চার্লি ব্লকে সেল নির্দিষ্ট করা হয়। সেখানে ইন্ডিয়া ব্লক থেকেও তিনজন অনশনকারী ছিল। তারা হলেন, আহমেদ আল মাক্কি, আব্দুর রহমান আল মাদানি এবং মুহাম্মদ আল শিনকিতি।

এরপর ফোর্স ফিডিংয়ের স্থানও বদল করা হয়। নতুন ঠিকানা হয় হোটেল ব্লক। চার্লি ব্লকের ঠিক বিপরীতে। আমি সে সময় চার্লি ব্লকেই ছিলাম। চার্লি ব্লকে সবাই নীরব। কারো মুখে কোনো শব্দ নেই । সম্ভবত আমরা সবাই ওদের অত্যাচারে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। অনশনকারী সবাই জানে ওদের শাস্তির ধরন, যা হবার তাই হয়। প্রতিবাদ করার শক্তি নেই। করেও লাভ নেই। আমাদের সবকিছু এখন কেড়ে নিয়েছে। জামাকাপড়, মাদুর এমনকি পরিবার থেকে আসা চিঠিপত্রগুলোও।

একপর্যায়ে প্রশাসন আইনকানুনে কিছুটা শিথিলতা আনে। আমাদের কিছু ভাই তাতে অনশন প্রত্যাহারও করে। কারণ তাদের কিছু শর্ত তারা

মেনে নেয়। কিন্তু এ বিরতি বেশি দিনের ছিল না। কিছু দিন পর আমরা বুঝতে পারি তাদের শর্তমানা ছিল নাটক। অনশনকারীরাও আবার অনশন শুরু করে। এবার অনশনকারীর সংখ্যা চার জন থেকে বেড়ে গিয়ে বিশজনে পৌছায় ।

এবার তারা আমাদের শাস্তি দেয়ার পরিকল্পনা করে। ডেল্টা ব্লকই সে জায়গা যেখানে তারা শাস্তি দেয়ার নামে অমানবিক কাজগুলো করত। তাই তারা সেখানে আমাদের অনেককে বদলি করে। রোমিও ব্লকের মতো করে সাজায়। ডেল্টা ব্লকের জানালাগুলো প্লাস্টিকের জালি দিয়ে ঘেরা। আর রোমিও ব্লকের জানালা এত শক্ত করে লাগাত যে দম বের হওয়াই মুশকিল। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে ও তারা এ অবস্থা করে রাখে।

ভারী মেশিনপাতির বিকট শব্দ শুনতে হতো দিনরাত। সৈন্যদের নির্যাতনের ঝড় উঠত সেলে। বেদম প্রহার চলত। ক্ষণে ক্ষণে যেন বাড়ত। নিথর দেহে শুধু সহ্য করে যেতাম। পেটাতে পেটাতে সৈন্যরা ক্লান্ত হয়ে যেত তবু থামত না। অনশনকারীদের চোখেমুখে পিপার স্প্রে করত তখন। তারা মাস্ক পরে নিতো কিন্তু আমরা ঘেমে নেয়ে উঠতাম। চোখের জ্বলুনি আবদ্ধ কক্ষে শতগুণে বেড়ে যেত। ঘুমানোর স্বপ্নও দেখতাম না। ভারী যন্ত্রপাতির বিকট শব্দ, নির্দয় নির্যাতনের যাতনায় কাতরাতে কাতরাতে রাত পার হয়ে যেত। একা একা অন্ধকারে শুধু হাঁতড়ে ফিরতাম আঘাতের চিহ্নগুলো!

অবশেষে মুক্তি

অবশেষে আমার মুক্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়। তখনো আমি অনশন করে চলেছি। সেসময় একেকটা দিন যেত আর আমি দুর্বল হয়ে পড়তাম। স্বাস্থ্যের অবনতি হতে থাকে, শেষ পর্যন্ত ক্ষীণকায় হয়ে পড়ি। মার্কিন সেনারা অনশন ভাঙতে বলত, চাপ দিত। জোর করে খাওয়াত। ভাবটা ছিল এমন, "ভদ্র ভাষায়তো বলছি অথচ কত কিছু করতে পারি আমরা।"

এপ্রিল মাস চলে আসে। মাসের শুরুতে একটি প্রতিনিধি দল আসে সুদান থেকে। তারা নিশ্চিত করে বলে যে আমি মুক্তি পাব। আরো দু'জন সুদানি মুক্তি পাবে, তাদের সঙ্গে। তারা বলে আমেরিকা চাচ্ছে আমি যেন আমার অনশন ভাঙি।

বললাম, "আমি অনশন ভাঙব না। যতক্ষণ না আমি আমার দেশে ফিরে যাই। যতক্ষণ এখানে আছি, অত্যাচারের দ্বীপে আছি ততক্ষণ অনশন ভাঙব না। জালিমের কাছে মাথা নোয়াব না। আমি আমার অনশন ভাঙব না। আমাকে মেরে ফেললেও না!"

তারা আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করে। কিন্তু আমি অনশন চালিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমি তাদেরকে সুদান এবং আমার পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তারা দেশের কিছু খবর বলে। পরিবার সম্পর্কে বলে যে, তারা ভালো আছে।

বুঝতে পারলাম মার্কিনিরা কেন আমাকে মোটা বানাতে চায় দীর্ঘদিন খাদ্যাভাবে রাখার পর, কেন যত্নআত্তি করছে দীর্ঘ লাঞ্ছনা-গঞ্জনার পর। তারা আমাকে মুক্তির আগে সুস্থ সবল করে ফেলতে চায়। কিন্তু আমার সন্দেহ হতো। তাদের মিথ্যা আশ্বাস আর প্রতারণায় আমরা অভ্যস্ত। তাই এ ব্যাপারে খুব আশাবাদী হতে পারলাম না। যতক্ষণ না বাস্তবিক অর্থে কিছু দেখি। যা বলছি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি। সব সৈন্যই অত্যাচারী ছিল না। দুএকজন এমনও ছিল যারা মারধর করত না। যদি সচেতন হোন তাহলে আপনার জানা থাকার কথা আমেরিকানরা বিভিন্ন জাত-ভেদে বিভক্ত। কেউ কেউ বুঝতে পারত এখানে অন্যায় হচ্ছে। তারা নির্যাতন ও অসমতার কথা জানত। বিশেষ করে যারা আফ্রিকান আমেরিকান। আমাদের নির্যাতনের সাথে (নিগ্রো হিসেবে) তাদের অতীত নির্যাতনের মিল তারা খুঁজে পেত। বিশেষ করে তাদের গায়ের রং আর আমার গায়ের রং যখন একই। তাদের কেউ কেউ আমাদের সাথে উত্তম আচরণ করত। অন্তত সম্মিলিত দানবীয় অত্যাচারে অংশ নিত না।

তারা কখনো কখনো আমাদের নানা খবরাদি পৌঁছে দিত। তাদের একজন জানাল শীঘ্রই আমি মুক্তি পেতে যাচ্ছি। সম্ভবত এপ্রিলের মাঝামাঝিতে। তারা আমাকে এ খবর দেয় যখন সুদানি প্রতিনিধি দল গুয়ান্তানামোতে হাজির হয়। তাই এবার কিছুটা আশাবাদী হলাম। আমি এক সুদানিকে জিজ্ঞাসা করলাম সে সম্ভাব্য তারিখের কথা।

তিনি বলল, "সময় এখনো নির্ধারিত হয়নি। যেকোনো মুহূর্তেই হয়ে যেতে পারে। তুমি শীঘ্রই মুক্তি পাচ্ছ।"

২০০৮ সালের ২৮ আগস্ট। গত আট নয় মাসের মধ্যে এই প্রথম তারা আমাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকে। জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়।

"আমরা আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই। গুয়ান্তানামো ত্যাগ করার পর আপনি কী করবেন?"

"কঠিন প্রশ্ন," বললাম। "আপনারা বাইরের দুনিয়ার খবর নিতে দেননি। আর আমি এখন সিদ্ধান্ত নিতেও পারব না কী করব যতক্ষণ না জানি পৃথিবীর অবস্থা কী। ঠিক এই মুহূর্তে যেখানে বসে আছি সেখান থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না যে আমি ঠিক কী কাজ করব।"

"তবে আমার সবচেয়ে বেশি নজর থাকবে আমার পরিবারের প্রতি। বহু বছর ধরে তাদের শূন্যতা অনুভব করছি। আমার পরিবার, আমার পুত্র সন্তানকে সান্নিধ্য দেবার উপযুক্ত কোনো কাজ খুঁজে নেব। যেহেতু অনেক বছর হলো আমরা আলাদা রয়েছি। আমি আমার সন্তানকে খাঁটি মুসলিম হবার শিক্ষা দেব। সে এমন মুসলিম হবে যে অত্যাচার করে না। আমি তাকে এমনভাবে গড়ে তুলতে চাই, যে তার ধর্মের প্রতি হবে একনিষ্ঠ আবার সমাজের প্রতিও হবে দায়বদ্ধ।

"কোথায় তুমি কাজ খুঁজবে? কিভাবে নিজের জীবিকা নির্বাহ করবে?"

"আল্লাহ আমাদের উত্তম অভিভাবক। এই কারাগারেও তিনি আমাদের দেখভাল করেছেন। মুক্ত হবার পর তিনিই আমাদের উত্তম ব্যবস্থা করে দেবেন।"

"এই উত্তর যথেষ্ট নয়। আমাদের অফিসিয়াল কাগজে স্পষ্ট করে লিখতে হবে তুমি কী করবে।"

"আমি তো আপনাকে বললাম। আপনাদের মনমতো হলো কি হলে না সেটা আমার দেখার বিষয় নয়। এটাই আমার উত্তর। আপনারা জানেন, জিজ্ঞাসাবাদের সময় আমাদের মনে কী কথা আছে তা শুনতেন না আপনারা। শুধু আপনাদের পছন্দসই জবাব দিতে হতো। দীর্ঘদিন ধরে মনের গহীনে এ জবাবই প্রস্তুত ছিল আমার।"

"ভালো" তারা বলল, এখন আরেকটি প্রশ্ন, "আপনি কি এখনো সাংবাদিক হিসেবে কাজ করতে আগ্রহী? তাহলে আমরা আপনার কাছে চাইব আপনি বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কথা বলবেন। আপনি কি এ কাজ করতে প্রস্তুত আছেন? আপনার সমাজের জন্য, বিশ্বের জন্য সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কথা বলে কি আমাদের সাহায্য করবেন না?"

"যেহেতু আমার কাজ মিডিয়ায়, আমি আমার সর্বোচ্চ দিয়ে সব ধরনের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কথা বলব। এমনকি আপনাদের সন্ত্রাসের কথাও বলব। আফগান ইরাকে নিরীহ মানুষদের হত্যা করে চলেছেন আপনারা। আমি আমার সাংবাদিকতা দিয়ে সন্ত্রাসবাদের মুখোশ উন্মোচন করে দেব।"

"হ্যাঁ, তাহলে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় আপনি আমাদের সাথে হাতে হাত রেখে কাজ করছেন।"

"আমি আপনাদের হাতে হাত রাখছি না। আপনাদের হাতে রক্ত লেগে আছে। আমার স্বজাতির রক্ত, আমার মাটির রক্ত। যা বিভৎস। সামান্য সন্দেহের বসে, কোনো কারণ ছাড়াই আমার জীবনের ছয়টি বছর নষ্ট করেছেন আর এখন আশা করছেন আমি আপনাদের হাতে হাত রাখব?"

"তার মানে তুমি এখনো আমাদের সাথে কাজ করতে অস্বীকার করছো?

"অতীতেও আমি তোমাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি। এখনো করছি। ততদিন প্রত্যাখ্যান করে যাব যতদিন তোমরা আমার ভাইদের ওপর অত্যাচার করে যাবে। নিরীহ মানুষদের হত্যা করে যাবে। আমাদের বোনদের বিধবা করে যাবে। মুসলিদেরকে উৎপীড়নের নিশানা বানাবে। দেশে দেশে সরকারকে চাপ দেবে আমাদের ভাইদের ওপর নির্যাতন চালাতে। অত্যাচারী অবৈধ সরকারগুলোকে তোমরা সমর্থন দিয়ে যাবে। তোমাদের দ্বৈতনীতিই আমাকে তোমাদের থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। আমি তোমাদের সাথে কাজ করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম।"

এরপর সে রিভিউ কমিটি জানাল, তারা আমাকে মার্কিন স্বার্থবিরোধী কাজে জড়িত নই, হুমকি নই বলে ঘোষণা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমি হেসে উঠলাম, অট্টহাসি। জিজ্ঞেস করল হাসির কারণ। বললাম,

"সাত বছর আগেই আমি জানতাম আমি কারো জন্য হুমকি নই। এমনকিছু কখনোই করিনি যার কারণে কেউ বলতে পারে আমি কারো জন্য হুমকি। আমেরিকার কেউ বলতে পারেনি। তোমরা দাবি করলে আমি নাকি হুমকি। আর এখন বলছো আমি হুমকি নই।"

"মার্কিন সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তোমাকে তোমার দেশের কাছে হস্তান্তর করবে, সুদানে। এ ব্যাপারে তোমার কোনো কথা আছে?"

"আমার কোন কথা নেই। বরং এটাই আমি গত সাত বছর ধরে চেয়ে আসছিলাম।"

এরপর তারা আমার অনেকগুলো মেডিকেল টেস্ট করাল। আমার ফিংগার প্রিন্ট নিল। যেভাবে সিআইএ, এফবিআই ও সামরিক বাহিনী নেয়। প্রতিবার তারা তিনবার করে নিত। আই স্ক্যানও নেয়। সাথে একটি ছবি। তারা আমাকে একটি নির্জন কক্ষে নিয়ে গিয়ে আমার জামাকাপড়ের সাইজ নেয়। এরপর কিছু জামাকাপড় দিলে আমি আমার সেলে চলে আসি। ডেল্টা

ব্লকে নেয়ার পরিবর্তে তারা আমাকে চার্লি ব্লকে নিয়ে আসে। ডেল্টা ব্লকে আরো কয়েকজন অনশনকারী ছিল। চার্লি ব্লক ডেল্টা ব্লকের ঠিক পাশেই।

তারা আমাকে একটি সেলে নিয়ে রাখে। দরজার ফাঁক দিয়ে আমি পার্শ্ববর্তী কয়েদীদের সাথে আলাপ করি। সেখানে আটজন কয়েদী ছিল। দু'জন সুদানি। একজনের নাম ওয়ালিদ আল সুদানি আরেকজন আমির আল সুদানি। একজন মরোক্কান সাইয়েদ আল মাগরিবি ও আরো পাঁচ আফগানি। সবমিলিয়ে আমরা ছিলাম নয়জন।

মুক্তির ঠিক আগের দিন। তারা আবার আমাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যায়। বলে, "আপনি এখন চলে যাচ্ছেন। যদি আল কায়েদা আপনার সাথে যোগাযোগ করে তবে আপনি কী করবেন? আপনি কি আমাদের সাথে তখন যোগাযোগ করবেন? আমাদেরকে সবকিছু জানাবেন?"

"কোন ব্যাপারে কথা বলছেন ঠিক বুঝি নি?"

"আমরা বলতে চাইছি যদি ওসামা বিন লাদেন আপনার নাম্বারে ফোন দেয়। যদি বলে আমি এখানে এই হোটেলে আছি তুমি দেখা কর। তখন কী করবেন?"

"আপনি কি বোকা? কিভাবে ভাবেন ওসামা বিন লাদেন হোটেলে থাকবেন? আর যদি তাই হয় তবে তো আপনারাই আমার আগে জেনে যাবেন এবং তাকে গ্রেপ্তার করবেন।"

"সুন্দর বলেছেন। তবে ধরুন সে কোন এক জায়গায় আছে। আর আপনাকে বলা হলো তার সাথে সাক্ষাৎ করতে। তখন কি খবরটা আমেরিকাকে জানাবেন?"

"আমি আমেরিকাকে জানাব না।"

"কেন জানাবেন না? আপনি তো বলছেন আপনি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কাজ করবেন এবং শান্তির পক্ষে থাকবেন।"

"কারণ আমি একজন সাংবাদিক, গোয়েন্দা নই। সাংবাদিককে তার পেশার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হয়। আমরা কখনো কোনো পুলিশবাহিনীর সাথে হাত মেলাই না। এতে তারা আমাদের কাজে সহযোগিতা করুক বা না করুক। আমরা কাজের প্রয়োজনেই তাদের সাথে সম্পর্ক করি। তাদের মতামতকে সম্মান জানাই। অন্যদের মতকেও।"

"ওসামা বিন লাদেন মানুষ মারতে চায়।"

"কে বলেছে?"

"আমরা জানি সে কী চায়..."

"বিন লাদেন কী চায়?"

এক নারী সেনা উত্তর দেয়, "বিন লাদেন জোর করে মানুষকে মুসলিম বানাতে চায়।"

"বিন লাদেনকে কখনোই এমন কথা বলতে শুনিনি। আমার অন্তরীণ থাকা অবস্থায় হলে ভিন্ন কথা।"

"আচ্ছা ঠিক আছে। যদি বিন লাদেনের সাথে সাক্ষাতের চিঠি আসে তখন তুমি কী করবে?"

"আমি পূর্ণোদ্যমে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। কেন করব না? আমার আগেও অনেক সাংবাদিক তার সঙ্গে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাক্ষাৎ করেছে। ওসামা বিন লাদেন বিশ্বজুড়েই একজন ব্যাপক পরিচিত মুখ। যেকোন সাংবাদিকই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইবে। এমনকি আপনিও চাইবেন তার সাথে আপনার সাক্ষাৎ হোক।"

"না, আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই না।" নারী জিজ্ঞাসাবাদকারী বললেন।

বললাম, "আপনাকে একটা প্রশ্ন করি। ধরুন দু'টি দরজা আছে। এক দরজা দিয়ে ঢুকে আপনি জর্জ বুশের ছবি তুলতে পারবেন। আরেক দরজা দিয়ে ঢুকে ওসামা বিন লাদেনের। আপনাকে একটি দরজা পছন্দ করতে বলা হলে আপনি কি ওসামা বিন লাদেনকে পছন্দ করবেন না?"

নারী সেনার জবাব, "না, আমি বুশকে পছন্দ করব। কিন্তু তুমি কেন আমার মতো বুশকে পছন্দ করবে না?"

"কারণ, আপনি বুশের সাক্ষাৎকার তার অফিসে গিয়ে নিয়ে আসতে পারবেন। তার মেয়াদকাল শেষ হলে তাকে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে খুঁজে পাবেন যেকোনো সময়। কিন্তু আপনি ওসামা বিন লাদেনের সাথে সবসময় সাক্ষাৎ করতে পারবেন না! সিআইএ তো সাত বছরে তার টিকিটিও খুঁজে পায়নি। তাই আপনার সাক্ষাৎ বুশের চাইতে ওসামা বিন লাদেনের সাথে হওয়াই বেশি যুক্তিসম্মত।

দ্বিতীয় জিজ্ঞাসাবাদকারী বললেন, "আপনি ঠিক বলেছেন। আমিও বিন লাদেনের সাথে সাক্ষাৎ করতাম।"

"সেটাই তো হওয়া উচিত", বললাম।

"আপনার কি আর কিছু বলার আছে?" তারা জানতে চাইল।

একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। বললাম "কেন আমাকে এত তড়িঘড়ি করে মুক্তি দেয়া হচ্ছে? আমার অত তাড়া নেই। আপনারা আমার অনেক ক্ষতি করে ফেলেছেন। শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি ছাড়াও আমার পরিবারের উপর গেছে বড় রকমের ধকল।"

"আপনি কি বুঝতে পারছেন না সারা বিশ্বের বিভিন্ন মিডিয়ার সাংবাদিকরা গুয়ান্তানামোতে প্রবেশের জন্য চাপ সৃষ্টি করছে? কয়েদীদের সাথে কথা বলতে চাইছে? আমরা তাদেরকে এখানে প্রবেশ করতে দেব না। কিন্তু আপনি। আপনি, আমাদেরকে বাধ্য করছেন। প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করছেন।"

বললাম, "দয়া করে আপনাদের উর্ধ্বতন অফিসারদের কাছে আমার ধন্যবাদ পৌঁছে দেবেন। বলবেন, কয়েদী ৩৪৫ আপনাদের আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছে। এই আতিথেয়তা সে কখনো ভুলবে না।"

"বন্দিত্বের আগে আমি অনেকের কাছেই ছিলাম অপরিচিত। এখন আপনারা আমাকে সেলিব্রেটি বানিয়ে দিয়েছেন। একজন সাংবাদিক পঞ্চাশ বছর সাংবাদিকতা করার পর জীবনের স্মৃতিগাঁথা লেখে। কিন্তু আমি গুয়ান্তানামোতে বসেই বুঝতে পারছি বহু মানুষ আমার জীবন সম্পর্কে জানতে চাইবে।"

গুয়ান্তানামো আমার জীবনের কালো অধ্যায়। আমি এর সব কিছুই লিখে রাখব। পৃথিবী জানবে মানবতার বিরুদ্ধে কি জঘন্য অপকর্ম আপনারা করে চলছেন। আপনাদের ঠিকানা দিন। আমার লেখা বইয়ের এক কপি যাতে পাঠাতে পারি। আপনারা তো ফিল্ম দেখতে পছন্দ করেন। আশা করি গুয়ান্তানামো নিয়ে একটি ফিল্মও আপনারা দেখবেন। একাধিক ফিল্ম দেখবেন ইনশাআল্লাহ। এখান থেকে বের হবার পর।"

তারা হাসল। আমি চলে এলাম। পরে যখন আমি বাসে উঠতে যাচ্ছি তখন তাদের দেখলাম, হাসলাম। চিৎকার করে বললাম, "তোমরা কোন কক্ষে প্রবেশ করেছ বুশেরটাতে নাকি বিন লাদেনেরটায়?" সৈন্যরা আমাকে জোর করে বাসের ভিতর ঠেলে দেয়। জিজ্ঞাসাবাদকারীদের জবাব আর শুনতে পাইনি।

পরদিন। কারা কর্তৃপক্ষ এলো। আমাকে রেডক্রসের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাতৎ করাতে নিয়ে গেল। রেডক্রস আমার যাবতীয় কাগজপত্র নিয়ে এসেছে। ট্রান্সপোর্ট ব্লকে তিনদিন থাকার পর চতুর্থদিন সন্ধ্যায় আমরা যাত্রা শুরু করলাম। বৃহস্পতিবার রাতে ২০০৮ সালের ৩০ এপ্রিল। কিছু সৈন্য আমাদের দেখতে এলো। সন্ধ্যার একটু পর। তাদের মধ্যে সে সৈন্যটিও ছিল যে আমাকে প্রথম আমার মুক্তির তারিখ জানিয়েছিল। সে আমাকে সবসময় 'আল জাজিরা' বলে ডাকত।

সে বলল, "হেই আল জাজিরা! তুমি নাকি কাপড় বদলাতে অস্বীকার করেছ?"

আমি তখন কমলা রঙের জামা পরে ছিলাম। যা অনশনের সময় পরিধান করি। মুক্তি পেতে যাওয়া কয়েদীদের জন্য সাদা কাপড় আমি পরিনি। তারা আমাকে এই কাপড় পরা অবস্থায় শাস্তি দিয়েছে।

জিজ্ঞেস করলাম, "কে বলল?"

সে তার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল, "আমাকে বল! সাদা কাপড় পড়তে অস্বীকার করেছ কিনা?"

আমিও আবার জিজ্ঞেস করলাম, "তোমাকে কে বলেছে?"

সে মাথা নেড়ে বলল, "আমি বুঝতে পেরেছি।" এরপর চলে গেল।

দেড় ঘণ্টা পর সৈন্যরা এল। আমাকে ফোর্স ফিডিং করাবে। আমার হাত পায়ে শেকল পরাল। যদিও তারা আমাকে তখন আমার সেল থেকে নিয়ে এসেছে। তারপরও তারা আমাকে টর্চার চেয়ারে বসায়। আমার দুর্বল শরীর সত্ত্বেও ১২টি চাবুকের বাড়ি দেয়।

নার্সরা যখন আমার নাসিকারন্ধ্রে ফিডিং পাইপ প্রবেশ করাতে যাবে তখনই আমাকে আল জাজিরা বলে ডাকা সৈন্যটি এসে হাজির। তার সঙ্গে কয়েকজন সিনিয়র কর্মকর্তা। তারা যাত্রা পথে পরিধানের জন্য জামাকাপড় ও জুতা নিয়ে এসেছে।

প্রশাসন সাধারণত যাত্রার দেড় ঘণ্টা আগে ছাড়া জামা জুতা পড়তে দেয় না। সেদিন আগে চলে এল। সন্ধ্যার এক-দুই ঘণ্টা আগে। সেই সৈন্যটি আমাকে বলল জামাকাপড় পরে নিন। বাথরুমে গিয়ে পরে আসুন। গোসলও করে নিন।

"ফোর্স-ফিডিংয়ের পর?" জিজ্ঞেস করলাম।

"না, এখনি যান।"

"সে আমাকে চোখে ইশারা করল। আমিও তাকে চোখে ইশারা করলাম। উপস্থিত কয়েকজন মিলে আমাকে চেয়ার থেকে নামাল। কিন্তু হাত পায়ের শৃঙ্খল খুলে দিল না। বাথরুমে নিয়ে গেল। বরাবরের মতোই প্রহরীরা দাঁড়িয়ে থাকল বাথরুমের সামনে। কিন্তু আমার বন্ধু, সেই সৈন্যটি অন্য সৈন্যদের মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়াতে বলল। "আমি দেখছি। তোমরা মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়াও।"

"গোসল করে নিন। আমি আপনাকে নতুন কাপড় দিচ্ছি।"

জিজ্ঞেস করলাম, "কেন? কী হয়েছে?"

সে মাথা নিচু করে কানের কাছে এসে বলল, "এখানে অনেক অফিসার আছে যারা আপনার মুক্তি চায় না। তারা আপনার ব্যাপারে নালিশ করেছে যে কয়েদী ৩৪৫ কাপড় বদলাতে অস্বীকার করেছে। তারা অজুহাত খুঁজছে আপনার যাত্রা বিলম্বিত করার। কিন্তু আমি আপনার মুক্তি পর্যন্ত পাশে আছি।

কাপড় বদলালাম। ফিডিং চেয়ারে ফিরে আসলাম। ফিডিংয়ের পর আমার সেলে ফিরে আসি। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে যাত্রার অপেক্ষা। ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। যাত্রা পর্যন্ত শুয়েই থাকলাম।

সন্ধ্যা ৬টা কি ৭টা হবে। একসাথে মাগরিব ও এশা আদায় করে নিলাম। সেই সৈন্যের সাথে বের হলাম। একসাথে হাঁটছি। শেকল তখনো পরা। আমার বন্ধু সৈন্যটি সঙ্গেই থাকল। যদিও তার শিফটের ডিউটি শেষ। বাসে চড়া অবধি সেখানে সে থাকল। বাসে উঠলাম। গাড়ি ছাড়লে সে হাত নেড়ে বিদায় জানাল। এক ঘণ্টার মতো গাড়ি চলল। একটি দ্বীপে এসে থামল। সেখান থেকে ফেরিতে। ফেরি পার হয়ে আরেক দ্বীপে। যে দ্বীপে আছে বিমানবন্দর।

সেখানে অপেক্ষা করছে একটি সামরিক কার্গো বিমান। বিমানে উঠিয়ে তারা আমাদের চোখে কালো চশমা পরিয়ে দেয়। মুখে মুখোশ পরায়। কানে ইয়ারফোন। এরপর তারা আমাদেরকে চেয়ারে বসায়। ফ্লোরে স্টিলের আংটার সাথে বেঁধে দেয়। আবারো আমরা বিমানে নড়াচড়ার অনুমতি পাই না।

আমি বাথরুম চাপার কথা বললাম। তারা আমাকে নিয়ে গেল। কিন্তু যখন চোখের চশমা খুলে ফেলার অনুমতি চাইলাম তা দেয়া হলো না। বললাম, "কিভাবে আমি বাথরুম করব যদি চোখে কিছু না দেখি?"

"আমরা তোমাকে বাথরুমের আসনে বসাব তুমি ঠিক ঠিক বসে যাবে। আমরা সাহায্য করব।"

আমি দ্বিমত করলাম। বললাম: "আমি দরজা বন্ধ করতে চাই।"

"এখানে বন্ধ করার মতো কোনো দরজা নেই। জায়গাটি পুরোপরি ওপেন।"

নিজেকে আড়াল করার একটা কিছু চাইলাম। তারা দিল না। তাই বললাম আমাকে আমার সিটে নিয়ে চল। তারা তাই করল। অন্য ভাইদেরও ব্যাপারটা জানালাম। আমি তাদের অবস্থাটা একটু যাচাই করলাম। আমি পূর্ণ অনশন পালন করেছি। আমার পেটে কিছুই নেই। তাই টয়লেট তেমন চাপেনি। আমি শুধু দেখতে চেয়েছি তাদের আচরণে কোনো পরিবর্তন হয়েছে কিনা। কিন্তু না, কোনো পরিবর্তন হয়নি। দীর্ঘ আঠারো ঘণ্টার যাত্রাপথে ছিলাম পিপাসার্ত ও ক্ষুধার্ত। দুই ঢোক পানি ছাড়া আর কিছুই পেটে ঢোকেনি।

মার্কিন পরিকল্পনামাফিক বিমান ইরাকে অবতরণ করে। সেখান থেকে আমাদের বিভিন্ন বিমানে তোলা হয়। পাঁচ আফগানি আফগানিস্তানের বিমানে। আমিসহ দুই সুদানি আর মরোক্কান কয়েদীটি খার্তুমের বিমান ধরি।

বিমান খার্তুমের মাটি স্পর্শ করে। দিনটি ছিল শুক্রবার। জুমাবার। পবিত্র দিন। আলহামদুলিল্লাহ! রহমতের এদিনে মুক্তি দিলেন পারওয়ারদিগার!

শেষ কথা

খার্তুমে অবতরণ করার পর কী ঘটে তা নিয়ে আল জাজিরার বিখ্যাত ডকুমেন্টারি রয়েছে। সেদিন উচ্ছ্বসিত জনতার ঢল নামে বিমান বন্দরে, আমাকে শুভেচ্ছা জানাতে। ক্যামেরা তাক করা আমার দিকে। হেঁটেহেঁটে আসছি। একজন মুক্ত মানুষ হিসেবে। নিজের দেশে। এক দিক থেকে আমি ভাগ্যবান। এত মানুষ আমাকে দেখতে এসেছে। হাসপাতালে বসেও আমার শুধু এই স্মৃতি মনে পড়ত। বিমানবন্দর থেকে আমাকে সোজা হাসপাতালে নেয়া হয়। কয়েকদিন থাকতে হয় সেখানে।

আমি এতই দুর্বল, স্বাস্থ্য এতই খারাপ ছিল যে বিমান বন্দরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই। এরপর তৎক্ষণাৎ আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালের বেডে চোখ মেলে দেখি আমার স্ত্রী। সাত বছর পর। দেখি আমার পুত্রকে আমার দিকে দৌড়ে আসছে। দুহাতে জড়িয়ে ধরলাম। চোখে অঝোর ধারা নামে আমার। অনেকক্ষণ বুকে জড়িয়ে রাখি। এরপর মুখ দেখি। অদ্ভুত এক মুহূর্ত। অভূতপূর্ব দৃশ্য!

মুহাম্মদকে জড়িয়ে যখন বসে আছি তখন খেয়াল হলো আমি আসলে গত সাত বছরে কোনো শিশুকেই দেখি নাই। কি দুঃখের কথা! কতটা কষ্টকর এ কথা মনে করা! কি ভয়ংকর জায়গাতেই না ছিলাম আমি এতটা বছর!

হাসপাতালে কয়েকদিন থাকার পর, খার্তুমে আমার হাঁটার ভিডিও দেখানো হয়। দীর্ঘদিন পর আমি আমার নিজের মুখ দেখি। দেখি বহু রাত না ঘুমানো, বিধ্বস্ত এক মানুষ। যে মানুষটিকে দেখার জন্য দাঁড়িয়ে আছে

বিপুল উৎসুক জনতা। জনতার ঢল দেখে আমি আবেগতাড়িত হয়ে পড়ি। দুর্বল শরীরের কারনে হাঁটতে হাঁটতে বসে পড়ি।

গুয়ান্তানামো নিয়ে সংক্ষেপে যদি বলি তবে বলতে হয় গুয়ান্তানামো আমার একার গল্প নয়। সেখানে আট শতাধিক কয়েদী। নরকতুল্য কারাগার। প্রত্যেককেই নিজের মতো করে সংগ্রাম করতে হয়। প্রত্যেকেরই আলাদা গল্প রয়েছে। একসাথে আমরা থেকেছি। একই কষ্টে পুড়েছি। একই অবিচার, অত্যাচারের মুখোমুখি হয়েছি। একই লাঞ্ছনা সয়েছি। একই যন্ত্রণা ভোগ করেছি।

দু'আর মধ্য দিয়ে আমি আমার গল্প শেষ করব। দু'আ করব এমন মানুষদের জন্য যাদের সাথে আজ সাক্ষাৎ হলো না। কায়মনোবাক্যে দু'আ করি আল্লাহ যেন শেষ বিচারের দিনে তাদেরকে সহজে পার করে দেন। আমি আমার বাবা-মার কথা বলছি। যারা কারা অন্তরীণ থাকাকালে আমার জন্য প্রতিনিয়ত দু'আ করে গেছেন। কিন্তু মুক্ত হবার আগেই তারা আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন। আমি আমার পরিবারকে ধন্যবাদ জানাই যারা আল জাজিরার কাছে থেকে ধৈর্য ধারণ করেছেন। ধন্যবাদ জানাই সেসব সম্মানিত মিডিয়া ব্যক্তিদের, মিডিয়া কমিউনিটিকে যারা আমার মুক্তির জন্য কাজ করে গেছেন। আর সাধারণ মানুষকে যারা আমাকে সবসময় সমর্থন করে গেছেন। সবার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা। সবার জন্যই আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করি।

আমি আমার গল্প সমর্পণ করছি সবাইকে। যে গল্প অবিচারের। যে গল্প যাতনার।

সমাপ্ত

প্রজন্ম পাবলিকেশনের বইয়ের তালিকা

বিশ্ব রাজনীতি

১. আফিয়া সিদ্দিকী: গ্রে লেডি অব বাগরাম
সংকলন: টিম প্রজন্ম

২. দ্য কিলিং অব ওসামা
লেখক: সিমর হার্শ

৩. আয়না: কাশ্মীরের স্বাধীনতার প্রতিচ্ছবি (প্রকাশিতব্য)
লেখক: আফজাল গুরু

৪. গুজরাট ফাইলস: এক ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের ময়নাতদন্ত
লেখক: রানা আইয়ুব, *সাংবাদিক*

৫. উইঘুরের কান্না (প্রকাশিতব্য)
লেখক: মুহসিন আব্দুল্লাহ, *সাংবাদিক*

৬. কান্দাহারের ডায়েরি (প্রকাশিতব্য)
লেখক: রবার্ট গ্রেনিয়ার, *সাবেক সিআইএ ষ্টেশন চীফ*

৭. আফগানীদের চোখে আমেরিকা, তালেবান ও আফগান যুদ্ধ (প্রকাশিতব্য)
লেখক: আনন্দ গোপাল, *সাংবাদিক*

জীবনী

১. শৈশবের বঙ্গবন্ধু (প্রকাশিতব্য)
লেখক: ওয়াহিদ তুষার

থ্রিলার

১. ব্লড হেয়ার ব্লু আইজ
লেখক: ক্যারিন স্লাথার

২. হেই ড্যাড মিট মাই মম (প্রকাশিতব্য)
লেখক: সন্দীপ শর্মা, লিপি আগরওয়াল

৩. মার্ডার ইন এ মিনিট (প্রকাশিতব্য)
লেখক: সৌভিক ভট্টাচার্য

গুয়ান্তানামো নিয়ে সংক্ষেপে যদি বলি তবে বলতে হয় গুয়ান্তানামো আমার একার গল্প নয়। সেখানে আট শতাধিক কয়েদী। নরকতুল্য কারাগার। প্রত্যেককেই নিজের মত করে সংগ্রাম করতে হয়। প্রত্যেকেরই আলাদা গল্প রয়েছে। একসাথে আমরা থেকেছি। একই কষ্টে পুড়েছি। একই অবিচার, অত্যাচারের মুখোমুখি হয়েছি। একই লাঞ্ছনা সয়েছি। একই যন্ত্রণা ভোগ করেছি।

সামি আলহায
লেখক

গুয়ান্তানামো বে কারাগারের একজন মেধাবী এবং সাহসী কয়েদীকে মক্কেল হিসেবে পাওয়ার আকাঙ্খা আমার দীর্ঘদিনের। সামির কাজ যেন পশুদের উদর ফুরে বের হওয়া কোন সৃষ্টি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সযতনে লুকিয়ে রাখা এক মিথ্যার মুখোশ উন্মোচন। গত পনেরটি বছর ধরে লুকিয়ে রাখা ভয়ানক এক কারাগার সম্পর্কে সবচেয়ে নিখাদ বর্ণনা। ঘটনাবহুল সে দিনগুলোর বর্ণনা বিশ্ববাসীর সামনে সবিস্তারে তুলে ধরা উচিৎ।

ক্লাইভ স্ট্যাফোর্ড স্মিথ
সামি আলহাযের আইনজীবী

NON FICTION
ISBN: 978-984-34-6697-6